PART- 06

সাইয়েদ
আবুল আ'লা
মওদূদী
রহ.

www.banglabookpdf.blogspot.com

হূদ
১১

নাযিল হওয়ার সময়-কাল

এ সূরার আলোচ্য বিষয় সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করলে একথা উপলব্ধি করা যায় যে, এটা সূরা ইউনুসের সমসময়ে নাযিল হয়েছিল। এমনকি তার অব্যবহিত পরেই যদি নাযিল হয়ে থাকে তবে তাও বিচিত্র নয়। কারণ ভাষণের মূল বক্তব্য একই। তবে সতর্ক করে দেয়ার ধরনটা তার চেয়ে বেশী কড়া।

হাদীসে আছে। হযরত আবু বকর (রা) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলেন ঃ "আমি দেখছি আপনি বুড়ো হয়ে যাচ্ছেন, এর কারণ কি?" জবাবে তিনি বলেন, شَيَّبَتْنِي هُودٌ وَأَخَوَاتُهَا "সূরা হূদ ও তারই মতো বিষয়বস্তু সম্বলিত সূরাগুলো আমাকে বুড়ো করে দিয়েছে।" এ থেকে অনুমান করা যাবে, যখন একদিকে কুরাইশ বংশীয় কাফেররা নিজেদের সমস্ত অস্ত্র নিয়ে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সত্যের দাওয়াতকে স্তব্ধ করে দিতে চাচ্ছিল এবং অন্যদিকে আল্লাহর পক্ষ থেকে একের পর এক এসব সতর্কবাণী নাযিল হচ্ছিল, তখনকার সময়টা তাঁর কাছে কত কঠিন ছিল। সম্ভবত এহেন অবস্থায় সর্বক্ষণ এ আশংকা তাঁকে অস্থির করে তুলছিল যে, আল্লাহর দেয়া অবকাশ কখন নাজানি খতম হয়ে যায় এবং সেই শেষ সময়টি এসে যায় যখন আল্লাহ কোন জাতির ওপর আযাব নাযিল করে তাকে পাকড়াও করার সিদ্ধান্ত নেন। আসলে এ সূরাটি পড়ার সময় মনে হতে থাকে যেন একটি বন্যার বাঁধ ভেংগে পড়ার উপক্রম হয়েছে এবং যে অসতর্ক জনবসতিটি এ বন্যার গ্রাস হতে যাচ্ছে তাকে শেষ সাবধান বাণী শুনানো হচ্ছে।

বিষয়বস্তু ও আলোচ্য বিষয়

যেমন একটু আগেই বলেছি, ভাষণের বিষয়বস্তু সূরা ইউনুসের অনুরূপ। অর্থাৎ দাওয়াত, উপদেশ ও সতর্কবাণী। তবে পার্থক্য হচ্ছে, সূরা ইউনুসের তুলনায় দাওয়াতের অংশ এখানে সংক্ষিপ্ত, উপদেশের মধ্যে যুক্তির পরিমাণ কম ও ওয়াজ-নসীহত বেশী এবং সতর্কবাণীগুলো বিস্তারিত ও বলিষ্ঠ।

এখানে দাওয়াত এভাবে দেয়া হয়েছে ঃ নবীর কথা মেনে নাও, শিরক থেকে বিরত হও অন্য সবার বন্দেগী ত্যাগ করে একমাত্র আল্লাহর বান্দা হয়ে যাও এবং নিজেদের দুনিয়ার জীবনের সমস্ত ব্যবস্থা আখেরাতে জবাবদিহির অনুভূতির ভিত্তিতে গড়ে তোলো।

উপদেশ দেয়া হয়েছে ঃ দুনিয়ার জীবনের বাহ্যিক দিকের ওপর ভরসা করে যেসব জাতি আল্লাহর নবীদের দাওয়াত প্রত্যাখ্যান করেছে ইতিপূর্বেই তারা অত্যন্ত ভয়াবহ পরিণতির সম্মুখীন হয়েছে। এমতাবস্থায় ইতিহাসের ধারাবাহিক অভিজ্ঞতায় যে পথটি ধ্বংসের পথ হিসেবে চূড়ান্তভাবে প্রমাণিত হয়েছে, সেই একই পথে তোমাদেরও চলতেই হবে, এমন কোন বাধ্যবাধকতা আছে নাকি?

সতর্কবাণী উচ্চারিত হয়েছে ঃ আযাব আসতে যে দেরী হচ্ছে, তা আসলে একটা অবকাশ মাত্র।

আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে তোমাদের এ অবকাশ দান করছেন। এ অবকাশকালে যদি তোমরা সংযত ও সংশোধিত না হও তাহলে এমন আযাব আসবে যাকে হটিয়ে দেবার সাধ্য কারোর নেই এবং যা ঈমানদারদের ক্ষুদ্রতম দলটি ছাড়া বাকি সমগ্র জাতিকে দুনিয়ার বুক থেকে নিশ্চিহ্ন করে দেবে।

এ বিষয়বস্তুটি উপলব্ধি করাবার জন্য সরাসরি সম্বোধন করার তুলনায় নূহের জাতি, আদ, সামুদ, লূতের জাতি, মাদ্‌য়ানবাসী ও ফেরাউনের সম্প্রদায়ের ঘটনাবলীর সাহায্য গ্রহণ করা হয়েছে বেশী করে। এ ঘটনাবলী বর্ণনা করার ক্ষেত্রে যে বিষয়গুলো সবচেয়ে বেশী স্পষ্ট করে তুলে ধরা হয়েছে সেগুলো হচ্ছে ঃ আল্লাহ যখন কোন বিষয়ের চূড়ান্ত মীমাংসা করতে উদ্যত হন তখন সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ পদ্ধতিতেই মীমাংসা করেন। সেখানে কাউকে সামান্যতমও ছাড় দেয়া হয় না। তখন দেখা হয় না কে কার সন্তান ও কার আত্মীয়। যে সঠিক পথে চলে একমাত্র তার ভাগেই রহমত আসে। অন্যথায় আল্লাহর গযব থেকে কোন নবীপুত্র বা নবী পত্নী কেউই বাঁচতে পারে না। শুধু এখানেই শেষ নয়, বরং যখন ঈমান ও কুফরীর চূড়ান্ত ফায়সালার সময় এসে পড়ে তখন দীনের প্রকৃতির এ দাবীই জানাতে থাকে যে, মুমিন নিজেও যেন পিতা–পুত্র ও স্বামী–স্ত্রীর সম্পর্ক ভুলে যায় এবং আল্লাহর ইনসাফের তরবারির মতো পূর্ণ নিরপেক্ষতার সাথে একমাত্র সত্যের সম্বন্ধ ছাড়া অন্য সব সম্বন্ধ কেটে ছিঁড়ে দূরে নিক্ষেপ করে। এহেন অবস্থায় বংশ ও রক্ত সম্বন্ধের প্রতি সামান্যতম পক্ষপাতিত্বও হবে ইসলামের প্রাণসত্তার সম্পর্ক বিরোধী। তিন চার বছর পরে বদরের ময়দানে মক্কার মুসলমানরা এ শিক্ষারই প্রদর্শনী করেছিলেন।

পরম করুণাময় মেহেরবান আল্লাহর নামে

الٓرٰ كِتٰبٌ اُحْكِمَتْ اٰيٰتُهٗ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِنْ لَّدُنْ حَكِيْمٍ خَبِيْرٍ ① اَلَّا تَعْبُدُوْٓا اِلَّا اللّٰهَ ؕ اِنَّنِيْ لَكُمْ مِّنْهُ نَذِيْرٌ وَّبَشِيْرٌ ② وَّاَنِ اسْتَغْفِرُوْا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوْبُوْٓا اِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَّتَاعًا حَسَنًا اِلٰٓى اَجَلٍ مُّسَمًّى وَّيُؤْتِ كُلَّ ذِيْ فَضْلٍ فَضْلَهٗ ؕ وَاِنْ تَوَلَّوْا فَاِنِّيْٓ اَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيْرٍ ③ اِلَى اللّٰهِ مَرْجِعُكُمْ ۚ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ④

আলিফ–লাম–র। একটি ফরমান।[১] এর আয়াতগুলো পাকাপোক্ত এবং বিস্তারিতভাবে বিবৃত হয়েছে,[২] এক পরম প্রজ্ঞাময় ও সর্বজ্ঞ সত্তার পক্ষ থেকে। (এতে বলা হয়েছে) তোমরা আল্লাহ ছাড়া আর কারোর বন্দেগী করবে না। আমি তাঁর পক্ষ থেকে তোমাদের জন্য সতর্ককারীও এবং সুসংবাদদাতাও। আরো বলা হয়েছে : তোমরা তোমাদের রবের কাছে ক্ষমা চাও এবং তাঁর দিকে ফিরে এসো, তাহলে তিনি একটি দীর্ঘ সময় পর্যন্ত তোমাদের উত্তম জীবন সামগ্রী দেবেন[৩] এবং অনুগ্রহ লাভের যোগ্য প্রত্যেক ব্যক্তিকে তার অনুগ্রহ দান করবেন।[৪] তবে যদি তোমরা মুখ ফিরিয়ে নাও তাহলে আমি তোমাদের ব্যাপারে একটি অতীব ভয়াবহ দিনের আযাবের ভয় করছি। তোমাদের সবাইকে আল্লাহর দিকে ফিরে যেতে হবে এবং তিনি সবকিছুই করতে পারেন।

১. মূল আয়াতে 'কিতাব' শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। এখানে বর্ণনাভংগীর সাথে সামঞ্জস্য রেখে তার অনুবাদ করা হয়েছে "ফরমান।" আরবী ভাষায় এ শব্দটি কেবলমাত্র কিতাব ও লিপি অর্থে ব্যবহৃত হয় না বরং হুকুম ও বাদশাহী ফরমান অর্থেও ব্যবহৃত হয়। কুরআনের বিভিন্ন জায়গায় এ শব্দটি এ অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে।

২. অর্থাৎ এ ফরমানে যেসব কথা বলা হয়েছে সেগুলো পাকা ও অকাট্য কথা এবং সেগুলোর কোন নড়চড় নেই। ভালোভাবে যাচাই পর্যালোচনা করে সে কথাগুলো বলা

হয়েছে। নিছক বড় বড় বুলি আওড়াবার উদ্দেশ্যে বলা হয়নি। বক্তার বক্তৃতার যাদু এবং ভাব-কল্পনার কবিত্ব এখানে নেই। প্রকৃত ও হুবহু সত্য বর্ণনা করা হয়েছে। প্রকৃত সত্যের চেয়ে কম বা তার চেয়ে বেশী একটি শব্দও এতে নেই। তারপর এ আয়াতগুলো বিস্তারিতও। এর মধ্যে প্রত্যেকটি কথা খুলে খুলে ও স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে। বক্তব্য জটিল, বক্র ও অস্পষ্ট নয়। প্রত্যেকটি কথা আলাদা আলাদা করে পরিষ্কারভাবে বুঝিয়ে বলা হয়েছে।

৩. অর্থাৎ দুনিয়ায় তোমাদের অবস্থান করার জন্য যে সময় নির্ধারিত রয়েছে সেই সময় পর্যন্ত তিনি তোমাদের খারাপভাবে নয় বরং ভালোভাবেই রাখবেন। তাঁর নিয়ামতসমূহ তোমাদের ওপর বর্ষিত হবে। তাঁর বরকত ও প্রাচুর্যলাভে তোমরা ধন্য হবে। তোমরা সচ্ছল ও সুখী-সমৃদ্ধ থাকবে। তোমাদের জীবন শান্তিময় ও নিরাপদ হবে। তোমরা লাঞ্ছনা, হীনতা ও দীনতার সাথে নয় বরং সম্মান ও মর্যাদার সাথে জীবন যাপন করবে। এ বক্তব্যটিই সূরা নাহ্লের ৯৭ আয়াতে এভাবে বলা হয়েছে ঃ

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثٰى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً - (النحل : ٩٧)

"যে ব্যক্তিই ঈমান সহকারে সৎকাজ করবে, সে পুরুষ হোক বা নারী, আমি তাকে পবিত্র জীবন দান করবো।"

লোকদের মধ্যে সাধারণভাবে ছড়িয়ে থাকা একটি বিভ্রান্তি দূর করাই এর উদ্দেশ্য। বিভ্রান্তিটি হচ্ছে, আল্লাহ ভীতি, সততা, সাধুতা ও দায়িত্বানুভূতির পথ অবলম্বন করলে মানুষ আখেরাতে লাভবান হলেও হতে পারে কিন্তু এর ফলে তার দুনিয়া একদম বরবাদ হয়ে যায়। এ মন্ত্র শয়তান প্রত্যেক দুনিয়ার মোহে মুগ্ধ অজ্ঞ-নির্বোধের কানে ফুঁকে দেয়। এ সংগে তাকে এ প্ররোচনাও দেয় যে, এ ধরনের আল্লাহ ভীরু ও সৎলোকদের জীবনে দারিদ্র, অভাব ও অনাহার ছাড়া আর কিছুই নেই। আল্লাহ এ ধারণার প্রতিবাদ করে বলেন, এ সঠিক পথ অবলম্বন করলে তোমাদের শুধুমাত্র আখেরাতই নয়, দুনিয়াও সমৃদ্ধ হবে। আখেরাতের মতো এ দুনিয়ায় যথার্থ মর্যাদা ও সাফল্যও এমনসব লোকের জন্য নির্ধারিত, যারা আল্লাহর প্রতি যথার্থ আনুগত্য সহকারে সৎ জীবন যাপন করে, যারা পবিত্র ও ত্রুটিমুক্ত চরিত্রের অধিকারী হয়, যাদের ব্যবহারিক জীবনে ও লেনদেনে কোন ক্লেদ ও গ্লানি নেই, যাদের ওপর প্রত্যেকটি বিষয়ে ভরসা করা যেতে পারে, যাদের থেকে প্রত্যেক ব্যক্তি কল্যাণের আশা পোষণ করে এবং কোন ব্যক্তি বা জাতি যাদের থেকে অকল্যাণের আশংকা করে না।

এ ছাড়া متاع حسن (উত্তম জীবন সামগ্রী) শব্দের মধ্যে আর একটি দিকও রয়েছে। এ দিকটি দৃষ্টির আগোচরে চলে যাওয়া উচিত নয়। কুরআন মজীদের দৃষ্টিতে দুনিয়ার জীবন সামগ্রী দু' প্রকারের। এক প্রকারের জীবন সামগ্রী আল্লাহ বিমুখ লোকদেরকে ফিত্নার মধ্যে নিক্ষেপ করার জন্য দেয়া হয়ে থাকে। এর মাধ্যমে প্রতারিত হয়ে তারা নিজেদেরকে দুনিয়া পূজা ও আল্লাহ বিস্মৃতির মধ্যে আরো বেশী করে হারিয়ে যায়। আপাত দৃষ্টিতে এটি নিয়ামত ঠিকই কিন্তু গভীরভাবে নিরীক্ষণ করলে দেখা যাবে এটি আল্লাহর

أَلَآ إِنَّهُمْ يَثْنُونَ صُدُورَهُمْ لِيَسْتَخْفُوا مِنْهُ ۚ أَلَا حِينَ يَسْتَغْشُونَ ثِيَابَهُمْ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ ۚ إِنَّهُ عَلِيمٌۢ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ۝٥

দেখো, এরা তাঁর কাছ থেকে আত্মগোপন করার জন্য বুক ভাঁজ করছে।[৫] সাবধান! যখন এরা কাপড় দিয়ে নিজেদেরকে ঢাকে তখন তারা যা গোপন করে এবং যা প্রকাশ করে তা সবই আল্লাহ জানেন। তিনি তো অন্তরে যা সংগোপন আছে তাও জানেন।

লানত ও আযাবের পটভূমিই রচনা করে। কুরআন মজীদ متاع غرور তথা প্রতারণার সামগ্রী নামেও একে স্মরণ করে। দ্বিতীয় প্রকারের জীবন সামগ্রী মানুষকে আরো বেশী সচ্ছল, সমৃদ্ধ ও শক্তিশালী করে তাকে তার আল্লাহর আরো বেশী কৃতজ্ঞ বান্দায় পরিণত করে। এভাবে সে আল্লাহর, তাঁর বান্দাদের এবং নিজের অধিকার আরো বেশী করে আদায় করতে সক্ষম হয়। আল্লাহর দেয়া উপকরণাদির সাহায্যে শক্তি সঞ্চয় করে সে দুনিয়ায় ভালো, ন্যায় ও কল্যাণের উন্নয়ন এবং মন্দ, বিপর্যয় ও অকল্যাণের পথ রোধ করার জন্য আরো বেশী প্রভাবশালী ও কার্যকর প্রচেষ্টা চালাতে থাকে। এ হচ্ছে কুরআনের ভাষায় উত্তম জীবন সামগ্রী। অর্থাৎ এমন উন্নত পর্যায়ের জীবন সামগ্রী যা নিছক দুনিয়ার আয়েশ আরামের মধ্যেই খতম হয়ে যায় না বরং পরিণামে আখেরাতেরও শান্তির উপকরণে পরিণত হয়।

৪. অর্থাৎ যে ব্যক্তি চরিত্রগুণে ও নেক আমলে যত বেশী এগিয়ে যাবে আল্লাহ তাকে ততই বড় মর্যাদা দান করবেন। আল্লাহর দরবারে কারোর কৃতিত্ব ও সৎকাজকে নষ্ট করা হয় না। তাঁর কাছে যেমন অসৎকাজ ও অসৎবৃত্তির কোন মর্যাদা নেই তেমনি সৎকাজ ও সৎবৃত্তিরও কোন অমর্যদা হয় না। তাঁর রাজ্যের রীতি এ নয় যে;

"আরবী ঘোড়ার পিঠে জরাজীর্ণ জিন
আর গাধার গলায় ঝোলে সোনার শৃংখল।"

যে ব্যক্তিই নিজের চরিত্র ও কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে নিজেকে যেরূপ মর্যাদার অধিকারী প্রমাণ করবে তাকে আল্লাহ সে মর্যাদা অবশ্যই দেবেন।

৫. মক্কায় যখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আন্দোলন নিয়ে আলোচনা–সমালোচনা শুরু হলো তখন সেখানে এমন বহু লোক ছিল যারা বিরোধিতায় প্রকাশ্যে তেমন একটা তৎপর ছিল না কিন্তু মনে মনে তার দাওয়াতের প্রতি ছিল চরমভাবে ক্ষুব্ধ ও বিরূপভাবাপন্ন। তারা তাঁকে পাশ কাটিয়ে চলতো। তাঁর কোন কথা শুনতে চাইতো না। কোথাও তাঁকে বসে থাকতে দেখলে পেছন ফিরে চলে যেতো। দূর থেকে তাঁকে আসতে দেখলে মুখ ফিরিয়ে নিতো অথবা কাপড়ের আড়ালে মুখ লুকিয়ে ফেলতো, যাতে তাঁর মুখোমুখি হতে না হয় এবং তিনি তাদেরকে সম্বোধন করে নিজের কথা বলতে না শুরু করে দেন। এখানে এ ধরনের লোকদের প্রতি ইংগিত করা হয়েছে। বলা হয়েছে : এরা

وَمَا مِنْ دَآبَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللّٰهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا ۚ كُلٌّ فِي كِتٰبٍ مُّبِيْنٍ ⑥ وَهُوَ الَّذِيْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضَ فِيْ سِتَّةِ أَيَّامٍ وَّكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَآءِ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ۗ وَلَئِنْ قُلْتَ إِنَّكُمْ مَّبْعُوْثُوْنَ مِنْ بَعْدِ الْمَوْتِ لَيَقُوْلَنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا إِنْ هٰذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّبِيْنٌ ⑦ وَلَئِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِلٰى أُمَّةٍ مَّعْدُوْدَةٍ لَّيَقُوْلُنَّ مَا يَحْبِسُهُ ۗ أَلَا يَوْمَ يَأْتِيْهِمْ لَيْسَ مَصْرُوْفًا عَنْهُمْ وَحَاقَ بِهِمْ مَّا كَانُوْا بِهِ يَسْتَهْزِءُوْنَ ⑧

ভূপৃষ্ঠে বিচরণকারী এমন কোন প্রাণী নেই যার রিযিকের দায়িত্ব আল্লাহর ওপর বর্তায় না এবং যার সম্পর্কে তিনি জানেন না, কোথায় সে থাকে এবং কোথায় তাকে সোপর্দ করা হয়।[৬] সবকিছুই একটি পরিষ্কার কিতাবে লেখা আছে।

তিনিই আকাশ ও পৃথিবী ছয় দিনে সৃষ্টি করেছেন, —যখন এর আগে তাঁর আরশ পানির ওপর ছিল,[৭]—যাতে তোমাদের পরীক্ষা করে দেখেন তোমাদের মধ্যে কে ভালো কাজ করে।[৮] এখন যদি হে মুহাম্মাদ! তুমি বলো, হে লোকেরা, মরার পর তোমাদের পুনরুজ্জীবিত করা হবে, তাহলে অস্বীকারকারীরা সংগে সংগেই বলে উঠবে। এতো সুস্পষ্ট যাদু।[৯] আর যদি আমি একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত তাদের শাস্তি পিছিয়ে দেই তাহলে তারা বলতে থাকে, কোন্ জিনিস শাস্তিটাকে আটকে রেখেছে? শোনো! যেদিন সেই শাস্তির সময় এসে যাবে সেদিন কারো ফিরানোর প্রচেষ্টা তাকে ফিরাতে পারবে না এবং যা নিয়ে তারা বিদ্রূপ করছে তা–ই তাদেরকে ঘেরাও করে ফেলবে।

সত্যের মুখোমুখি হতে ভয় পায় এবং উটপাখির মতো বালির মধ্যে মুখ গুঁজে রেখে মনে করে, যে সত্যকে দেখে তারা মুখ লুকিয়েছে তা অন্তর্হিত হয়ে গেছে। অথচ সত্য নিজের জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে এবং এ তামাশাও দেখছে যে, এ নির্বোধরা তার থেকে বাঁচার জন্য মুখ লুকাচ্ছে।

৬. অর্থাৎ যে আল্লাহ এমন সূক্ষ্মজ্ঞানী যে প্রত্যেকটি পাখির বাসা ও প্রত্যেকটি পোকা–মাকড়ের গর্ত তাঁর জানা এবং তাদের প্রত্যেকের কাছে তিনি তাদের

জীবনোপকরণ পাঠিয়ে দিচ্ছেন, আর তাছাড়া প্রত্যেকটি প্রাণী কোথায় থাকে এবং কোথায় মৃত্যুবরণ করে প্রতি মুহূর্তে যিনি এ খবর রাখেন, তাঁর সম্পর্কে যদি তোমরা এ ধারণা করে থাকো যে, এভাবে মুখ লুকিয়ে অথবা কানে আংগুল চেপে কিংবা চোখ বন্ধ করে তাঁর পাকড়াও থেকে রক্ষা পাবে তাহলে তোমরা বড়ই বোকা। সত্যের আহবায়ককে দেখে তোমরা মুখ লুকালে তাতে লাভ কি? এর ফলে কি তোমরা আল্লাহর কাছ থেকেও নিজেদের গোপন করতে পেরেছো? আল্লাহ কি দেখছেন না, এক ব্যক্তি তোমাদের সত্যের সাথে পরিচিত করাবার দায়িত্ব পালন করছেন আর তোমরা তার কোন কথা যাতে তোমাদের কানে না পড়ে সেজন্য প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছো?

৭. সম্ভবত লোকদের একটি প্রশ্নের জবাবে প্রাসংগিকভাবে এ বাক্যটি মাঝখানে এসে গেছে। প্রশ্নটি ছিল, আকাশ ও পৃথিবী যদি প্রথমে না থেকে থাকে এবং পরে সৃষ্টি করা হয়ে থাকে তাহলে প্রথমে কি ছিল? এ প্রশ্নটি এখানে উল্লেখ না করেই এর সংক্ষিপ্ত জবাব দেয়া হয়েছে এ বলে যে, প্রথমে পানি ছিল। এ পানি মানে কি তা আমরা বলতে পারি না। পানি নামে যে পদার্থটিকে আমরা চিনি সেটি, না এ শব্দটিকে এখানে নিছক রূপক অর্থে অর্থাৎ ধাতুর বর্তমান কঠিন অবস্থার পূর্ববর্তী দ্রবীভূত (Fluid) অবস্থা বুঝানোর জন্য ব্যবহার করা হয়েছে? তবে আল্লাহর আরশ পানির ওপরে ছিল—এ বাক্যটির যে অর্থ আমরা বুঝতে পেরেছি তা হচ্ছে এই যে, আল্লাহর সাম্রাজ্য তখন পানির ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিল।

৮. এ বক্তব্যের অর্থ হচ্ছে, মহান আল্লাহ আকাশ ও পৃথিবী এজন্য সৃষ্টি করেছেন যে, মূলত তোমাদের (অর্থাৎ মানুষ) সৃষ্টি করাই তাঁর উদ্দেশ্য ছিল। আর তোমাদের তিনি সৃষ্টি করেছেন তোমাদের ওপর নৈতিক দায়িত্বের বোঝা চাপিয়ে দেবার জন্য। তোমাদেরকে খিলাফতের ইখতিয়ার দান করে তিনি দেখতে চান তোমাদের মধ্য থেকে কে সেই ইখতিয়ার এবং নৈতিক দায়িত্ব কিভাবে ব্যবহার ও পালন করে? এ সৃষ্টি কর্মের গভীরে যদি এ উদ্দেশ্য নিহিত না থাকতো, যদি ইখতিয়ার সোপর্দ করা সত্ত্বেও কোন পরীক্ষা, হিসেব-নিকেশ, জবাবদিহি ও শাস্তি-পুরস্কারের প্রশ্ন না থাকতো এবং নৈতিকভাবে দায়িত্বশীল হওয়া সত্ত্বেও যদি মানুষকে কোন পরিণাম ফল ভোগ না করে এমনি এমনিই মরে যেতে হতো, তাহলে এ সমস্ত সৃষ্টিকর্ম পুরোপুরি একটি অর্থহীন খেলা-তামাশা বলে বিবেচিত হতো এবং প্রকৃতির এ সমগ্র কারখানাটিরই একটি বাজে কাজ ছাড়া আর কোন মর্যাদাই থাকতো না।

৯. অর্থাৎ তারা এমন শোচনীয় অজ্ঞতা ও মূর্খতায় লিপ্ত যে, তারা বিশ্ব-জাহানকে একজন খেলোয়াড়ের খেলাঘর এবং নিজেদেরকে তার মনভুলানো খেলনা মনে করে বসেছে। এ নির্বোধ জনোচিত কল্পনাবিলাসে তারা এত বেশী নিমগ্ন হয়ে পড়েছে যে, যখন তুমি তাদেরকে এ কর্মবহুল জীবনের নিরেট উদ্দেশ্য এবং এ সংগে তাদের নিজেদের অস্তিত্বের যুক্তিসংগত উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য বুঝাতে থাকো তখন তারা অট্টহাসিতে ফেটে পড়ে এবং তোমাকে এ বলে বিদ্রূপ করতে থাকে যে, তুমি তো যাদুকরের মতো কথা বলছো।

وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ ۚ إِنَّهُ لَيَئُوسٌ كَفُورٌ ۞ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي ۚ إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ ۞ إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ ۞

২ রুকূ'

আমি মানুষকে নিজের অনুগ্রহভাজন করার পর আবার কখনো যদি তাকে তা থেকে বঞ্চিত করি তাহলে সে হতাশ হয়ে পড়ে এবং অকৃতজ্ঞতার প্রকাশ ঘটাতে থাকে। আর যদি তার ওপর যে বিপদ এসেছিল তার পরে আমি তাকে নিয়ামতের স্বাদ আস্বাদন করাই তাহলে সে বলে, আমার সব বিপদ কেটে গেছে। তখন সে আনন্দে আত্মহারা হয়ে পড়ে এবং অহংকার করতে থাকে।[১০] এ দোষ থেকে একমাত্র তারাই মুক্ত যারা সবর করে[১১] এবং সৎকাজ করে আর তাদের জন্য রয়েছে ক্ষমা এবং বিরাট প্রতিদানও।[১২]

১০. এ হচ্ছে মানুষের নীচতা, স্থূলদৃষ্টি ও অপরিণামদর্শিতার বাস্তব চিত্র। জীবনের কর্মচঞ্চল অংগনে পদে পদে এর সাক্ষাত পাওয়া যায়। সাধারণভাবে প্রত্যেক ব্যক্তি নিজের মন-মানসিকতা পর্যালোচনা করে নিজের মধ্যেও এর অবস্থান অনুভব করতে পারে। কখনো সে সচ্ছলতা ও প্রাচুর্যের অধিকারী হয়ে এবং শক্তি-সামর্থ লাভ করে অহংকার করে বেড়ায়। শরতের প্রকৃতি যেমন সবদিক সবুজ-শ্যামল দেখা যায় তেমনি কখনো দেখতে পায় চারদিক সবুজ শ্যামলে পরিপূর্ণ। মনের কোণে তখন একথা একবার উঁকিও দেয় না যে, এ সবুজের সমারোহ একদিন তিরোহিত হয়ে পাতা ঝরার মওসুমও আসতে পারে। কোন বিপদের ফেরে পড়লে আবেগে উত্তেজনায় সে কেঁদে ফেলে, বেদনা ও হতাশায় ডুবে যায় তার সারা মন-মস্তিষ্ক এবং এত বেসামাল হয়ে পড়ে যে, আল্লাহকে পর্যন্ত গালমন্দ করে বসে এবং তাঁর সার্বভৌম শাসন কর্তৃত্বকে অভিসম্পাত করে নিজের দুঃখ-বেদনা লাঘব করতে চেষ্টা করে। তারপর যখন দুঃসময় পার হয়ে গিয়ে সুসময় এসে যায় তখন আবার সেই আগের মতোই দম্ভ ও অহংকারে ধরাকে সরা জ্ঞান করে এবং সুখ-ঐশ্বর্যের নেশায় মত্ত হয়।

এখানে মানুষের এ নীচপ্রকৃতির বর্ণনা দেয়া হচ্ছে কেন? অত্যন্ত সূক্ষ্ম পদ্ধতিতে লোকদেরকে সতর্ক করাই এর উদ্দেশ্য। এখানে বলা হচ্ছে যে, আজ নিরাপদ ও নিশ্চিন্ত পরিবেশে যখন আমার নবী আল্লাহর নাফরমানীর পরিণামে তোমাদের ওপর আযাব নাযিল হবে বলে তোমাদের সাবধান করে দেন তখন তোমরা তাঁর একথা শুনে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করতে এবং বলতে থাকো, "আরে পাগল! দেখছো না আমরা সুখ-ঐশ্বর্যের সাগরে ভাসছি,

فَلَعَلَّكَ تَارِكٌۢ بَعْضَ مَا يُوْحٰٓى اِلَيْكَ وَضَآئِقٌۢ بِهٖ صَدْرُكَ اَنْ يَّقُوْلُوْا لَوْلَآ اُنْزِلَ عَلَيْهِ كَنْزٌ اَوْ جَآءَ مَعَهٗ مَلَكٌ ؕ اِنَّمَآ اَنْتَ نَذِيْرٌ ؕ وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ وَّكِيْلٌ ⑫

কাজেই হে নবী এমন যেন না হয়, তোমার প্রতি যে জিনিসের অহি করা হচ্ছে তুমি তার মধ্য থেকে কোন জিনিস (বর্ণনা করা) বাদ দেবে এবং একথায় তোমার মন সংকুচিত হবে এ জন্য যে, তারা বলবে, "এ ব্যক্তির ওপর কোন ধনভাণ্ডার অবতীর্ণ হয়নি কেন" অথবা "এর সাথে কোন ফেরেশতা আসেনি কেন?" তুমি তো নিছক সতর্ককারী। এরপর আল্লাহই সব কাজের ব্যবস্থাপক।[১৩]

চারদিকে আমাদের শ্রেষ্ঠত্বের ঝাণ্ডা উড়ছে, এ সময় দিন-দুপুরে তুমি কেমন করে দেখলে আমাদের ওপর আযাব নাযিল হওয়ার বিভীষিকাময় স্বপ্ন।" এ অবস্থায় আসলে নবীর উপদেশের জবাবে তোমাদের এ ঠাট্টা বিদ্রূপ তোমাদের নীচ সহজাত প্রবৃত্তির একটি নিকৃষ্টতর প্রদর্শনী ছাড়া আর কিছুই নয়। আল্লাহ তো তোমাদের ভ্রষ্টতা ও অসৎকার্যাবলী সত্ত্বেও নিছক তাঁর অনুগ্রহ ও করুণার কারণে তোমাদের শাস্তি বিলম্বিত করছেন। তোমাদের সংশোধিত হবার সুযোগ দেয়াই তাঁর উদ্দেশ্য। কিন্তু তোমরা এ অবকাশ কালে ভাবছো, আমাদের সচ্ছলতা ও প্রাচুর্য কেমন স্থায়ী বুনিয়াদের ওপর প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং আমাদের এ বাগানে কেমন চিরবসন্তের আমেজ লেগেছে, যেন এখানে শীতের পাতা ঝরার মওসুমের আগমনের কোন আশংকাই নেই।

১১. এখানে সবরের আর একটি অর্থ সামনে আসছে। ওপরে যে নীচতার বর্ণনা এসেছে সবর তার বিপরীত গুণ প্রকাশ করে। সবরকারী ব্যক্তি কালের পরিবর্তনশীল অবস্থায় নিজের মানসিক ভারসাম্য অটুট রাখে। সময়ের প্রত্যেকটি পরিবর্তনের প্রভাব গ্রহণ করে সে নিজের রং বদলাতে থাকে না। বরং সব অবস্থায় একটি যুক্তিসংগত ও সঠিক মনোভাব ও দৃষ্টিভংগী নিয়ে এগিয়ে চলে। যদি কখনো অবস্থা অনুকূলে এসে যায় এবং সে ধনাঢ্যতা, কর্তৃত্ব ও খ্যাতির উচ্চাসনে চড়তে থাকে তাহলে শ্রেষ্ঠত্ব ও অহংকারের নেশায় মত্ত হয়ে বিপথে পরিচালিত হয় না। আর যদি কখনো বিপদ-আপদ ও সমস্যা-সংকটের করাল আঘাত তাকে ক্ষত-বিক্ষত করতে থাকে তাহলে এহেন অবস্থায়ও সে নিজের মানবিক চরিত্র বিনষ্ট করে না। আল্লাহর পক্ষ থেকে সুখৈশ্বর্য বা বিপদ-মুসীবত যে কোন আকারেই তাকে পরীক্ষায় ফেলা হোক না কেন উভয় অবস্থায়ই তার ধৈর্য ও সহিষ্ণুতা অপরিবর্তিত ও দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত থাকে। তার হৃদয়পাত্র কখনো কোন ছোট বা বড় জিনিসের আধিক্যে উপচে পড়ে না।

১২. অর্থাৎ আল্লাহ এমন ধরনের লোকদের দোষ-ত্রুটি মাফও করে দেন এবং তাদের সৎকাজের পুরস্কারও দেন।

أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَىٰهُ ۖ قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِّثْلِهِۦ مُفْتَرَيَٰتٍ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَٰدِقِينَ ⑬

এরা কি বলছে, নবী নিজেই এ কিতাবটি রচনা করেছে? বলো, ঠিক আছে, তাই যদি হয়, তাহলে এর মতো দশটি সূরা তোমরা বানিয়ে নিয়ে এসো এবং আল্লাহ ছাড়া তোমাদের আর যেসব মাবুদ আছে তাদেরকে সাহায্যের জন্যে ডাকতে পারলে ডেকে নাও, যদি তোমরা (তাদেরকে মাবুদ মনে করার ব্যাপারে) সাচ্চা হয়ে থাকো।

১৩. এ বক্তব্যের অর্থ বুঝার জন্যে যে অবস্থায় এটি পেশ করা হয় সেটি অবশ্যি সামনে রাখতে হবে। মক্কা এমন একটি গোত্রের কেন্দ্রভূমি যার ধর্মীয় কর্তৃত্ব এবং আর্থিক, বাণিজ্যিক ও রাজনৈতিক ক্ষমতার দাপট সমগ্র আরবের ওপর প্রতিষ্ঠিত। এ গোত্রটি যখন অগ্রগতির সর্বোচ্চ শিখরে উঠেছে, ঠিক তখনই সেই জনপদের এক ব্যক্তি উঠে প্রকাশ্যে ঘোষণা করেন, তোমরা যে ধর্মের পৌরহিত্য করছো তা পরিপূর্ণ গোমরাহী ছাড়া আর কিছুই নয়। তোমরা যে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ব্যবস্থার নেতার আসনে বসে আছো তার শিকড়ের গভীর মূলদেশে পর্যন্ত পচন ধরেছে এবং তা একটি গলিত ব্যবস্থা ছাড়া আর কিছুই নয়। আল্লাহর আযাব তোমাদের ওপর প্রচণ্ডবেগে ঝাঁপিয়ে পড়িতে উদ্যত। আমি আল্লাহর পক্ষ থেকে তোমাদের সামনে যে সত্য ধর্ম ও কল্যাণময় জীবন বিধান পেশ করছি তাকে গ্রহণ করা ছাড়া তোমাদের জন্য বাঁচার আর দ্বিতীয় কোন পথ নেই। তার সাথে তার নিজের পূত-পবিত্র চরিত্র এবং যুক্তিসংগত কথা ছাড়া আর এমন কোন অসাধারণ জিনিস নেই যা দেখে সাধারণ মানুষ তাকে আল্লাহর পক্ষ থেকে নিযুক্ত বলে মনে করতে পারে। আর চারপাশের পরিমণ্ডলেও ধর্ম, নৈতিকতা ও সামাজিক-সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে গভীর মৌলিক ত্রুটি ছাড়া এমন কোন বাহ্যিক আলামত নেই, যা আযাব নাযিল হওয়াকে চিহ্নিত করতে পারে। বরং এর সম্পূর্ণ বিপরীত। সমস্ত সুস্পষ্ট আলামত একথাই প্রকাশ করছে যে, তাদের ওপর আল্লাহর (এবং তাদের বিশ্বাস অনুযায়ী) দেবতাদের বড়ই অনুগ্রহ রয়েছে এবং তারা যাকিছু করছে ঠিকই করছে। এহেন অবস্থায় একথা বলার ফলে জনপদের কতিপয় অত্যন্ত সুস্থ বুদ্ধি-বিবেক সম্পন্ন এবং সত্যনিষ্ঠ ব্যক্তি ছাড়া বাদবাকি সমস্ত লোকই যে তার বিরুদ্ধে খড়গহস্ত হবে, তাতে কোন সন্দেহ নেই। এটাই স্বাভাবিক, এর পরিণতি এ ছাড়া আর কিছু হতেই পারে না। কেউ জুলুম-নির্যাতনের সাহায্যে তাকে দাবিয়ে দিতে চায়। কেউ মিথ্যা দোষারোপ এবং আজে বাজে প্রশ্ন-আপত্তি ইত্যাদি উথাপন করে তার পায়ের তলা থেকে মাটি সরিয়ে দেয়ার চেষ্টা করে। কেউ বিদ্বেষমূলক বিরূপ আচরণের মাধ্যমে তার সাহস ও হিম্মত গুঁড়িয়ে দিতে চায়। আবার কেউ ঠাট্টা-তামাশা, পরিহাস, ব্যাংগ-বিদ্রূপ ও অশ্লীল-কুরুচিপূর্ণ মন্তব্য করে তার কথাকে গুরুত্বহীন করে দিতে চায়। এভাবে কয়েক বছর ধরে এ ব্যক্তির দাওয়াতকে মোকাবিলা করা হতে থাকে। এ মোকাবিলা যে কত হৃদয়বিদারক ও হতাশাব্যঞ্জক হতে পারে তা সুস্পষ্ট করে বলার প্রয়োজন নেই। এরূপ পরিস্থিতিতে আল্লাহ তাঁর নবীর হিম্মত

فَاِلَّمۡ یَسۡتَجِیۡبُوۡا لَکُمۡ فَاعۡلَمُوۡۤا اَنَّمَاۤ اُنۡزِلَ بِعِلۡمِ اللّٰهِ وَاَنۡ لَّاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ فَهَلۡ اَنۡتُمۡ مُّسۡلِمُوۡنَ ﴿۱۴﴾

*এখন যদি তোমাদের মাবুদরা তোমাদের সাহায্যে না পৌঁছে থাকে তাহলে জেনে রাখো এ আল্লাহর ইল্‌ম থেকে নাযিল হয়েছে এবং তিনি ছাড়া আর কোন সত্যিকার মাবুদ নেই। তাহলে কি তোমরা (এ সত্যের সামনে) আনুগত্যের শির নত করছো?*১৪

অটুট রাখার জন্য তাঁকে উপদেশ দিয়ে বলছেন, ভালো ও অনুকূল অবস্থায় আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে ওঠা এবং খারাপ ও প্রতিকূল অবস্থায় হতাশ হয়ে পড়া মূলত নীচ ও হীনমন্য লোকদের কাজ। আমার দৃষ্টিতে যে ব্যক্তি নিজে সৎ হয় এবং সততার পথে ধৈর্য, দৃঢ়তা ও অবিচলতার সাথে অগ্রসর হয় সে-ই আসলে মর্যাদার অধিকারী। কাজেই যে ধরনের বিদ্বেষ, বিরূপ ব্যবহার, ব্যংগ-বিদ্রূপ ও মূর্খজনোচিত আচরণ দ্বারা তোমার মোকাবিলা করা হচ্ছে, তার ফলে তোমার দৃঢ়তা ও অবিচলতায় যেন ফাটল না ধরে। অহীর মাধ্যমে তোমার সামনে যে মহাসত্যের দ্বার উন্মুক্ত করা হয়েছে তার প্রকাশ ও ঘোষণায় এবং তার প্রতি আহবান জানাতে যেন তুমি একটুও কুন্ঠিত ও ভীত না হও। অমুক বিষয়টি শোনার সাথে সাথেই যখন লোকেরা তা নিয়ে ব্যংগ-বিদ্রূপ করতে থাকে তখন তা কেমন করে বলবো এবং অমুক সত্যটি যখন কেউ শুনতেই প্রস্তুত নয় তখন তা কিভাবে প্রকাশ করবো, এ ধরনের চিন্তা এবং দোদুল্যমানতা তোমার মনে যেন কখনো উদয়ই না হয়। কেউ মানুক বা না মানুক তুমি যা সত্য মনে করবে নির্দ্বিধায় ও নির্ভয়ে এবং কোন প্রকার কমবেশী না করে তা বলে যেতে থাকবে, পরিণাম আল্লাহর হাতে সোপর্দ করে দেবে।

১৪. এখানে একই যুক্তির মাধ্যমে কুরআনের আল্লাহর কালাম হওয়ার প্রমাণ পেশ করা হয়েছে এবং একই সংগে তাওহীদের প্রমাণও। এ যুক্তির সার নির্যাস হচ্ছে ঃ

এক ঃ তোমাদের মতে যদি এটা মানুষের বাণী হয়ে থাকে তাহলে অবশ্যি এমন বাণী রচনার ক্ষমতা মানুষের থাকা উচিত। কাজেই তোমরা যখন দাবী করছো, এ কিতাবটি আমি (মুহাম্মাদ) নিজেই রচনা করেছি তখন তোমাদের এ দাবী কেবলমাত্র তখনই সঠিক হতে পারে যখন তোমরা এমনি ধরনের একটি কিতাব রচনা করে দেখিয়ে দেবে। কিন্তু বারবার চ্যালেঞ্জ দেবার পরও যদি তোমরা সবাই মিলে এর নজীর পেশ করতে না পারো তাহলে আমার এ দাবী সত্য যে, আমি এ কিতাবের রচয়িতা নই বরং আল্লাহর জ্ঞান থেকে এটি নাযিল হয়েছে।

দুই ঃ তারপর এ কিতাবে যেহেতু তোমাদের মাবুদদের প্রকাশ্যে বিরোধিতা করা হয়েছে এবং পরিষ্কার বলা হয়েছে, তাদের ইবাদাত বন্দেগী করো না, কারণ আল্লাহর সার্বভৌম ক্ষমতায় তাদের কোন অংশ নেই, তাই অবশ্যি তোমাদের মাবুদদেরও (যদি সত্যি তাদের কোন শক্তি থাকে) আমার দাবীকে মিথ্যা প্রমাণ এবং এ কিতাবের নজীর

مَنْ كَانَ يُرِيْدُ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا وَزِيْنَتَهَا نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيْهَا وَهُمْ فِيْهَا لَا يُبْخَسُوْنَ ﴿١٥﴾ أُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْاٰخِرَةِ إِلَّا النَّارُ ۖ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوْا فِيْهَا وَبٰطِلٌ مَّا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿١٦﴾

যারা শুধুমাত্র এ দুনিয়ার জীবন এবং এর শোভা-সৌন্দর্য কামনা করে[১৫] তাদের কৃতকর্মের সমুদয় ফল আমি এখানেই তাদেরকে দিয়ে দেই এবং এ ব্যাপারে তাদেরকে কম দেয়া হয় না। কিন্তু এ ধরনের লোকদের জন্য আখেরাতে আগুন ছাড়া আর কিছুই নেই।[১৬] (সেখানে তারা জানতে পারবে) যাকিছু তারা দুনিয়ায় বানিয়েছে সব বরবাদ হয়ে গেছে এবং এখন তাদের সমস্ত কৃতকর্ম ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে।

পেশ করার ব্যাপারে তোমাদের সাহায্য করা উচিত। কিন্তু এ ফায়সালার সময়ও যদি তারা তোমাদের সাহায্য না করে এবং তোমাদের মধ্যে এ কিতাবের নজীর পেশ করার মতো শক্তি সঞ্চার করতে না পারে, তাহলে এ থেকে পরিষ্কার প্রমাণ হয়ে যায় যে, তোমরা তাদেরকে অযথা তোমাদের মাবুদ বানিয়ে রেখেছো। মূলত তাদের মধ্যে কোন শক্তি নেই এবং আল্লাহর সার্বভৌম ক্ষমতার কোন অংশও নেই, যার ভিত্তিতে তারা মাবুদ হবার অধিকার লাভ করতে পারে।

এ আয়াত থেকে আনুষংগিকভাবে একথাও জানা যায় যে, এ সূরাটি সূরা ইউনূসের পূর্বে নাযিল হয়। এখানে দশটি সূরা রচনা করে আনার চ্যালেঞ্জ দেয়া হয়। এ চ্যালেঞ্জের জবাব দিতে তারা অক্ষম হলে এরপর সূরা ইউনূসে বলা হয় ঃ ঠিক আছে, তাহলে শুধুমাত্র এরি মতো একটি সূরাই রচনা করে নিয়ে এসো। (ইউনূস, ৩৮ আয়াত, ৪৬ টীকা)

১৫. এখানে যে প্রসংগে ও যে সামঞ্জস্যের পেক্ষিতে একথা বলা হয়েছে তা হচ্ছে এই যে, সে যুগে যে ধরনের লোকেরা কুরআনের দাওয়াত প্রত্যাখ্যান করছিল এবং আজও প্রত্যাখ্যান করছে তাদের বেশীর ভাগই দুনিয়া পূজারী। বৈষয়িক স্বার্থ তাদের মন-মস্তিষ্ককে আচ্ছন্ন করে রাখে। আল্লাহর বাণী প্রত্যাখ্যান করার জন্য তারা যে ওজুহাত দেখায় তা সবই মেকী। আসল কারণ হচ্ছে তাদের দৃষ্টিতে দুনিয়া ও তার বস্তুবাদী স্বার্থের উর্ধে কোন জিনিসের কোন মূল্য নেই এবং এ স্বার্থগুলো থেকে লাভবান হতে হলে তাদের প্রয়োজন লাগামহীন স্বাধীনতা।

১৬. অর্থাৎ যার সামনে রয়েছে শুধু দুনিয়ার এ জীবন এবং এর স্বার্থ ও সুখ-সম্ভোগ লাভ সে এ বৈষয়িক স্বার্থ উদ্ধারের জন্য যেমন প্রচেষ্টা এখানে চালাবে তেমনি তার ফল সে এখানে পাবে। কিন্তু আখেরাত যখন তার লক্ষ নয় এবং সেজন্য সে কোন চেষ্টাও করেনি তখন তার দুনিয়ার বৈষয়িক স্বার্থ উদ্ধার প্রচেষ্টার ফল লাভ আখেরাত পর্যন্ত দীর্ঘায়িত হবার কোন কারণ নেই। সেখানে ফল লাভের সম্ভাবনা একমাত্র তখনই হতে পারে যখন দুনিয়ায় মানুষ এমন সব কাজের জন্য প্রচেষ্টা চালায় যেগুলো আখেরাতেও

أَفَمَنْ كَانَ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّهِ وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ وَمِن قَبْلِهِ كِتَٰبُ مُوسَىٰٓ إِمَامًا وَرَحْمَةً ۚ أُو۟لَٰٓئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِۦ ۚ وَمَن يَكْفُرْ بِهِۦ مِنَ ٱلْأَحْزَابِ فَٱلنَّارُ مَوْعِدُهُۥ ۚ فَلَا تَكُ فِى مِرْيَةٍ مِّنْهُ ۚ إِنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّكَ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ ⑰

তারপর যে ব্যক্তি তার রবের পক্ষ থেকে একটি সুস্পষ্ট সাক্ষের অধিকারী ছিল,[১৭] এরপর প্রতিপালকের পক্ষ থেকে একজন সাক্ষীও (এ সাক্ষের সমর্থনে) এসে গেছে[১৮] এবং পথপ্রদর্শকও অনুগ্রহ হিসেবে পূর্বে আগত মূসার কিতাবও বর্তমান ছিল (এ অবস্থায় সে ব্যক্তিও কি দুনিয়া পূজারীদের মতো তা অস্বীকার করতে পারে?) এ ধরনের লোকেরা তো তার প্রতি ঈমান আনবেই,[১৯] আর মানব গোষ্ঠীর মধ্য থেকে যে-ই একে অস্বীকার করে তার জন্য যে জায়গার ওয়াদা করা হয়েছে তা হচ্ছে দোযখ। কাজেই হে নবী! তুমি এ জিনিসের ব্যাপারে কোন প্রকার সন্দেহে পড়ে যেয়ো না, এতো তোমার রবের পক্ষ থেকে পাঠানো সত্য। তবে বেশীর ভাগ লোক তা স্বীকার করে না।

ফলদায়ক হয়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ, যদি কেউ তার নিজের বসবাস করার জন্য একটি সুরম্য প্রাসাদ চায় এবং এখানে এ ধরনের প্রাসাদ তৈরী করার জন্য যেসব ব্যবস্থা অবলম্বন করা দরকার তা সবই সে অবলম্বন করে তাহলে নিশ্চয়ই একটি সুরম্য প্রাসাদ তৈরী হয়ে যাবে এবং তার কোন একটি ইঁটও নিছক একজন কাফের তাকে দেয়ালের গায় বসাচ্ছে বলে প্রাসাদের দেয়ালে বসতে অস্বীকার করবে না। কিন্তু মৃত্যুর আগমন এবং জীবনের শেষ নিশ্বাসের সাথে সাথেই তাকে নিজের এ প্রাসাদ এবং এর সমস্ত সাজসরঞ্জাম এ দুনিয়ায় ছেড়ে চলে যেতে হবে। এর কোন জিনিসও সে সংগে করে পরলোকে নিয়ে যেতে পারবে না। যদি সে আখেরাতে প্রাসাদ তৈরী করার জন্য কিছু না করে থাকে তাহলে তার এ প্রাসাদ তার সাথে সেখানে স্থানান্তরিত হবার কোন যুক্তিসংগত কারণ নেই। দুনিয়ায় সে যদি এমন সব কাজে প্রচেষ্টা নিয়োজিত করে যেগুলোর সাহায্যে আল্লাহর আইন অনুযায়ী আখেরাতে প্রাসাদ নির্মিত হয় তাহলে একমাত্র তখনই সে ওখানে কোন প্রাসাদ লাভ করতে পারে।

এখন প্রশ্ন করা যেতে পারে, এ যুক্তি দ্বারা তো শুধু এতটুকুই বুঝা যায় যে, সেখানে সে কোন প্রাসাদ পাবে না। কিন্তু প্রাসাদের পরিবর্তে সে আগুন লাভ করবে, এ কেমন কথা? এর জবাব হচ্ছে (কুরআনই বিভিন্ন সময় এ জবাবটি দিয়েছে) যে ব্যক্তি আখেরাতকে বাদ দিয়ে শুধুমাত্র দুনিয়ার জন্য কাজ করে সে অনিবার্য ও স্বাভাবিকভাবে এমন পদ্ধতিতে কাজ করে যার ফলে আখেরাতে প্রাসাদের পরিবর্তে আগুনের কুণ্ড তৈরী হয়। (সূরা ইয়াসীনের ১২ টীকা দেখুন)

وَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرٰی عَلَی اللّٰهِ كَذِبًا ؕ اُولٰٓئِكَ یُعْرَضُوْنَ عَلٰی رَبِّهِمْ وَیَقُوْلُ الْاَشْهَادُ هٰۤؤُلَآءِ الَّذِیْنَ كَذَبُوْا عَلٰی رَبِّهِمْ ۚ اَلَا لَعْنَةُ اللّٰهِ عَلَی الظّٰلِمِیْنَ ﴿۱۸﴾ الَّذِیْنَ یَصُدُّوْنَ عَنْ سَبِیْلِ اللّٰهِ وَیَبْغُوْنَهَا عِوَجًا ؕ وَهُمْ بِالْاٰخِرَةِ هُمْ كٰفِرُوْنَ ﴿۱۹﴾

আর যে ব্যক্তি আল্লাহর বিরুদ্ধে মিথ্যা রচনা করে তার চেয়ে বড় জালেম আর কে হবে?[২০] এ ধরনের লোকদের তাদের রবের সামনে উপস্থিত করা হবে এবং সাক্ষীরা সাক্ষ দেবে, এরাই নিজেদের রবের বিরুদ্ধে মিথ্যা রচনা করেছিল। শোনো, জালেমদের ওপর আল্লাহর লানত[২১]—এমন জালেমদের[২২] ওপর যারা আল্লাহর পথে যেতে মানুষকে বাধা দেয়, সেই পথকে বাঁকা করে দিতে চায়[২৩] এবং আখেরাত অস্বীকার করে।

১৭. অর্থাৎ যে ব্যক্তি নিজেই নিজের অস্তিত্ব, পৃথিবী ও আকাশের নির্মাণ এবং বিশ্ব–জাহানের শাসন–শৃংখলা বিধানের ক্ষেত্রে এ বিষয়ের সুস্পষ্ট সাক্ষলাভ করছিল যে, একমাত্র আল্লাহই এ দুনিয়ার স্রষ্টা, মালিক ও প্রতিপালক এবং এ সাক্ষ দেখে যার মনে আগে থেকেই বিশ্বাস জন্মাচ্ছিল যে, এ জীবনের পরে আরো কোন জীবন অবশ্যি হওয়া উচিত যেখানে মানুষ আল্লাহর কাছে তার কাজের হিসাব দেবে এবং নিজের কৃতকর্মের জন্য পুরস্কার ও শাস্তি লাভ করবে।

১৮. অর্থাৎ কুরআন এসে এ প্রকৃতিগত ও বুদ্ধিবৃত্তিক সাক্ষের প্রতি সমর্থন জ্ঞাপন করলো এবং তাকে জানালো তুমি বিশ্বপ্রকৃতিতে ও জীবন ক্ষেত্রে যার নিদর্শন ও পূর্বাভাস পেয়েছো প্রকৃতপক্ষে তাই সত্য।

১৯. বক্তব্যের যে প্রাসংগিক ধারাবাহিকতা চলে এসেছে তার প্রেক্ষিতে এ আয়াতের অর্থ হচ্ছে, যারা দুনিয়ার জীবনের বাহ্যিক দিকগুলো এবং তার আপাত চাকচিক্যে মুগ্ধ হয়ে গেছে তাদের জন্য কুরআনের দাওয়াত প্রত্যাখ্যান করা সহজ। কিন্তু যে ব্যক্তি নিজের অস্তিত্ব ও বিশ্ব–জাহানের ব্যবস্থাপনায় আগে থেকেই তাওহীদ ও আখেরাতের স্পষ্ট সাক্ষ–প্রমাণ পেয়ে আসছিল তারপর কুরআন এসে ঠিক সেই একই কথা বললো, যার সাক্ষ সে ইতিপূর্বে নিজের মধ্যে এবং বাইরেও পাচ্ছিল আর কুরআনের পূর্বে আগত আসমানী কিতাব থেকেও এর পক্ষে আরো সমর্থন পাওয়া গেলো, সে কেমন করে এসব শক্তিশালী সাক্ষ–প্রমাণের দিক থেকে চোখ ফিরিয়ে নিয়ে এ অস্বীকারকারীদের সুরে সুর মিলাতে পারে? এ উক্তি থেকে একথা পরিষ্কার জানা যায় যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কুরআন নাযিলের পূর্বেই ঈমান বিল গাইব–এর মনযিল অতিক্রম করেছিলেন। সূরা আন'আমে যেমন হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালাম সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, তিনি

أُولَٰئِكَ لَمْ يَكُونُوا مُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَمَا كَانَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ۘ يُضَاعَفُ لَهُمُ الْعَذَابُ ۚ مَا كَانُوا يَسْتَطِيعُونَ السَّمْعَ وَمَا كَانُوا يُبْصِرُونَ ﴿٢٠﴾ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴿٢١﴾ لَا جَرَمَ أَنَّهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمُ الْأَخْسَرُونَ ﴿٢٢﴾

—তারা[২৪] পৃথিবীতে আল্লাহকে অক্ষম করতে পারতো না এবং আল্লাহর মোকাবিলায় তাদের কোন সাহায্যকারী ছিল না। তাদেরকে এখন দ্বিগুণ আযাব দেয়া হবে।[২৫] তারা কারোর কথা শুনতেও পারতো না এবং তারা নিজেরা কিছু দেখতেও পেতো না। তারা এমন লোক যারা নিজেরাই নিজেদেরকে ক্ষতির মধ্যে ঠেলে দিয়েছে এবং তাদের মনগড়া সবকিছুই তাদের কাছ থেকে হারিয়ে গেছে।[২৬] অনিবার্যভাবে আখেরাতে তারাই হবে সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত।

নবী হবার আগেই বিশ্ব–জগতের নিদর্শনসমূহ প্রত্যক্ষ করে তাওহীদের তত্ত্বজ্ঞান লাভ করেছিলেন, ঠিক তেমনি এ আয়াত পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দিচ্ছে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামও চিন্তা–গবেষণার মাধ্যমে এ সত্যে উপনীত হয়েছিলেন। আর এর পর কুরআন এসে কেবল এর সত্যতা প্রমাণ এবং একে সুদৃঢ়ই করেনি বরং তাঁকে সরাসরি সত্যের প্রত্যক্ষ জ্ঞানও দান করেছে।

২০. আল্লাহর সার্বভৌম ক্ষমতা এবং তাঁর বন্দেগী লাভ করার অধিকারে অন্যকে শরীক করার কথা বলে। অথবা একথা বলে যে, নিজের বান্দাদের হেদায়াত ও গোমরাহীর ব্যাপারে আল্লাহর কোন আগ্রহ নেই এবং তিনি আমাদের পথ দেখাবার জন্য কোন কিতাব ও কোন নবী পাঠাননি। বরং তিনি আমাদের স্বাধীনভাবে ছেড়ে দিয়েছেন, যেভাবে ইচ্ছা আমরা আমাদের জীবন যাপন করতে পারি। অথবা বলে, আল্লাহ এমনি খেলাচ্ছলে আমাদের সৃষ্টি করেছেন এবং সেভাবে আমাদের খতমও করে দেবেন। তাঁর সামনে আমাদের কোন জবাবদিহি করতে হবে না। কাজেই আমাদের কোন পুরস্কার বা শাস্তিও লাভ করতে হবে না।

২১. এটা হচ্ছে আখেরাতের জীবনের বর্ণনা। সেখানে এ ঘোষণা দেয়া হবে।

২২. এটা প্রসংগক্রমে মাঝখানে বলা একটা বাক্য। যেসব জালেমের ওপর পরকালে আল্লাহর লানতের কথা ঘোষণা করা হবে তারা হবে এমনসব লোক যারা আজ দুনিয়ায় এ ধরনের কাজ করে যাচ্ছে।

২৩. অর্থাৎ তাদের সামনে এই যে সোজা পথ পেশ করা হচ্ছে এ পথ তারা পছন্দ করে না। তারা চায় এ পথ যদি তাদের মানসিক প্রবৃত্তি এবং তাদের জাহেলী স্বার্থ–

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَخْبَتُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٣﴾ مَثَلُ الْفَرِيقَيْنِ كَالْأَعْمَىٰ وَالْأَصَمِّ وَالْبَصِيرِ وَالسَّمِيعِ ۚ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا ۚ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴿٢٤﴾

তবে যারা ঈমান আনে, সৎকাজ করে এবং নিজের রবের একনিষ্ঠ অনুগত বান্দা হয়ে থাকে, তারা নিশ্চিত জান্নাতের অধিবাসী এবং জান্নাতে তারা চিরকাল থাকবে।[২৭] এ দল দু'টির উপমা হচ্ছে ঃ যেমন একজন লোক অন্ধ ও বধির এবং অন্যজন চক্ষুষ্মান ও শ্রবণ শক্তি সম্পন্ন। এরা দু'জন কি সমান হতে পারে? তোমরা (এ উপমা থেকে) কি কোন শিক্ষা গ্রহণ করো না?

প্রীতি–বিদ্বেষ ও তাদের ধারণা–কল্পনা অনুযায়ী বাঁকা হয়ে যায় তাহলেই তারা তা গ্রহণ করবে।

২৪. এখানে আবার আখেরাতের জীবনের বর্ণনা দেয়া হচ্ছে।

২৫. একটি আযাব হবে নিজের গোমরাহ হবার জন্য এবং আর একটি আযাব হবে অন্যদেরকে গোমরাহ করার এবং পরবর্তী বংশধরদের জন্য গোমরাহীর উত্তরাধিকার রেখে যাবার জন্য। (দেখুন সূরা আরাফের ৩০ টীকা)

২৬. অর্থাৎ তারা আল্লাহ, বিশ্ব–জগত এবং নিজেদের অস্তিত্ব সম্পর্কে যেসব মতবাদ তৈরী করে নিয়েছিল তা সবই ভিত্তিহীন হয়ে গিয়েছিল। নিজেদের উপাস্য, সুপারিশকারী ও পৃষ্ঠপোষকদের ওপর যেসব আস্থা স্থাপন করেছিল সেগুলোও মিথ্যা প্রমাণিত হয়েছিল। আর মৃত্যুর পরের জীবন সম্পর্কে যেসব চিন্তা–অনুমান করে রেখেছিল তাও ভুল প্রমাণিত হয়েছিল।

২৭. এখানে আখেরাতের জীবনের বর্ণনা খতম হয়ে গেছে।

২৮. অর্থাৎ এ দু'জনের কাজের ধারা এবং সবশেষে এদের পরিণাম কি এক রকম হতে পারে? যে ব্যক্তি নিজেই পথ দেখে না এবং এমন কোন লোকের কথাও শোনে না, যে তাকে পথের কথা বলছে, সে নিশ্চয়ই কোথাও ধাক্কা খাবে এবং মারাত্মক ধরনের দুর্ঘটনার সম্মুখীন হবে। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি নিজে পথ দেখতে পাচ্ছে এবং কোন পথের সন্ধান জানা লোকের পথনির্দেশনারও সাহায্য গ্রহণ করেছে সে নিশ্চয়ই নিরাপদে নিজের মনযিলে পৌঁছে যাবে। উল্লেখিত দু'জন লোকের মধ্যেও এ একই পর্যায়ের পার্থক্য রয়েছে। তাদের একজন স্বচক্ষেও বিশ্ব–জগতে মহা সত্যের নিদর্শনসমূহ প্রত্যক্ষ করে এবং আল্লাহর পাঠানো পথপ্রদর্শকদের কথাও শোনে আর অন্য জন আল্লাহর নিদর্শনসমূহ দেখার জন্য নিজের চোখ খোলা রাখে না এবং নবীদের কথাও শোনে না। জীবনক্ষেত্রে এদের উভয়ের কার্যধারা এক রকম হবে কেমন করে? তারপর তাদের পরিণামের মধ্যে পার্থক্যই বা হবে না কেন?

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ (২৫) أَن لَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ ۖ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ أَلِيمٍ (২৬) فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن قَوْمِهِ مَا نَرَاكَ إِلَّا بَشَرًا مِّثْلَنَا وَمَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَاذِلُنَا بَادِيَ الرَّأْيِ وَمَا نَرَىٰ لَكُمْ عَلَيْنَا مِن فَضْلٍ بَلْ نَظُنُّكُمْ كَاذِبِينَ (২৭)

৩ রুকূ'

(আর এমনি অবস্থা ছিল যখন) আমি নূহকে তার কওমের কাছে পাঠিয়েছিলাম।[২৯] (সে বললোঃ) "আমি তোমাদের পরিষ্কার ভাষায় সাবধান করে দিচ্ছি, তোমরা আল্লাহ ছাড়া আর কারোর বন্দেগী করো না। নয়তো আমার আশংকা হচ্ছে তোমাদের ওপর একদিন যন্ত্রণাদায়ক আযাব আসবে।"[৩০] জবাবে সেই কওমের সরদাররা, যারা তার কথা মানতে অস্বীকার করেছিল, বললো ঃ "আমাদের দৃষ্টিতে তুমি তো ব্যস আমাদের মতো একজন মানুষ বৈ আর কিছুই নও।[৩১] আর আমরা তো দেখছি আমাদের সমাজের মধ্যে যারা অত্যন্ত নিকৃষ্ট ও নিম্নশ্রেণীর ছিল তারাই কোন প্রকার চিন্তা-ভাবনা না করে তোমার অনুসরণ করেছে।[৩২] আমরা এমন কোন জিনিসও দেখছি না যাতে তোমরা আমাদের চেয়ে অগ্রবর্তী আছো।[৩৩] বরং আমরা তো তোমাদের মিথ্যাবাদী মনে করি।"

২৯. এ প্রসংগে সূরা আরাফের ৮ রুকূ'র টীকাগুলো সামনে রাখলে ভালো হয়।

৩০. এ সূরার শুরুতে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মুখেও এ এক কথাই উচ্চারিত হয়েছে।

৩১. মক্কার লোকেরা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিরুদ্ধে যে মূর্খ জনোচিত আপত্তি উত্থাপন করতো এখানেও সেই একই আপত্তি উত্থাপন করা হয়েছে। অর্থাৎ যে ব্যক্তি আমাদেরই মতো একজন মামুলি পর্যায়ের লোক, খায় দায়, চলাফেরা করে, ঘুমায় আবার জেগে থাকে, ছেলেমেয়ের বাপ হয়, তাকে আমরা কেমন করে আল্লাহর পক্ষ থেকে নবী নিযুক্ত হয়ে এসেছেন বলে মেনে নিতে পারি? (দেখুন সূরা ইয়াসীন, ১১ টীকা)

৩২. মক্কার বড় বড় ও উঁচু শ্রেণীর লোকেরা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সম্পর্কে যে কথা বলতো এখানেও তারই পুনরাবৃত্তি হয়েছে। তারা বলতো, এর সাথে কারা আছে? ক'জন মাথাগরম ছোকরা, যাদের দুনিয়ার কোন অভিজ্ঞতাই নেই।

قَالَ يٰقَوۡمِ اَرَءَيۡتُمۡ اِنۡ كُنۡتُ عَلٰى بَيِّنَةٍ مِّنۡ رَّبِّىۡ وَاٰتٰٮنِىۡ رَحۡمَةً مِّنۡ عِنۡدِهٖ فَعُمِّيَتۡ عَلَيۡكُمۡ ؕ اَنُلۡزِمُكُمُوۡهَا وَاَنۡتُمۡ لَهَا كٰرِهُوۡنَ ﴿۲۸﴾ وَيٰقَوۡمِ لَاۤ اَسۡـَٔلُكُمۡ عَلَيۡهِ مَالًا ؕ اِنۡ اَجۡرِىَ اِلَّا عَلَى اللّٰهِ وَمَاۤ اَنَا بِطَارِدِ الَّذِيۡنَ اٰمَنُوۡا ؕ اِنَّهُمۡ مُّلٰقُوۡا رَبِّهِمۡ وَلٰـكِنِّىۡۤ اَرٰٮكُمۡ قَوۡمًا تَجۡهَلُوۡنَ ﴿۲۹﴾

সে বললো, " হে আমার কওম! একটু ভেবে দেখো, যদি আমি আমার রবের পক্ষ থেকে একটি স্পষ্ট সাক্ষ-প্রমাণের ওপর প্রতিষ্ঠিত থেকে থাকি এবং তারপর তিনি আমাকে তাঁর বিশেষ রহমত দান করে থাকেন[৩৪] কিন্তু তা তোমাদের নজরে পড়েনি, তাহলে আমার কাছে এমন কি উপায় আছে যার সাহায্যে তোমরা মানতে না চাইলেও আমি জবরদস্তি তোমাদের ঘাড়ে তা চাপিয়ে দিবো? হে আমার কওম! এ কাজের জন্য আমি তোমাদের কাছে কোন অর্থ চাচ্ছি না।[৩৫] আমার প্রতিদান তো আল্লাহর কাছেই রয়েছে। আর যারা আমার কথা মেনে নিয়েছে তাদেরকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দেয়াও আমার কাজ নয়, তারা নিজেরাই নিজেদের রবের কাছে যাবে।[৩৬] কিন্তু আমি দেখছি তোমরা মূর্খতার পরিচয় দিয়ে যাচ্ছ।

অথবা কয়েকজন গোলাম এবং নিম্ন শ্রেণীর কিছু সাধারণ মানুষ, যাদের বুদ্ধিশুদ্ধি নেই এবং বিশ্বাসের দিক দিয়েও কমজোর। (দেখুন সূরা আন'আম ৩৪-৩৭ টীকা এবং সূরা ইউনূস ৭৮ টীকা)।

৩৩. অর্থাৎ তোমরা বলে থাকো, আমাদের প্রতি রয়েছে আল্লাহর অনুগ্রহ ও তাঁর রহমত এবং যারা আমাদের পথ অবলম্বন করেনি তারা আল্লাহর গযবের সম্মুখীন হয়েছে। তোমাদের এসব কথার কোন আলামত আমাদের নজরে পড়ে না। অনুগ্রহ যদি হয়ে থাকে তাহলে তা আমাদের প্রতি হয়েছে। কারণ আমরা ধন-দৌলত ও শান-শওকতের অধিকারী এবং একটি বিরাট জনগোষ্ঠী আমাদের নেতৃত্ব মেনে নিয়েছে। অন্যদিকে তোমরা কপর্দক শূন্য দেউলিয়ার দল, কোন্ বিষয়ে তোমরা আমাদের চেয়ে এগিয়ে আছো? তোমাদের আল্লাহর প্রিয়পাত্র মনে করা হবে কেন?

৩৪. আগের রুকূ'তে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মুখ দিয়ে যে কথা উচ্চারিত হয়েছে এখানে তারই পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে। বলা হয়েছে, প্রথমে আমি বিশ্ব-জাহান ও মানুষের মধ্যে আল্লাহর নিদর্শনাবলী দেখে তাওহীদের মূল তত্ত্বে পৌঁছে গিয়েছিলাম। তারপর আল্লাহ তাঁর নিজের রহমতের (অর্থাৎ অহী) মাধ্যমে আমাকে সরাসরি

وَيٰقَوْمِ مَنْ يَّنْصُرُنِيْ مِنَ اللّٰهِ اِنْ طَرَدْتُّهُمْ ؕ اَفَلَا تَذَكَّرُوْنَ ۝ وَلَاۤ اَقُوْلُ لَكُمْ عِنْدِيْ خَزَآئِنُ اللّٰهِ وَلَاۤ اَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَاۤ اَقُوْلُ اِنِّيْ مَلَكٌ وَّلَاۤ اَقُوْلُ لِلَّذِيْنَ تَزْدَرِيْۤ اَعْيُنُكُمْ لَنْ يُّؤْتِيَهُمُ اللّٰهُ خَيْرًا ؕ اَللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا فِيْۤ اَنْفُسِهِمْ ۚ اِنِّيْۤ اِذًا لَّمِنَ الظّٰلِمِيْنَ ۝

আর হে আমার কওম! যদি আমি তাদেরকে তাড়িয়ে দেই তাহলে আল্লাহর পাকড়াও থেকে কে আমাকে বাঁচাবে? তোমরা কি এতটুকু কথাও বোঝ না? আমি তোমাদের একথা বলি না যে, আমার কাছে আল্লাহর ধনভাণ্ডার আছে। একথাও বলি না যে, আমি অদৃশ্যের জ্ঞান রাখি এবং আমি ফেরেশ্‌তা এ দাবীও করি না।[৩৭] আর আমি একথাও বলতে পারি না যে, তোমরা যাদেরকে অবজ্ঞার দৃষ্টিতে দেখো তাদেরকে আল্লাহ কখনো কোন কল্যাণ দান করবেন না। তাদের মনের অবস্থা আল্লাহই ভালো জানেন। যদি আমি এমনটি বলি তাহলে আমি হবো জালেম"।

এ সত্যগুলোর জ্ঞান দান করেছেন। আমার মন ইতিপূর্বেই এগুলোর পক্ষে সাক্ষ দিয়ে আসছিল। এ থেকে এও জানা যায় যে, নবুওয়াত লাভ করার আগেই সকল নবী অনুসন্ধান ও চিন্তা–গবেষণার মাধ্যমে ঈমান বিল গাইব তথা অদৃশ্যে বিশ্বাস লাভ করে থাকেন। তারপর মহান আল্লাহ নবুওয়াতের মর্যাদা দান করার সময় তাঁদেরকে ঈমান বিশ্ শাহাদাত অর্থাৎ প্রত্যক্ষ দর্শন লব্ধ বিশ্বাস দান করে থাকেন।

৩৫. আমি একজন নিস্বার্থ উপদেশদাতা। নিজের কোন লাভের জন্য নয় বরং তোমাদেরই ভালোর জন্য এত কঠোর পরিশ্রম ও দুঃখ–কষ্ট সহ্য করছি। এ সত্যের দাওয়াত দেবার, এর জন্য প্রাণান্ত পরিশ্রম করার ও বিপদ–মুসিবতের সম্মুখীন হবার পেছনে আমার কোন ব্যক্তিগত স্বার্থ সক্রিয় আছে এমন কথা তোমরা প্রমাণ করতে পারবে না। (দেখুন আল মুমিনূন ৭০ টীকা, ইয়াসীন ১৭ টীকা, আশ শূরা ৪১ টীকা)।

৩৬. অর্থাৎ তাদের রবই তাদের মর্যাদা সম্পর্কে ভালোভাবে অবগত আছেন। তাঁর সামনে যাবার পরই তাদের সবকিছু প্রকাশিত হবে। তারা যদি সত্যিকার মহামূল্যবান রত্ন হয়ে থাকে তাহলে তোমাদের ছুঁড়ে ফেলার কারণে তারা তুচ্ছ মূল্যহীন পাথরে পরিণত হয়ে যাবে না। আর যদি তারা মূল্যহীন পাথরই হয়ে থাকে তাহলে তাদের মালিকের ইচ্ছা, তিনি তাদেরকে যেখানে চান ছুঁড়ে ফেলতে পারেন। (দেখুন সূরা আন'আম ৫২ আয়াত এবং সূরা কাহাফ ২৮ আয়াত)।

৩৭. বিরোধী পক্ষ তাঁর ব্যাপারে আপত্তি উথাপন করে বলেছিল, তোমাকে তো আমরা আমাদেরই মত একজন মানুষ দেখছি। তাদের আপত্তির জবাবে একথা বলা হয়েছিল। এখানে

قَالُوْا يٰنُوْحُ قَدْ جٰدَلْتَنَا فَاَكْثَرْتَ جِدَالَنَا فَاْتِنَا بِمَا تَعِدُنَآ اِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ ﴿٣٢﴾ قَالَ اِنَّمَا يَاْتِيْكُمْ بِهِ اللّٰهُ اِنْ شَآءَ وَمَآ اَنْتُمْ بِمُعْجِزِيْنَ ﴿٣٣﴾ وَلَا يَنْفَعُكُمْ نُصْحِيْٓ اِنْ اَرَدْتُّ اَنْ اَنْصَحَ لَكُمْ اِنْ كَانَ اللّٰهُ يُرِيْدُ اَنْ يُّغْوِيَكُمْ ؕ هُوَ رَبُّكُمْ ۫ وَاِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ ﴿٣٤﴾

শেষ পর্যন্ত তারা বললো, " হে নূহ! তুমি আমাদের সাথে ঝগড়া করেছো, অনেক ঝগড়া করেছো, যদি সত্যবাদী হও তাহলে এখন আমাদের যে আযাবের ভয় দেখাচ্ছো তা নিয়ে এসো।" নূহ জবাব দিল, "তা তো আল্লাহই আনবেন যদি তিনি চান এবং তা প্রতিহত করার ক্ষমতা তোমাদের নেই। এখন যদি আমি তোমাদের কিছু মংগল করতে চাইও তাহলে আমার মংগলাকাংখা তোমাদের কোন কাজে লাগবে না যখন আল্লাহ নিজেই তোমাদের বিভ্রান্ত করার এরাদা করে ফেলেছেন।৩৮ তিনিই তোমাদের রব এবং তাঁরই দিকে তোমাদের ফিরে যেতে হবে।"

হযরত নূহ (আ) বলেন, যথার্থই আমি একজন মানুষ। একজন মানুষ হওয়া ছাড়া নিজের ব্যাপারে তো আমি আর কিছুই দাবী করিনি। তাহলে তোমরা আমার বিরুদ্ধে এ আপত্তি উঠাচ্ছো কেন? আমি শুধু এতটুকুই দাবী করি যে, আল্লাহ আমাকে জ্ঞান ও কর্মের সহজ সোজা পথ দেখিয়েছেন। তোমরা যেভাবে ইচ্ছা এ ব্যাপারটির পরীক্ষা করে নাও। কিন্তু এ দাবীর ব্যাপারটি পরীক্ষা করার এ কোন্ ধরনের পদ্ধতি যে, কখনো তোমরা আমার কাছে গায়েবের খবর জিজ্ঞেস করো, কখনো এমন ধরনের অদ্ভুত দাবী উত্থাপন করতে থাকো যাতে মনে হয় যেন আল্লাহর ভাণ্ডারের সমস্ত চাবী আমার কাছে আছে আবার কখনো আপত্তি করতে থাকো যে, আমি মানুষের মতো আহার-বিহার করি কেন? যেন মনে হয় আমি ফেরেশতা হবার দাবী করেছিলাম। যে ব্যক্তি আকীদা-বিশ্বাস, চরিত্র-নৈতিকতা ও সমাজ-সংস্কৃতির ব্যাপারে সঠিক পথের দিশা দেবার দাবী করেছে তাকে এ জিনিসগুলোর ব্যাপারে যে কোন প্রশ্ন চাও করতে পারো। কিন্তু তোমরা দেখি অদ্ভুত লোক। তোমরা তাকে জিজ্ঞেস করছো অমুকের মোষের নর-বাচ্চা হবে না মাদী-বাচ্চা? প্রশ্ন হলো মানুষের জীবনের জন্য সঠিক নৈতিক ও তামাদ্দুনিক নীতি বর্ণনা করার সাথে মোষের বাচ্চা প্রসব করার কোন সম্পর্ক আছে কি? (দেখুন সূরা আনআম, ৩১ ও ৩২ টীকা)

৩৮. অর্থাৎ আল্লাহ যদি তোমাদের হঠকারিতা, দুর্মতি এবং সদাচারে আগ্রহহীনতা দেখে এ ফায়সালা করে থাকেন যে, তোমাদের সঠিক পথে চলার সুযোগ আর দেবেন না এবং যেসব পথে তোমরা উদভ্রান্তের মতো ঘুরে বেড়াতে চাও সেসব পথে তোমাদের ছেড়ে

أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَىٰهُ ۖ قُلْ إِنِ افْتَرَيْتُهُۥ فَعَلَىَّ إِجْرَامِى وَأَنَا۠ بَرِىٓءٌ مِّمَّا تُجْرِمُونَ ۝٣٥

হে মুহাম্মাদ ! এরা কি একথা বলে যে, এ ব্যক্তি নিজেই সবকিছু রচনা করেছে ? ওদেরকে বলে দাও, "যদি আমি নিজে এসব রচনা করে থাকি, তাহলে আমার অপরাধের দায়-দায়িত্ব আমার। আর যে অপরাধ তোমরা করে যাচ্ছো তার জন্য আমি দায়ী নই।"৩৯

দেবেন তাহলে এখন আর তোমাদের কল্যাণের জন্য আমার কোন প্রচেষ্টা সফলকাম হতে পারে না।

৩৯. বক্তব্যের ধরন থেকে মনে হচ্ছে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মুখ থেকে হযরত নূহের (আ) এ কাহিনী শুনে বিরোধীরা আপত্তি করে থাকবে যে, মুহাম্মাদ (সা) আমাদের ওপর প্রয়োগ করার উদ্দেশ্যে নিজেই এ কাহিনী বানিয়ে পেশ করছে। যেসব আঘাত সে সরাসরি আমাদের ওপর করতে চায় না সেগুলোর জন্য সে একটি কাহিনী তৈরী করেছে এবং এভাবে "ঝিকে মেরে বৌকে শেখানো"র মতো আমাদের ওপর আক্রমণ চালায়। এ কারণে বক্তব্যের ধারাবাহিকতা ভেংগে এ বাক্যে তাদের আপত্তির জবাব দেয়া হয়েছে।

আসলে হীনমনা লোকদের দৃষ্টি সবসময় কোন বিষয়ের খারাপ দিকের প্রতিই পড়ে থাকে। ভালোর প্রতি তাদের কোন আগ্রহ না থাকায় ভালো দিকের প্রতি তাদের দৃষ্টিই যায় না। কোন ব্যক্তি যদি তোমাদের কোন জ্ঞানের কথা বলে থাকে অথবা কোন সুশিক্ষা দিতে থাকে কিংবা তোমাদের কোন ভুলের দরুন তোমাদের সতর্ক করে, তাহলে তা থেকে ফায়দা হাসিল করো এবং নিজেদের সংশোধন করে নাও। কিন্তু হীন লোকেরা সবসময় তার মধ্যে দুষ্কৃতির এমন কোন বিষয় খুঁজবে যার ফলে জ্ঞান ও উপদেশ ব্যর্থ হয়ে যাবে এবং তারা নিজেরা কেবল দুষ্কৃতির ওপর প্রতিষ্ঠিতই থাকবে না বরং বক্তার গায়েও কিছু দুষ্কৃতির ছাপ লাগিয়ে দেবে। সর্বোত্তম উপদেশও নষ্ট করে দেয়া যেতে পারে যদি শ্রোতা তাকে কল্যাণকামিতার পরিবর্তে "আঘাত" করার অর্থে গ্রহণ করে এবং সে মানসিকভাবে নিজের ভুল উপলব্ধি ও অনুভব করার পরিবর্তে কেবল বিরূপ মনোভাবই পোষণ করতে থাকে। তারপর এ ধরনের লোকেরা হামেশা নিজেদের চিন্তার ভিত্ গড়ে তোলে একটি মৌলিক কুধারণার ওপর। কোন একটি বক্তব্য নিরেট সত্য অথবা স্রেফ একটি বানোয়াট কাহিনী উভয়ই হতে পারে। এ উভয় রকমের সম্ভাবনা যেখানে সমান সমান, সেখানে বক্তব্যটি যদি কারোর অবস্থার সাথে পুরোপুরি খাপ খেয়ে যায় এবং তাতে তার কোন ভুলের প্রতি অংগুলি নির্দেশ থাকে, তাহলে সে ক্ষেত্রে একজন প্রকৃত জ্ঞানী ও বুদ্ধিমান ব্যক্তির কাজ হবে তাকে একটি যথার্থ সত্য কথা মনে করে তার শিক্ষণীয় দিক থেকে ফায়দা হাসিল করা। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি কোন প্রকার সাক্ষ-প্রমাণ ছাড়াই এ মর্মে দোষারোপ করে যে, বক্তা নিছক তার ওপর চাপিয়ে দেবার জন্য এ মনগড়া কাহিনী রচনা করেছে তাহলে সে হবে নেহাতই একজন কুধারণা পোষক ও বক্র দৃষ্টির অধিকারী ব্যক্তি।

وَأُوحِيَ إِلَىٰ نُوحٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْ آمَنَ فَلَا
تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ﴿٣٦﴾ وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا
وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا ۚ إِنَّهُم مُّغْرَقُونَ ﴿٣٧﴾ وَيَصْنَعُ
الْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ ۚ قَالَ إِن
تَسْخَرُوا مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ ﴿٣٨﴾ فَسَوْفَ
تَعْلَمُونَ مَن يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُّقِيمٌ ﴿٣٩﴾

৪ রুকূ'

নূহের প্রতি অহী নাযিল করা হলো এ মর্মে যে, তোমার কওমের মধ্য থেকে যারা ইতিমধ্যে ঈমান এনেছে, তারা ছাড়া এখন আর কেউ ঈমান আনবে না। তাদের কৃতকর্মের জন্য দুঃখ করা পরিহার করো এবং আমার তত্ত্বাবধানে আমার অহী অনুযায়ী একটি নৌকা বানানো শুরু করে দাও। আর দেখো যারা জুলুম করেছে তাদের জন্য আমার কাছে কোন সুপারিশ করো না, এরা সবাই এখন ডুবে যাবে।[৪০]

নূহ যখন নৌকা নির্মাণ করছিল তখন তার কওমের সরদারদের মধ্য থেকে যারাই তার কাছ দিয়ে যেতো তারাই তাকে উপহাস করতো। সে বললো, "যদি তোমরা আমাকে উপহাস করো তাহলে আমিও তোমাদের উপহাস করছি। শিগ্‌গীর তোমরা জানতে পারবে কার ওপর লাঞ্ছনাকর আযাব নাযিল হবে এবং কার ওপর এমন আযাব নাযিল হবে যা ঠেকাতে চাইলেও ঠেকানো যাবে না।[৪১]

এ কারণে বলা হয়েছে, যদি আমি এ কাহিনী তৈরী করে থাকি তাহলে আমার অপরাধের জন্য আমি দায়ী কিন্তু তোমরা যে অপরাধ করছো তা তো যথাস্থানে অপরিবর্তিত রয়ে গেছে। তার জন্য আমি নই, তোমরাই দায়ী হবে এবং তোমরাই পাকড়াও হবে।

৪০. এ থেকে জানা যায়, কোন জাতির কাছে যখন নবীর পয়গাম পৌঁছে যায় তখন সে কেবল ততক্ষণ পর্যন্ত অবকাশ পায় যতক্ষণ তার মধ্যে কিছু সৎ ব্যক্তির বেরিয়ে আসার সম্ভাবনা থাকে। কিন্তু যখন তার সমস্ত সত্যনিষ্ঠ লোক বের হয়ে যায় এবং সেখানে কেবল অসৎ ও বিপর্যয় সৃষ্টিকারী লোকেরাই অবশিষ্ট থেকে যায় তখন আল্লাহ সেই জাতিকে আর অবকাশ দেন না। তখন তার রহমতই দাবী জানাতে থাকে যে, পঁচা ফলের

حَتّٰۤى اِذَا جَآءَ اَمْرُنَا وَفَارَ التَّنُّوْرُ ۙ قُلْنَا احْمِلْ فِيْهَا مِنْ كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَاَهْلَكَ اِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ وَمَنْ اٰمَنَ ؕ وَمَاۤ اٰمَنَ مَعَهٗۤ اِلَّا قَلِيْلٌ ۝٤٠

অবশেষে যখন আমার হুকুম এসে গেলো এবং চুলা উথলে উঠলো[৪২] তখন আমি বললাম, "সব ধরনের প্রাণীর এক এক জোড়া নৌকায় তুলে নাও। নিজের পরিবারবর্গকেও—তবে তাদের ছাড়া যাদেরকে আগেই চিহ্নিত করা হয়েছে[৪৩] —এতে তুলে নাও এবং যারা ঈমান এনেছে তাদেরকে এতে বসাও।"[৪৪] তবে সামান্য সংখ্যক লোকই নূহের সাথে ঈমান এনেছিল।

ঝুড়ি সদৃশ ঐ জাতিটাকে দূরে ছুড়ে ফেলে দেয়া হোক যাতে তা ভালো ফলগুলোকেও নষ্ট না করে দেয়। এ অবস্থায় তার প্রতি সদয় হওয়া আসলে সারা দুনিয়াবাসী এবং এ সংগে ভবিষ্যত বংশধরদের প্রতিও নির্দয় আচরণ করার নামান্তর হয়ে দাঁড়ায়।

৪১. এটি একটি চমকপ্রদ ব্যাপার। এ সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করলে বুঝা যায়, মানুষ দুনিয়ার বাইরের চেহারা দেখে কেমন প্রতারিত হয়। যখন নূহ আলাইহিস সালাম সাগর থেকে অনেক দূরে শুকনো স্থলভূমির ওপর নিজের জাহাজটি নির্মাণ করছিলেন তখন যথার্থই লোকদের দৃষ্টিতে তাঁর এ কাজটি অত্যন্ত হাস্যকর মনে হয়ে থাকবে এবং তারা হয়তো হাসতে হাসতে বলে থাকবে, "মিয়া সাহেবের পাগলামী শেষ পর্যন্ত এতদূর পৌঁছে গেছে যে, এবার তিনি শুকনো ডাংগায় জাহাজ চালাবেন।" সেদিন তাদের কেউ স্বপ্নেও ভাবতে পারেনি যে, কয়েকদিন পরে সত্যিই এখানে জাহাজ চলবে। তারা এ কাজটিকে হযরত নূহ আলাইহিস সালামের মস্তিষ্ক বিকৃতির একটি সুস্পষ্ট প্রমাণ গণ্য করে থাকবে এবং পরস্পরকে বলে থাকবে, যদি ইতিপূর্বে এ ব্যক্তির পাগলামির ব্যাপারে তোমাদের মনে কোন সন্দেহ থেকে থাকে তাহলে এবার নিজের চোখে দেখে নাও কি কাণ্ডটা সে এখন করছে। কিন্তু যে ব্যক্তি প্রকৃত সত্য ব্যাপার জানতো এবং আগামীকাল এখানে জাহাজের কি রকম প্রয়োজন হবে একথা যার জানা ছিল সে উল্টো তাদের অজ্ঞতা ও প্রকৃত ব্যাপার না জানা এবং তদুপরি তাদের বোকার মতো নিশ্চিন্ত থাকার ব্যাপারটি নিয়ে নিশ্চয়ই হেসে থাকবে।

সে নিশ্চয়ই বলে থাকবে "কত বড় অজ্ঞ নাদান এ লোকগুলো, এদের মাথার ওপর উদ্যত মৃত্যুর খড়গ, আমি এদেরকে সাবধানও করে দিলাম যে, সেই খড়গ মাথার ওপর পড়ার উপক্রম হয়েছে এবং এরপর এদের চোখের সামনেই তার হাত থেকে বাঁচার জন্য আমি নিজেও প্রস্তুতি গ্রহণ করছি কিন্তু এরা নিশ্চিন্তে বসে রয়েছে এবং উলটো আমাকেই পাগল মনে করছে। এ বিষয়টিকে যদি একটু বিস্তারিতভাবে ভেবে দেখা যায় তাহলে বুঝা যাবে যে, দুনিয়ায় বাহ্যিক ও স্থূল জ্ঞানের আলোকে বুদ্ধিমত্তা ও নির্বুদ্ধিতার যে মানদণ্ড নির্ধারণ করা হয় তা প্রকৃত ও যথার্থ সত্য জ্ঞানের আলোকে নির্ধারিত মানদণ্ডের তুলনায়

কত বেশী ভিন্নতর হয়ে থাকে। বাহ্য দৃষ্টিতে যে ব্যক্তি দেখে, সে যে জিনিসটিকে চরম বুদ্ধিমত্তা মনে করে, প্রকৃত সত্যদর্শীর চোখে তা হয় চরম নির্বুদ্ধিতা। অন্যদিকে বাহ্যদর্শীর চোখে যে জিনিসটি একেবারেই অর্থহীন, পুরোপুরি পাগলামি ও নেহাত হাস্যকর ছাড়া আর কিছুই নয়, সত্যদর্শীর কাছে তা–ই পরম জ্ঞানগর্ভ, সুচিন্তিত ও গুরুত্বের অধিকারী এবং বুদ্ধিবৃত্তির যথার্থ দাবী হিসেবে পরিগণিত হয়।

৪২. এ সম্পর্কে মুফাসসিরগণের বিভিন্ন উক্তি পাওয়া যায়। কিন্তু কুরআনের সুস্পষ্ট বক্তব্য থেকে যা বুঝা যায় সেটিকেই আমরা সঠিক মনে করি। কুরআনের বক্তব্য থেকে বুঝা যায়, প্লাবনের সূচনা হয় একটি বিশেষ চুলা থেকে। তার তলা থেকে পানির স্রোত বের হয়ে আসে। তারপর একদিকে আকাশ থেকে মুশল ধারে বৃষ্টি হতে থাকে এবং অন্যদিকে বিভিন্ন জায়গায় মাটি ফুঁড়ে পানির ফোয়ারা বেরিয়ে আসতে থাকে। এখানে কেবল চুলা থেকে পানি উথলে ওঠার কথা বলা হয়েছে এবং সামনের দিকে গিয়ে বৃষ্টির দিকে ইংগিত করা হয়েছে। কিন্তু সূরা 'কামারে' এর বিস্তারিত বর্ণনা দেয়া হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে।

فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُّنْهَمِرٍ وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَى أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ –

"আমি আকাশের দরজা খুলে দিলাম। এর ফলে অনবরত বৃষ্টি পড়তে লাগলো। মাটিতে ফাটল সৃষ্টি করলাম। ফলে চারদিকে পানির ফোয়ারা বের হতে লাগলো। আর যে কাজটি নির্ধারিত করা হয়েছিল এ দু' ধরনের পানি তা পূর্ণ করার জন্য পাওয়া গেলো।"

তাছাড়া "তান্নূর" (চুলা) শব্দটির ওপর আলিফ–লাম বসানোর মাধ্যমে একথা প্রকাশ করা হয় যে, একটি বিশেষ চুলাকে আল্লাহ এ কাজ শুরু করার জন্য নির্দিষ্ট করেছিলেন। ইশারা পাওয়ার সাথে সাথেই চুলাটির তলা ঠিক সময়মতো ফেটে পানি উথলে ওঠে। পরে এ চুলাটিই প্লাবনের চুলা হিসেবে পরিচিত হয়। সূরা মুমিনূনের ২৭ আয়াতে স্পষ্ট বলে দেয়া হয়েছে যে, এ চুলাটির কথা আগেই বলে দেয়া হয়েছিল।

৪৩. অর্থাৎ তোমার পরিবারের যেসব লোকের কথা আগেই বলে দেয়া হয়েছে যে, তারা কাফের এবং আল্লাহর রহমতের অধিকারী নয় তাদেরকে নৌকায় ওঠাবে না। সম্ভবত এরা ছিল দু'জন। একজন ছিল হযরত নূহের (আ) ছেলে। তার ডুবে যাওয়ার কথা সামনেই এসে যাচ্ছে। অন্যজন ছিল হযরত নূহের (আ) স্ত্রী। সূরা তাহরীমে এর আলোচনা এসেছে। সম্ভবত পরিবারের অন্যান্য লোকজনও এ তালিকার অন্তরভুক্ত হতে পারে। কিন্তু কুরআনে তাদের নাম নেই।

৪৪. যেসব ঐতিহাসিক ও নৃ-বিজ্ঞানী সমগ্র মানবজাতির বংশধারা হযরত নূহ আলাইহিস সালামের তিন ছেলের সাথে সংযুক্ত করেন, এখান থেকে তাদের মতবাদ ভ্রান্ত প্রমাণিত হয়। আসলে ইসরাঈলী পৌরাণিক বর্ণনাগুলো এ বিভ্রান্তির উৎস। সেখানে বলা হয়েছে যে, নূহের প্লাবনের হাত থেকে হযরত নূহ (আ) ও তার তিন ছেলে এবং তাদের স্ত্রীরা

وَقَالَ ارْكَبُوْا فِيْهَا بِسْمِ اللّٰهِ مَجْرٖىهَا وَمُرْسٰىهَا ؕ اِنَّ رَبِّىْ لَغَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿٤١﴾ وَهِىَ تَجْرِىْ بِهِمْ فِىْ مَوْجٍ كَالْجِبَالِ ۫ وَنَادٰى نُوْحُ ِۨابْنَهٗ وَكَانَ فِىْ مَعْزِلٍ يّٰبُنَىَّ ارْكَبْ مَّعَنَا وَلَا تَكُنْ مَّعَ الْكٰفِرِيْنَ ﴿٤٢﴾ قَالَ سَاٰوِىْۤ اِلٰى جَبَلٍ يَّعْصِمُنِىْ مِنَ الْمَآءِ ؕ قَالَ لَا عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ اَمْرِ اللّٰهِ اِلَّا مَنْ رَّحِمَ ۚ وَحَالَ بَيْنَهُمَا الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِيْنَ ﴿٤٣﴾

নূহ বললো, "এতে আরোহণ করো, আল্লাহর নামেই এটা চলবে এবং থামবে। আমার রব বড়ই ক্ষমাশীল ও করুণাময়।"৪৫

নৌকা তাদেরকে নিয়ে পর্বত প্রমাণ ঢেউয়ের মধ্য দিয়ে ভেসে চলতে লাগলো। নূহের ছেলে ছিল তাদের থেকে দূরে। নূহ চীৎকার করে তাকে বললো, "হে আমার পুত্র! আমাদের সাথে আরোহণ করো, কাফেরদের সাথে থেকো না।" সে পালটা জবাব দিল, "আমি এখনই একটি পাহাড়ে চড়ে বসছি। তা আমাকে পানি থেকে বাঁচাবে।" নূহ বললো, "আজ আল্লাহর হুকুম থেকে বাঁচাবার কেউ নেই, তবে যার প্রতি আল্লাহ রহম করবেন সে ছাড়া।" এমন সময় একটি তরংগ উভয়ের মধ্যে আড়াল হয়ে গেলো এবং সেও নিমজ্জিতদের দলে শামিল হলো।

ছাড়া আর কেউ রক্ষা পায়নি (দেখুন বাইবেল, আদি পুস্তক ৬ঃ১৮, ৭ঃ৭, ৯ঃ১ এবং ৯ঃ১৯)। কিন্তু কুরআনের বহু জায়গায় একথা স্পষ্ট করে বর্ণনা করা হয়েছে যে, হযরত নূহের পরিবার ছাড়া তাঁর কওমের বেশ কিছুসংখ্যক লোককেও, তাঁদের সংখ্যা সামান্য হলেও আল্লাহ প্লাবনের হাত থেকে রক্ষা করেছিলেন। তাছাড়া কুরআন পরবর্তী মানব সম্প্রদায়কে শুধুমাত্র নূহের বংশধর নয় বরং তাঁর সাথে নৌকায় যেসব লোককে আল্লাহ রক্ষা করেছিলেন তাদের সবার বংশধর গণ্য করেছে। বলা হয়েছে ঃ

ذُرِّيَّةَ مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوْحٍ

"যাদেরকে আমি নৌকায় নূহের সাথে সওয়ার করিয়েছিলাম তাদের বংশধর।"

(বনী ইসরাঈল ৩)

مِنْ ذُرِّيَّةِ اٰدَمَ وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوْحٍ

وَقِيلَ يَٰٓأَرْضُ ٱبْلَعِى مَآءَكِ وَيَٰسَمَآءُ أَقْلِعِى وَغِيضَ ٱلْمَآءُ وَقُضِىَ ٱلْأَمْرُ وَٱسْتَوَتْ عَلَى ٱلْجُودِىِّ ۖ وَقِيلَ بُعْدًا لِّلْقَوْمِ ٱلظَّٰلِمِينَ ﴿٤٤﴾

হুকুম হলো, " হে পৃথিবী! তোমার সমস্ত পানি গিলে ফেলো এবং হে আকাশ। থেমে যাও।" সে মতে পানি ভূগর্ভে বিলীন হয়ে গেলো, ফায়সালা চূড়ান্ত করে দেয়া হলো এবং নৌকা জুদীর ওপর থেমে গেলো[৪৬] তারপর বলে দেয়া হলো, জালেম সম্প্রদায় দূর হয়ে গেলো!

"আদমের বংশধরদের মধ্য থেকে এবং নূহের সাথে যাদেরকে আমি নৌকায় সওয়ার করিয়েছিলাম তাদের মধ্য থেকে।" (মারয়াম, ৫৮ আয়াত)

৪৫. এ হলো মুমিনের সত্যিকার পরিচয়। কার্যকারণের এ জগতে সে অন্যান্য দুনিয়াবাসীর ন্যায় প্রাকৃতিক আইন অনুযায়ী সমস্ত উপায় ও কলাকৌশল অবলম্বন করে। কিন্তু সে উপায় ও কলা–কৌশলের ওপর ভরসা করে না। ভরসা করে একমাত্র আল্লাহর ওপর। সে খুব ভালো করেই জানে যে, আল্লাহর অনুগ্রহ এবং তাঁর দয়া ও করুণা পরিবেশ ও পরিস্থিতির সাথে যুক্ত না হলে তার কোন উপায় ও কলাকৌশল শুরুও হতে পারে না, ঠিকমতো চলতেও পারে না, আর চূড়ান্ত গন্তব্যে পৌঁছুতেও পারে না।

৪৬. জুদী পাহাড়টি কুর্দিস্তান অঞ্চলে ইবনে উমর দ্বীপের উত্তর–পূর্ব দিকে অবস্থিত। বাইবেলে উল্লেখিত নৌকার অবস্থান স্থলের নাম আরারত বলা হয়েছে। এটি আর্মেনিয়ার একটি পাহাড়েরও নাম এবং একটি পাহাড় শ্রেণীর নামও। পাহাড় শ্রেণী বলতে যে আরারতের কথা বলা হয়েছে সেটি আর্মেনিয়ার উচ্চ মালভূমি থেকে শুরু হয়ে দক্ষিণে কুর্দিস্তান পর্যন্ত চলে গেছে। এ পাহাড় শ্রেণীর একটি পাহাড়ের নাম জুদী পাহাড়। আজো এ পাহাড়টি এ নামেই পরিচিত। প্রাচীন ইতিহাসে এটাকেই নৌকা থামার জায়গা হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের জন্মের আড়াই হাজার বছর আগে বেরাসাস (BERASUS) নামে ব্যবিলনের একজন ধর্মীয় নেতা পুরাতন কুলদানী বর্ণনার ভিত্তিতে নিজের দেশের যে ইতিহাস লেখেন তাতে তিনি জুদী নামক স্থানকেই নূহের নৌকা থামার জায়গা হিসেবে উল্লেখ করেন। এরিস্টটলের শিষ্য এবিডেনাস (ABYDENUS) ও নিজের ইতিহাসগ্রন্থে একথা সত্য বলে উল্লেখ করেছেন। তাছাড়া তিনি নিজের সময়ের অবস্থা এভাবে বর্ণনা করেছেন যে, ইরাকে বহু লোকের কাছে এ নৌকার অংশ বিশেষ রয়েছে। সেসব ধুয়ে তারা রোগ নিরাময়ের জন্য রোগীদের পান করায়।

এখানে যে প্লাবনের কথা বলা হয়েছে সেটি কি সারা পৃথিবীব্যাপী ছিল অথবা যে এলাকায় নূহের সম্প্রদায়ের অধিবাস ছিল কেবল সেই এলাকাভিত্তিক ছিল? এটি এমন একটি প্রশ্ন যার মীমাংসা আজো হয়নি। ইসরাঈলী বর্ণনাগুলোর কারণে সাধারণভাবে মনে করা হয় যে, এ প্লাবন এসেছিল সারা দুনিয়া জুড়ে–(আদিপুস্তক ৭:১৮–২৪)। কিন্তু কুরআনের কোথাও একথা বলা হয়নি। কুরআনের ইংগিতসমূহ থেকে অবশ্যি একথা জানা যায় যে, নূহের প্লাবন থেকে যাদেরকে রক্ষা করা হয়েছিল পরবর্তী মানব বংশ তাদেরই আওলাদ।
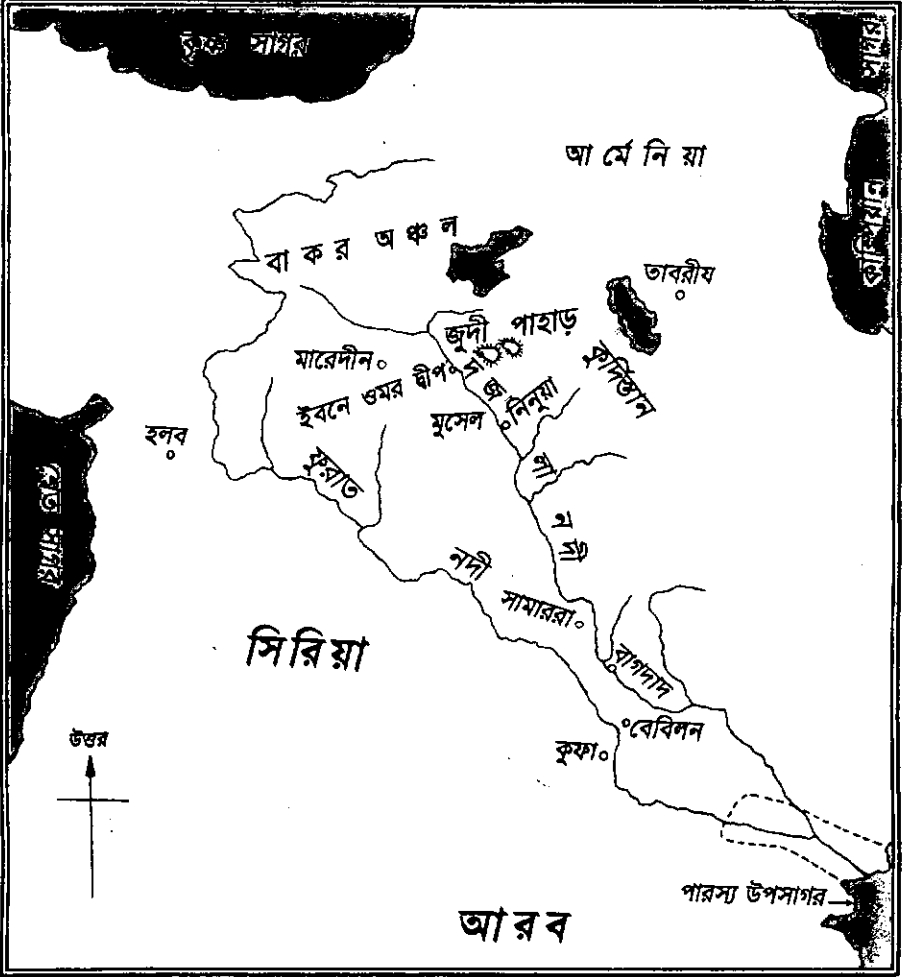
কওমে নূহ–এর এলাকা ও জুদী পাহাড়

কিন্তু এথেকে একথা প্রমাণ হয় না যে, প্লাবন সারা দুনিয়া জুড়ে এসেছিল। কেননা একথা এভাবেও সত্য হতে পারে যে, সে সময় দুনিয়ার যে অংশ জুড়ে মানুষের বসতি গড়ে উঠেছিল প্লাবন সে অংশেই সীমাবদ্ধ ছিল। আর প্লাবনের পরে মানুষের যে বংশধারার উন্মেষ ঘটেছিল তারাই ধীরে ধীরে সারা দুনিয়ায় ছড়িয়ে পড়েছিল। এ মতবাদের সমর্থন দু'টি জিনিস থেকে পাওয়া যায়। এক, ঐতিহাসিক বিবরণ, প্রাচীন ধ্বংসাবশেষ ও মৃত্তিকাস্তরের ভূ-তাত্ত্বিক গবেষণা থেকে দাজলা ও ফোরাত বিধৌত এলাকায় একটি মহাপ্লাবনের প্রমাণ পাওয়া যায়। কিন্তু সারা দুনিয়ার সমস্ত অংশ জুড়ে কোন এক সময়

وَنَادَىٰ نُوحٌ رَّبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ
الْحَقُّ وَأَنتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ ﴿٤٥﴾ قَالَ يَا نُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ ۖ
إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ ۖ فَلَا تَسْأَلْنِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ۖ إِنِّي أَعِظُكَ
أَن تَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ ﴿٤٦﴾ قَالَ رَبِّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَسْأَلَكَ
مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ ۖ وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُن مِّنَ الْخَاسِرِينَ ﴿٤٧﴾

নূহ তার রবকে ডাকলো। বললো, "হে আমার রব! আমার ছেলে আমার পরিবারভুক্ত এবং তোমার প্রতিশ্রুতি সত্য[৪৭] আর তুমি সমস্ত শাসকদের মধ্যে সবচেয়ে বড় ও উত্তম শাসক।"[৪৮] জবাবে বলা হলো, "হে নূহ! সে তোমার পরিবারভুক্ত নয়। সে তো অসৎ কর্মপরায়ণ।[৪৯] কাজেই তুমি আমার কাছে এমন বিষয়ের আবেদন করো না যার প্রকৃত তত্ত্ব তোমার জানা নেই। আমি তোমাকে উপদেশ দিচ্ছি, নিজেকে অজ্ঞদের মতো বানিয়ে ফেলো না।"[৫০] নূহ তখনই বললো, "হে আমার রব! যে জিনিসের ব্যাপারে আমার জ্ঞান নেই তা তোমার কাছে চাইবো— এ থেকে আমি তোমার কাছে পানাহ চাচ্ছি। যদি তুমি আমাকে মাফ না করো এবং আমার প্রতি রহম না করো তাহলে আমি ধ্বংস হয়ে যাবো।"[৫১]

একটি মহাপ্লাবন হয়েছিল এমন কোন সুনিশ্চিত প্রমাণ পাওয়া যায় না। দুই, সারা দুনিয়ার অধিকাংশ জাতির মধ্যে প্রাচীন কাল থেকে একটি মহাপ্লাবনের কাহিনী শ্রুত হয়ে আসছে। এমন কি অস্ট্রেলিয়া, আমেরিকা ও নিউগিনির মতো দূরবর্তী দেশগুলোর পুরাকালের কাহিনীতেও এর উল্লেখ পাওয়া যায়। এ থেকে এ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, কোন এক সময় এসব জাতির পূর্বপুরুষরা পৃথিবীর একই ভূখণ্ডের অধিবাসী ছিল এবং তখন সেখানেই এ মহাপ্লাবন এসেছিল। তারপর যখন তাদের বংশধররা দুনিয়ার বিভিন্ন এলাকায় ছড়িয়ে পড়েছিল তখন এ ঘটনার কাহিনীও তারা সংগে করে নিয়ে গিয়েছিল। (দেখুন সূরা আ'রাফ, ৪৭ টীকা)

৪৭. অর্থাৎ তুমি প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলে আমার পরিজনদেরকে এ ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করবে। এখন ছেলে তো আমার পরিজনদের অন্তরভুক্ত। কাজেই তাকেও রক্ষা করো।

৪৮. অর্থাৎ তোমার সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত এরপর আর কোন আবেদন নিবেদন খাটবে না। আর তুমি নির্ভেজাল জ্ঞান ও পূর্ণ ইনসাফের ভিত্তিতেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে থাকো।

৪৯. ব্যাপারটা ঠিক এ রকম, যেমন এক ব্যক্তির শরীরের কোন একটা অংশ পচে গেছে। ডাক্তার অংগটি কেটে ফেলে দেবার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। এখন রোগী ডাক্তারকে

বলছে, এটা তো আমার শরীরের একটা অংশ, আপনি কেটে ফেলে দেবেন? ডাক্তার জবাবে বলেন, এটা তোমার শরীরের অংশ নয়। কারণ এটা পচে গেছে। এ জবাবের অর্থ কখনো এ নয় যে, প্রকৃতপক্ষে এ অংগটির শরীরের সাথে কোন সম্পর্ক নেই। বরং এর অর্থ হবে, তোমার শরীরের জন্য সুস্থ ও কার্যকর অংগের প্রয়োজন, পচা অংগের নয়। কারণ পচা অংগ একদিকে যেমন শরীরের কোন কাজে আসে না তেমনি অন্যদিকে বাদবাকি সমস্ত শরীরটাকেও নষ্ট করে দেয়। কাজেই যে অংগটি পচে গেছে সেটি আর এ অর্থে তোমার শরীরের কোন অংশ নয় যে অর্থে শরীরের সাথে অংগের সম্পর্কের প্রয়োজন হয়। ঠিক এমনিভাবেই একজন সৎ ও সত্যনিষ্ঠ পিতাকে যখন একথা বলা হয় যে, এ ছেলেটি তোমার পরিজনদের অন্তরভুক্ত নয়, কারণ চরিত্র ও কর্মের দিক দিয়ে সে ধ্বংস হয়ে গেছে তখন এর অর্থ এ হয় না যে, এর মাধ্যমে তার ছেলে হবার বিষয়টি অস্বীকার করা হচ্ছে বরং এর অর্থ শুধু এতটুকুই হয় যে, বিকৃত ও ধ্বংস হয়ে যাওয়া লোক তোমার সৎ পরিবারের সদস্য হতে পারে না। সে তোমার রক্ত সম্পর্কীয় পরিবারের একজন সদস্য হতে পারে কিন্তু তোমার নৈতিক পরিবারের সাথে তার কোন সম্পর্ক নেই। আর আজ যে বিষয়ের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেয়া হচ্ছে সেটি বংশগত বা জাতি–গোষ্ঠীগত কোন বিরোধের ব্যাপার নয়। এক বংশের লোকদের রক্ষা করা হবে এবং অন্য বংশের লোকদের ধ্বংস করে দেয়া হবে, ব্যাপারটি এমন নয়। বরং এটি হচ্ছে কুফরী ও ঈমানের বিরোধের ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত নেবার ব্যাপার। এখানে শুধুমাত্র যারা সৎ তাদেরকে রক্ষা করা হবে এবং যারা অসৎ ও নষ্ট হয়ে গেছে তাদেরকে খতম করে দেয়া হবে।

ছেলেকে অসৎকর্ম পরায়ণ বলে আর একটি গুরুত্বপূর্ণ সত্যের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। স্থূল দৃষ্টিসম্পন্ন লোকেরা সন্তানকে ভালোবাসে ও লালন করে শুধু এজন্য যে, তারা তাদের পেটে বা ঔরসে জন্ম নিয়েছে এবং তাদের সাথে তাদের রক্ত সম্পর্ক রয়েছে। তাদের সৎ বা অসৎ হওয়ার ব্যাপারটি তাদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ নয়। কিন্তু মুমিনের দৃষ্টি হতে হবে সত্যের প্রতি নিবদ্ধ। তাকে তো ছেলেমেয়েদেরকে এ দৃষ্টিতে দেখতে হবে যে, এরা আল্লাহর সৃষ্ট কতিপয় মানুষ। প্রাকৃতিক নিয়মে আল্লাহ এদেরকে তার হাতে সোপর্দ করেছেন। এদেরকে লালন–পালন করে ও প্রশিক্ষণ দিয়ে যে উদ্দেশ্যে আল্লাহ দুনিয়ায় মানুষকে সৃষ্টি করেছেন সেই উদ্দেশ্য পূর্ণ করার জন্য তৈরী করতে হবে। এখন তার যাবতীয় পরিশ্রম ও সর্বাত্মক প্রচেষ্টার পরও তার ঘরে জন্ম নেয়া কোন ব্যক্তি যদি সেই উদ্দেশ্য পূর্ণ করার জন্য তৈরী হতে না পারে এবং যিনি তাকে মুমিন বাপের হাতে সোপর্দ করেছিলেন নিজের সেই রবেরই বিশ্বস্ত খাদেম হতে না পারে, তাহলে সেই বাপকে অবশ্যি বুঝতে হবে যে, তার সমস্ত পরিশ্রম ও প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়ে গেছে। এরপর এ ধরনের ছেলে–মেয়েদের সাথে তার মানসিক যোগ থাকার কোন কারণই থাকতে পারে না।

তারপর সংসারের সবচেয়ে প্রিয় ছেলেমেয়েদের ব্যাপারটি যখন এই তখন অন্যান্য আত্মীয়–স্বজনদের ব্যাপারে মুমিনের দৃষ্টিভংগী যাকিছু হতে পারে তা সহজেই অনুমান করা যায়। ঈমান একটি চিন্তাগত ও নৈতিক গুণ। এ গুণের প্রেক্ষিতেই মুমিনকে মুমিন বলা হয়। মুমিন হওয়ার দিক দিয়ে অন্য মানুষের সাথে তার নৈতিক ও ঈমানী সম্পর্ক ছাড়া আর কোন সম্পর্কই নেই। রক্ত–মাংসের সম্পর্কযুক্ত কেউ যদি তার সাথে এ গুণের ক্ষেত্রে সম্পর্কিত হয় তাহলে নিসন্দেহে সে তার আত্মীয়। কিন্তু যদি সে এ গুণ শূন্য হয়

قِيْلَ يٰنُوْحُ اهْبِطْ بِسَلٰمٍ مِّنَّا وَبَرَكٰتٍ عَلَيْكَ وَعَلٰٓى اُمَمٍ مِّمَّنْ مَّعَكَ ؕ وَاُمَمٌ سَنُمَتِّعُهُمْ ثُمَّ يَمَسُّهُمْ مِّنَّا عَذَابٌ اَلِيْمٌ ﴿٤٨﴾

হুকুম হলো, "হে নূহ! নেমে যাও,[৫২] আমার পক্ষ থেকে শান্তি ও বরকত তোমার ওপর এবং তোমার সাথে যেসব সম্প্রদায় আছে তাদের ওপর। আবার কিছু সম্প্রদায় এমনও আছে যাদেরকে আমি কিছুকাল জীবন উপকরণ দান করবো তারপর আমার পক্ষ থেকে তাদেরকে স্পর্শ করবে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।"

তাহলে মুমিন শুধুমাত্র রক্তমাংসের দিক দিয়ে তার সাথে সম্পর্ক রাখবে। তার হৃদয় ও আত্মার সম্পর্ক তার সাথে হতে পারে না। আর ঈমান ও কুফরীর বিরোধের ক্ষেত্রে যদি সে তার মুখোমুখি দাঁড়ায় তাহলে এ অবস্থায় সে এবং একজন অপরিচিত কাফের তার চোখে সমান হয়ে দেখা দেবে।

৫০. এ উক্তি দেখে কারো এ ধারণা করা ঠিক হবে না যে, হযরত নূহের (আ) মধ্যে ঈমানী চেতনার অভাব ছিল অথবা তাঁর ঈমানে জাহেলিয়াতের কোন গন্ধ ছিল। আসল কথা হচ্ছে, নবীগণও মানুষ। আর মুমিনের পূর্ণতার জন্য যে সর্বোচ্চ মানদণ্ড কায়েম করা হয়েছে সর্বক্ষণ তার উচ্চতম শিখরে আরোহণ করে থাকা কোন মানুষের সাধ্যায়ত্ত নয়। কোন কোন সময় কোন নাজুক মনস্তাত্বিক অবস্থায় নবীর মতো উচ্চ মর্যদাসম্পন্ন লোকও মুহূর্তকালের জন্য হলেও নিজের মানবিক দুর্বলতার কাছে পরাস্ত হন। কিন্তু যখনই তিনি অনুভব করেন অথবা মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে তাঁর মধ্যে এ অনুভূতি জাগানো হয় যে, তিনি কাংখিত মানের নিচে নেমে যাচ্ছেন তখনই তিনি তাওবা করেন এবং নিজের ভুলের সংশোধন করে নেবার ব্যাপারে এক মুহূর্তও ইতস্তত করেন না। হযরত নূহের নৈতিক উচ্চমানের এর চেয়ে বড় প্রমাণ আর কি হতে পারে যে, জওয়ান ছেলেকে চোখের সামনে ডুবে যেতে দেখছেন! এ দৃশ্য দেখে তাঁর কলিজা ফেটে যাবার উপক্রম হচ্ছে। কিন্তু যখনই আল্লাহ সাবধান করে জানিয়ে দেন, যে ছেলে হককে ত্যাগ করে বাতিলের সহযোগী হয়েছে তাকে নিছক তোমার ঔরসজাত বলেই নিজের ছেলে মনে করা একটি জাহেলী ভাবাবেগ ছাড়া আর কিছুই নয়। তখনই তিনি নিজের মানসিক আঘাতের ব্যাপারে বেপরোয়া হয়ে ইসলামের কাংখিত চিন্তা ও ভাবধারার দিকে ফিরে আসেন।

৫১. নূহের ছেলের এ ঘটনা বর্ণনা করে আল্লাহ অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী পদ্ধতিতে তাঁর ইনসাফ যে কি পরিমাণ পক্ষপাতহীন এবং তাঁর ফায়সালা যে কত চূড়ান্ত হয়ে থাকে তা বলেছেন। মক্কার মুশরিকরা মনে করতো, আমরা যাই করি না কেন আমাদের ওপর আল্লাহর গযব নাযিল হতে পারে না। কারণ আমরা হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালামের আওলাদ এবং বড় বড় দেবদেবীর ভক্ত। ইহুদী ও খৃষ্টানরাও এমনি ধরনের কিছু ধারণা পোষণ করতো এবং এখনো পোষণ করে থাকে। অনেক ভ্রষ্টাচারী মুসলমানও এ ধরনের কিছু মিথ্যা ধারণার ওপর নির্ভর করে বসে আছে। তারা মনে করে, আমরা অমুক বোজর্গের আওলাদ এবং অমুক বোজর্গের ভক্ত। কাজেই তাদের সুপারিশই আমাদের আল্লাহর শাস্তির হাত থেকে বাঁচাবে। কিন্তু এখানে এর বিপরীতে যে দৃশ্য দেখানো হচ্ছে তা

تِلْكَ مِنْ اَنْۢبَاۤءِ الْغَيْبِ نُوْحِيْهَاۤ اِلَيْكَ ۚ مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَاۤ اَنْتَ وَلَا قَوْمُكَ مِنْ قَبْلِ هٰذَا ۛ فَاصْبِرْ ۛ اِنَّ الْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّقِيْنَ ﴿٤٩﴾ وَاِلٰى عَادٍ اَخَاهُمْ هُوْدًا ؕ قَالَ يٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرُهٗ ؕ اِنْ اَنْتُمْ اِلَّا مُفْتَرُوْنَ ﴿٥٠﴾

হে মুহাম্মাদ! এসব গায়েবের খবর, যা আমি তোমাকে অহীর মাধ্যমে জানাচ্ছি। এর আগে তুমি এসব জানতে না এবং তোমার কওমও জানতো না। কাজেই সবর করো। মুত্তাকীদের জন্য রয়েছে শুভ পরিণাম।[৫৩]

৫ রুকূ'

আর আদের কাছে আমি তাদের ভাই হূদকে পাঠালাম।[৫৪] *সে বললোঃ "হে আমার স্বজাতীয় ভাইয়েরা! আল্লাহর বন্দেগী করো, তিনি ছাড়া তোমাদের আর কোন ইলাহ নেই। তোমরা নিছক মিথ্যা বানিয়ে রেখেছো।*[৫৫]

হচ্ছে এই যে, একজন মহান মর্যাদাশালী নবী নিজের চোখের সামনে নিজের কলিজার টুকরা সন্তানকে ডুবে যেতে দেখছেন এবং অস্থির হয়ে সন্তানের গোনাহ মাফ করার জন্য আল্লাহর কাছে আবেদন জানাচ্ছেন। কিন্তু আল্লাহর দরবার থেকে জবাবে তাকে ধমক দেয়া হচ্ছে। বাপের পয়গম্বরীর মর্যাদাও ছেলেকে আল্লাহর আযাব থেকে বাঁচাতে পারছে না।

৫২. অর্থাৎ যে পাহাড়ের ওপর নৌকা থেমেছিল তার ওপর থেকে নেমে যাও।

৫৩. অর্থাৎ যেভাবে শেষ পর্যন্ত নূহ ও তাঁর সংগী সাথীরা সাফল্য লাভ করেছিলেন এবং তাদের মর্যাদা বৃদ্ধি পেয়েছিল ঠিক তেমনি তুমি ও তোমার সাথীরাও সাফল্য লাভ করবে এবং তোমাদেরও মর্যাদা বৃদ্ধি পাবে। এটিই আল্লাহর চিরাচরিত রীতি, শুরুতে সত্যের দুশমনরা যতই সফলতার অধিকারী হোক না কেন সবশেষে একমাত্র তারাই সফলকাম হয় যারা আল্লাহর ভয়ে ভীত হয়ে চিন্তা ও কর্মের ভুল পথ পরিহার করে হকের উদ্দেশ্যে কাজ করে থাকে। কাজেই এখন যেসব বিপদ আপদ ও দুঃখ-কষ্টের মুখোমুখি হতে হচ্ছে, যেসব সমস্যা সংকটের সম্মুখীন তোমাদের হতে হচ্ছে এবং তোমাদের দাওয়াতকে দাবিয়ে দেবার জন্য তোমাদের বিরোধীদের আপাতদৃষ্টে যে সাফল্য দেখা যাচ্ছে, তাতে তোমাদের মন খারাপ করার প্রয়োজন নেই। বরং তোমরা সবর ও হিম্মত সহকারে কাজ করে যাও।

৫৪. সূরা আরাফের ৫ রুকূ'র টীকাগুলো একনজর দেখে নিন।

৫৫. অর্থাৎ অন্যান্য যেসব মাবুদদের তোমরা বন্দেগী ও পূজা-উপাসন করো তারা আসলে কোন ধরনের প্রভুত্বের গুণাবলী ও শক্তির অধিকারী নয়। বন্দেগী ও পূজা লাভের কোন অধিকারই তাদের নেই। তোমরা অযথাই তাদেরকে মাবুদ বানিয়ে রেখেছো। তারা তোমাদের আশা পূরণ করবে এ আশা নিয়ে বৃথাই বসে আছো।

يٰقَوْمِ لَآ أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا ۖ إِنْ أَجْرِىَ إِلَّا عَلَى الَّذِىْ
فَطَرَنِىْ ۚ أَفَلَا تَعْقِلُوْنَ ﴿٥١﴾ وَيٰقَوْمِ اسْتَغْفِرُوْا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوْبُوْا
إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَآءَ عَلَيْكُمْ مِّدْرَارًا وَّيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلٰى قُوَّتِكُمْ وَلَا
تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِيْنَ ﴿٥٢﴾

হে আমার কওমের ভাইয়েরা। এ কাজের বিনিময়ে আমি তোমাদের কাছে কোন পারিশ্রমিক চাই না। আমার পারিশ্রমিক তো তাঁরই জিম্মায় যিনি আমাকে পয়দা করেছেন। তোমরা কি একটুও বুদ্ধি–বিবেচনা করে কাজ করো না?[৫৬] আর হে আমার কওমের লোকেরা! মাফ চাও তোমাদের রবের কাছে তারপর তাঁর দিকেই ফিরে এসো। তিনি তোমাদের জন্য আকাশের মুখ খুলে দেবেন এবং তোমাদের বর্তমান শক্তির ওপর আরো শক্তি বৃদ্ধি করবেন।[৫৭] অপরাধীদের মতো মুখ ফিরিয়ে নিয়ো না।"

৫৬. এটি একটি চমৎকার অলংকার সমৃদ্ধ বাক্য। এর মধ্যে একটি শক্তিশালী যুক্তি পেশ করা হয়েছে। এর অর্থ হচ্ছে, আমার কথাকে তোমরা হালকাভাবে গ্রহণ করে উপেক্ষা করে যাচ্ছো এবং এ নিয়ে গুরুত্ব সহকারে চিন্তা–ভাবনা করছো না। ফলে তোমরা যে বুদ্ধি খাটিয়ে কাজ করো না এটি তার একটি প্রমাণ। নয়তো যদি তোমরা বুদ্ধি খাটিয়ে কাজ করতে তাহলে অবশ্যি একথা চিন্তা করতে যে, নিজের কোন ব্যক্তিগত স্বার্থ ছাড়াই যে ব্যক্তি দাওয়াত, প্রচার, উপদেশ, নসীহতের ক্ষেত্রে এহেন কষ্ট, ক্লেশ ও পরিশ্রম করে যাচ্ছে, যার এ প্রচেষ্টা ও সংগ্রাম তোমরা কোন ব্যক্তিগত বা পারিবারিক স্বার্থের গন্ধই পেতে পারো না, সে নিশ্চয়ই বিশ্বাস ও প্রত্যয়ের এমন কোন বুনিয়াদ এবং মানসিক প্রশান্তির এমন কোন উপকরণের অধিকারী যার ভিত্তিতে সে নিজের আরাম–আয়েশ পরিত্যাগ করে এবং নিজের বৈষয়িক স্বার্থ উদ্ধারের চিন্তা থেকে বেপরোয়া হয়ে নিজেকে মারাত্মক ঝুঁকি ও বিপদের মধ্যে নিক্ষেপ করেছে। যার ফলে শত শত বছরের রচিত জমাট বাঁধা আকীদা–বিশ্বাস, রসম– রেওয়াজ ও জীবনধারার বিরুদ্ধে আওয়াজ তুলেছে এবং তার কারণে সারা দুনিয়ার শত্রুতার মুখোমুখি হয়েছে। এ ধরনের মানুষের কথা আর যাই হোক এতটা হালকা হতে পারে না যে, না জেনে বুঝেই তা প্রত্যাখ্যান করা যায়। একটু বিবেচনা সহকারে তা নিয়ে চিন্তা–ভাবনা করার জন্য মন–মস্তিষ্ককে সামান্যতম কষ্ট না দেবার মতো গুরুত্বহীন তা কোনক্রমেই হতে পারে না।

৫৭. প্রথম রুকূ'তে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মুখ দিয়ে যে কথা উচ্চারণ করানো হয়েছিল এখানে সেই একই কথা বলা হয়েছে। বলা হয়েছিল, "তোমাদের রবের কাছে ক্ষমা চাও এবং তাঁর দিকে ফিরে এসো, তাহলে তিনি তোমাদের উত্তম জীবন সামগ্রী দেবেন" এ থেকে জানা গেলো, কেবল আখেরাতেই নয়, এ দুনিয়াতেও জাতিদের ভাগ্যের ওঠানামা চরিত্র ও নৈতিকতার ভিত্তিতেই হয়ে থাকে। এ বিশ্ব–

قَالُوْا يٰهُوْدُ مَا جِئْتَنَا بِبَيِّنَةٍ وَّمَا نَحْنُ بِتَارِكِيْٓ اٰلِهَتِنَا عَنْ قَوْلِكَ وَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِيْنَ ﴿٥٣﴾ اِنْ نَّقُوْلُ اِلَّا اعْتَرٰىكَ بَعْضُ اٰلِهَتِنَا بِسُوْٓءٍ ؕ قَالَ اِنِّيْٓ اُشْهِدُ اللّٰهَ وَاشْهَدُوْٓا اَنِّيْ بَرِيْٓءٌ مِّمَّا تُشْرِكُوْنَ ﴿٥٤﴾

তারা জবাব দিল ঃ "হে হূদ! তুমি আমাদের কাছে কোন সুস্পষ্ট নিদর্শন নিয়ে আসোনি।[৫৮] তোমার কথায় আমরা আমাদের মাবুদদেরকে ত্যাগ করতে পারি না। আমরা তোমার প্রতি ঈমান আনছি না। আমরা তো মনে করি তোমার ওপর আমাদের কোন দেবতার অভিশাপ পড়েছে।"[৫৯]

হূদ বললো ঃ " আমি আল্লাহর সাক্ষ পেশ করছি।[৬০] আর তোমরা সাক্ষী থাকো তোমরা আল্লাহর সার্বভৌম ক্ষমতায় আল্লাহকে ছাড়া যে অন্যদেরকে শরীক করে রেখেছো তা থেকে আমি মুক্ত।[৬১]

জাহানের ওপর আল্লাহ তাঁর শাসন পরিচালনা করছেন নৈতিক মূলনীতির ভিত্তিতে, নৈতিক ভালো–মন্দের পার্থক্য শূন্য প্রাকৃতিক নীতির ভিত্তিতে নয়। কুরআনের বিভিন্ন স্থানে একথা বলা হয়েছে যে, যখন নবীর মাধ্যমে একটি জাতির কাছে আল্লাহর পয়গাম পৌছে যায় তখন তার ভাগ্য ঐ পয়গামের সাথে বাঁধা হয়ে যায়। যদি সে ঐ পয়গাম গ্রহণ করে নেয় তাহলে আল্লাহ তার ওপর অনুগ্রহ ও বরকতের দরজা খুলে দেন। আর যদি তা প্রত্যাখ্যান করে বসে তাহলে তাকে ধ্বংস করে দেয়া হয়। যে নৈতিক আইনের ভিত্তিতে আল্লাহ মানুষের সাথে আচরণ করছেন এটি যেন তার একটি ধারা। অনুরূপভাবে সেই আইনের আর একটি ধারা হচ্ছে এই যে, দুনিয়ার প্রাচুর্য ও সমৃদ্ধিতে প্রতারিত হয়ে যে জাতি জুলুম ও গোনাহের কাজে অগ্রসর হয় তার পরিণাম হয় ধ্বংস। কিন্তু ঠিক যখন সে তার অশুভ পরিণামের দিকে লাগামহীনভাবে ছুটে চলছে তখনই যদি সে তার ভুল অনুভব করে এবং নাফরমানির পথ পরিহার করে আল্লাহর বন্দেগীর পথ অবলম্বন করে তাহলে তার ভাগ্য পরিবর্তন হয়ে যায়। তার কাজের অবকাশ দানের সময় বাড়িয়ে দেয়া হয় আগামীতে তার ভাগ্যে আযাবের পরিবর্তে পুরস্কার, উন্নতি ও সফলতা লিখে দেয়া হয়।

৫৮. অর্থাৎ এমন কোন দ্ব্যর্থহীন আলামত অথবা কোন সুস্পষ্ট দলীল নিয়ে আসোনি যার ভিত্তিতে আমরা নিসংশয়ে জানতে পারি যে, আল্লাহ তোমাকে পাঠিয়েছেন এবং যে কথা তুমি পেশ করছো তা সত্য।

৫৯. অর্থাৎ তুমি কোন দেবদেবী, বা কোন মহাপুরুষের আস্তানায় গিয়ে কিছু বেয়াদবী করেছো, যার ফল এখন তুমি ভোগ করছো। এর ফলে তুমি আবোল তাবোল কথা বলতে শুরুকরেছো এবং গতকালও যেসব জনবসতিতে তুমি সম্মান ও মর্যাদা সহকারে বাস

مِنْ دُوْنِهٖ فَكِيْدُوْنِيْ جَمِيْعًا ثُمَّ لَا تُنْظِرُوْنِ ۞ اِنِّيْ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللّٰهِ رَبِّيْ وَرَبِّكُمْ ۭ مَا مِنْ دَاۗبَّةٍ اِلَّا هُوَ اٰخِذٌۢ بِنَاصِيَتِهَا ۭ اِنَّ رَبِّيْ عَلٰي صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ۞ فَاِنْ تَوَلَّوْا فَقَدْ اَبْلَغْتُكُمْ مَّآ اُرْسِلْتُ بِهٖٓ اِلَيْكُمْ ۭ وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّيْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ۚ وَلَا تَضُرُّوْنَهٗ شَيْـــًٔا ۭ اِنَّ رَبِّيْ عَلٰي كُلِّ شَيْءٍ حَفِيْظٌ ۞

তোমরা সবাই মিলে আমার বিরুদ্ধে যা করার করো, তাতে কোন ত্রুটি রেখো না এবং আমাকে একটুও অবকাশ দিয়ো না।[৬২] আমার ভরসা আল্লাহর ওপর, যিনি আমার রব এবং তোমাদেরও রব। তিনিই প্রতিটি প্রাণীর ভাগ্যনিয়ন্তা। নিসন্দেহে আমার রব সরল পথে আছেন।[৬৩] যদি তোমরা মুখ ফিরিয়ে নিতে চাও তাহলে ফিরিয়ে নাও, কিন্তু যে পয়গাম দিয়ে আমাকে তোমাদের কাছে পাঠানো হয়েছিল তা আমি তোমাদের কাছে পৌঁছিয়ে দিয়েছি। এখন আমার রব তোমাদের জায়গায় অন্য জাতিকে বসাবেন এবং তোমরা তাঁর কোনই ক্ষতি করতে পারবে না।[৬৪] অবশ্যি আমার রব প্রতিটি জিনিসের সংরক্ষক।

করছিলে আজ সেখানে গালিগালাজ ও মারধরের মাধ্যমে তোমাকে অভ্যর্থনা জানানো হচ্ছে।

৬০. অর্থাৎ তোমরা বলছো আমি কোন সাক্ষ–প্রমাণ নিয়ে আসিনি অথচ ছোট ছোট সাক্ষ–প্রমাণ পেশ করার পরিবর্তে আমি তো সবচেয়ে বড় আল্লাহর সাক্ষ পেশ করছি। তিনি তাঁর সমগ্র সার্বভৌম ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব সহকারে সৃষ্টি জগতের সকল অংশে এবং তার দীপ্তির প্রতিটি কণিকায় একথার সাক্ষ দিয়ে যাচ্ছেন যে, তোমাদের কাছে আমি যে সত্য বর্ণনা করেছি তা পুরোপুরি ও সম্পূর্ণ সত্য। তার মধ্যে মিথ্যার নাম গন্ধও নেই। অন্যদিকে তোমরা যেসব ধারণা–কল্পনা ও অনুমান দাঁড় করিয়েছো সেগুলো মিথ্যাচার ছাড়া আর কিছুই নয় এবং সেগুলোর মধ্যে সত্যের গন্ধও নেই।

৬১. তারা যে কথা বলে আসছিল যে, তোমার কথায় আমরা আমাদের উপাস্যদের ত্যাগ করতে প্রস্তুত নই—এর জবাবেই একথা বলা হয়েছে। বলা হয়েছে ঃ আমার এ সিদ্ধান্তও শুনে রাখো, আমি তোমাদের এসব উপাস্যের প্রতি চরমভাবে বিরূপ ও অসন্তুষ্ট।

৬২. 'তোমার ওপর আমাদের কোন দেবতার অভিশাপ পড়েছে—তাদের এ বক্তব্যের জবাবেই একথা বলা হয়েছে। (তুলনামূলক অধ্যয়নের জন্য দেখুন সূরা ইউনূস ৭১ আয়াত)।

وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا هُودًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا ۚ وَنَجَّيْنَاهُم مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ ﴿٥٨﴾ وَتِلْكَ عَادٌ ۖ جَحَدُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَعَصَوْا رُسُلَهُ وَاتَّبَعُوا أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ ﴿٥٩﴾ وَأُتْبِعُوا فِي هَٰذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ ۗ أَلَا إِنَّ عَادًا كَفَرُوا رَبَّهُمْ ۗ أَلَا بُعْدًا لِّعَادٍ قَوْمِ هُودٍ ﴿٦٠﴾ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا ۚ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ ۖ هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ ۚ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُّجِيبٌ ﴿٦١﴾

তারপর যখন আমার হুকুম এসে গেলো তখন নিজের রহমতের সাহায্যে হূদ ও তার সাথে যারা ঈমান এনেছিল তাদেরকে আমি রক্ষা করলাম এবং একটি কঠিন আযাব থেকে বাঁচালাম।

এ হচ্ছে আদ, নিজের রবের নিদর্শন তারা অস্বীকার করেছে, নিজের রসূলদের কথাও অমান্য করেছে।[৬৫] এবং প্রত্যেক স্বৈরাচারী সত্যের দুশমনের আদেশ মেনে চলেছে। শেষ পর্যন্ত এ দুনিয়ায় তাদের ওপর লানত পড়েছে এবং কিয়ামতের দিনেও। শোনো! আদ তাদের রবের সাথে কুফরী করেছিল। শোনো! দূরে নিক্ষেপ করা হয়েছে হূদের জাতি আদকে।

৬ রুকূ'

আর সামুদের কাছে আমি তাদের ভাই সালেহকে পাঠালাম।[৬৬] সে বললো, "হে আমার কওমের লোকেরা! আল্লাহর বন্দেগী করো। তিনি ছাড়া তোমাদের আর কোন ইলাহ নেই। তিনিই তোমাদের যমীন থেকে পয়দা করেছেন এবং এখানেই তোমাদের বসবাস করিয়েছেন।[৬৭] কাজেই তোমরা তাঁর কাছে ক্ষমা চাও[৬৮] এবং তাঁর দিকে ফিরে এসো। নিশ্চয়ই আমার রব নিকটে আছেন তিনি ডাকের জবাব দেন।"[৬৯]

৬৩. অর্থাৎ তিনি যা কিছু করেন ঠিকই করেন। তাঁর প্রত্যেকটি কাজই সহজ সরল। তিনি অন্ধকার ও অন্যায়ের রাজত্বে বাস করেন না। তিনি পূর্ণসত্য ও ন্যায়ের মাধ্যমে তাঁর সার্বভৌম কর্তৃত্ব করে যাচ্ছেন। তুমি পথভ্রষ্ট ও অসৎকর্মশীল হবে এবং তারপরও আখেরাতে সফলকাম হবে আর আমি সত্য–সরল পথে চলবো ও সৎকর্মশীল হবো এবং তারপরও ক্ষতিগ্রস্ত ও অসফল হবো, এটা কোনক্রমেই সম্ভবপর হতে পারে না।

৬৪. 'আমরা তোমার প্রতি ঈমান আনছি না' তাদের একথার জবাবে এ উক্তি করা হয়েছে।

৬৫. তাদের কাছে মাত্র একজন রসূলই এসেছিলেন। কিন্তু যেহেতু তিনি তাদেরকে এমন এক বিষয়ের দাওয়াত দিয়েছিলেন যে দাওয়াত সবসময় সবযুগে ও সকল জাতির মধ্যে আল্লাহর নবীগণ পেশ করতে থেকেছেন, তাই এক রসূলের কথা না মানাকে সকল রসূলের প্রতি নাফরমানী গণ্য করা হয়েছে।

৬৬. এ ক্ষেত্রে সূরা আ'রাফের দশম রুকূ'র টীকাগুলো সামনে রাখুন।

৬৭. প্রথম বাক্যাংশে যে দাবী করা হয়েছিল যে, আল্লাহ ছাড়া তোমাদের আর কোন প্রকৃত ইলাহ নেই, এটি হচ্ছে সেই দাবীর সপক্ষে যুক্তি। মুশরিকরা নিজেরাও স্বীকার করতো যে, আল্লাহই তাদের স্রষ্টা। এ স্বীকৃত সত্যের ওপর যুক্তির ভিত্তি করে হযরত সালেহ (আ) তাদেরকে বুঝান ঃ পৃথিবীর নিষ্প্রাণ উপাদানের সংমিশ্রণে যখন আল্লাহই তোমাদের এ পার্থিব অস্তিত্ব দান করেছেন এবং তিনিই যখন এ পৃথিবীর বুকে জীবন ধারণের ব্যবস্থা করেছেন তখন সার্বভৌম ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের অধিকার সেই আল্লাহ ছাড়া আর কার থাকতে পারে? তিনি ছাড়া আর কে বন্দেগী পূজা–উপাসনা লাভের অধিকার পেতে পারে?

৬৮. অর্থাৎ এতদিন পর্যন্ত তোমরা অন্যের বন্দেগী ও পূজা–অর্চনা করে এসেছো। সে অপরাধের জন্য তোমাদের রবের কাছে ক্ষমা চাও।

৬৯. এখানে মুশরিকদের একটি মস্তবড় বিভ্রান্তির প্রতিবাদ করা হয়েছে। সাধারণভাবে প্রায় তাদের প্রত্যেকেই এর শিকার। যেসব মারাত্মক বিভ্রান্তি প্রতি যুগে মানুষকে শিরকে লিপ্ত করেছে, এটি তাদের অন্যতম। তারা আল্লাহকে দুনিয়ার অন্যান্য রাজা, মহারাজা ও বাদশাহদের সমান মনে করে। অথচ এ রাজা–বাদশাহরা প্রজাদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে দূরে নিজেদের প্রাসাদসমূহে বিলাসী জীবন যাপন করে। তাদের দরবারে সাধারণ প্রজারা পৌঁছুতে পারে না এবং সেখানে কোন আবেদন পৌঁছাতে হলে ঐ রাজাদের প্রিয়পাত্রদের কারো শরণাপন্ন হতে হয়। এরপর আবার সৌভাগ্যক্রমে কারো আবেদন যদি তাদের সুউচ্চ বালাখানায় পৌঁছে যায়ও তাহলেও প্রভুত্বের অহমিকায় মত্ত হয়ে তারা নিজেরা এর জবাব দিতে পছন্দ করে না। বরং প্রিয়পাত্রদের মধ্য থেকে কারো ওপর এর জবাব দেবার দায়িত্ব অর্পণ করে। এ ভুল ধারণার কারণে তারা মনে করে এবং ধুরন্ধর লোকেরা তাদের একথা বুঝাবার চেষ্টাও করেছে যে, বিশ্ব–জাহানের অধিপতি মহাশক্তিধর আল্লাহর মহিমান্বিত দরবার সাধারণ মানুষের নাগালের বাইরে বহুদূরে অবস্থিত। কোন সাধারণ মানুষের পক্ষে তাঁর দরবারে পৌঁছে যাওয়া কেমন করে সম্ভবপর হতে পারে! মানুষের দোয়া ও প্রার্থনা সেখানে পৌঁছে যাওয়া এবং সেখান থেকে তার জওয়াব আসা তো কোনক্রমেই সম্ভব নয়। তবে হাঁ যদি পবিত্র আত্মাসমূহের 'অসিলা' ধরা হয় এবং যেসব ধর্মীয় পদাধিকারীরা ওপর তলায় নযর–নিয়ায ও আবেদন নিবেদন পেশ করার কায়দা জানেন তাদের সহায়তা গ্রহণ করা হয় তাহলে এটা সম্ভব হতে পারে। এ বিভ্রান্তিটিই বান্দা ও আল্লাহর মধ্যে বহু ছোটবড় মাবুদ এবং বিপুল সংখ্যক সুপারিশকারী দাঁড় করিয়ে দিয়েছে আর এই সাথে পুরোহিতগিরির (Priesthood) এক সুদীর্ঘ ধারা চালু হয়ে গেছে, যার মাধ্যমে ছাড়া

قَالُوْا يٰصٰلِحُ قَدْ كُنْتَ فِيْنَا مَرْجُوًّا قَبْلَ هٰذَآ اَتَنْهٰىنَآ اَنْ نَّعْبُدَ مَا يَعْبُدُ اٰبَآؤُنَا وَاِنَّنَا لَفِيْ شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُوْنَآ اِلَيْهِ مُرِيْبٍ ﴿٦٢﴾

তারা বললো, "হে সালেহ! এর আগে তুমি আমাদের মধ্যে এমন ব্যক্তি ছিলে যার কাছে ছিল আমাদের বিপুল প্রত্যাশা।[৭০] আমাদের বাপ-দাদারা যেসব উপাস্যের পূজা করতো তুমি কি তাদের পূজা করা থেকে আমাদের বিরত রাখতে চাচ্ছো?[৭১] তুমি যে পথের দিকে আমাদের ডাকছো সে ব্যাপারে আমাদের ভীষণ সন্দেহ, যা আমাদের পেরেশানির মধ্যে ফেলে দিয়েছে।"[৭২]

জাহেলী ধর্মসমূহের অনুসারীরা তাদের জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত কোন একটি ধর্মীয় অনুষ্ঠানও পালন করতে সক্ষম নয়।

হযরত সালেহ আলাইহিস সালাম জাহেলিয়াতের এ গোটা ধুম্রজালকে শুধুমাত্র দু'টি শব্দের সাহায্যে ছিন্নভিন্ন করে দিয়েছেন। শব্দ দুটির একটি হচ্ছে 'কারীব'—আল্লাহ নিকটবর্তী এবং দ্বিতীয়টি 'মুজীব' —আল্লাহ জবাব দেন। অর্থাৎ তিনি দূরে আছেন, তোমাদের এ ধারণা যেমন ভুল তেমনি তোমরা সরাসরি তাঁকে ডেকে নিজেদের আবেদন নিবেদনের জবাব হাসিল করতে পারো না, এ ধারণাও একই রকম ভুল। তিনি যদিও অনেক উচ্চস্থানের অধিকারী ও অনেক উচ্চ মর্যাদাশালী তবুও তিনি তোমাদের নিকটেই থাকেন। তোমাদের প্রত্যেক ব্যক্তিই তাঁকে নিজের ঘনিষ্ঠতম সান্নিধ্যে পেতে পারে এবং তাঁর সাথে সংগোপনে কথা বলতে পারে। প্রকাশ্য জনসমক্ষে এবং একান্ত গোপনে একাকী অবস্থায়ও নিজের আবেদন নিবেদন তাঁর কাছে পেশ করতে পারে। তারপর তিনি সরাসরি প্রত্যেক বান্দার আবেদনের জবাব নিজেই দেন। কাজেই বিশ্ব-জাহানের বাদশাহর সাধারণ দরবার যখন সবসময় সবার জন্য খোলা আছে এবং তিনি সবার কাছাকাছি রয়েছেন তখন তোমরা বোকার মতো এ জন্য মাধ্যম ও অসীলা খুঁজে বেড়াচ্ছো কেন? (এছাড়া দেখুন সূরা বাকারার ১৮৮ টীকা)

৭০. অর্থাৎ তোমার বুদ্ধিমত্তা, বিচারবুদ্ধি, বিচক্ষণতা, গাম্ভীর্য, দৃঢ়তা ও মর্যাদাশালী ব্যক্তিত্ব দেখে আমরা আশা করেছিলাম তুমি ভবিষ্যতে একজন বিরাট নামীদামী ব্যক্তি হবে। একদিকে যেমন তুমি বিপুল বৈষয়িক ঐশ্বর্যের অধিকারী হবে তেমনি অন্যদিকে আমরাও অন্য জাতি ও গোত্রের মোকাবিলায় তোমার প্রতিভা ও যোগ্যতা থেকে লাভবান হবার সুযোগ পাবো। কিন্তু তুমি এ তাওহীদ ও আখেরাতের নতুন ধূয়া তুলে আমাদের সমস্ত আশা-আকাংখা বরবাদ করে দিয়েছো। উল্লেখ্য, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সম্পর্কেও এ ধরনের কিছু চিন্তা তাঁর স্বগোত্রীয় লোকদের মধ্যেও পাওয়া যেতো। তারাও নবুওয়াত লাভের পূর্বে তাঁর উন্নত যোগ্যতা ও গুণাবলীর স্বীকৃতি দিতো। তারা মনে করতো এ ব্যক্তি ভবিষ্যতে একজন বিরাট ব্যবসায়ী হবে এবং তার বিচক্ষণতা ও বিপুল বুদ্ধিমত্তা আমাদেরও অনেক কাজে লাগবে। কিন্তু তাদের প্রত্যাশার বিপরীত মেরুতে দাঁড়িয়ে যখন তিনি তাওহীদ ও আখেরাত এবং উন্নত চারিত্রিক গুণাবলীর দাওয়াত দিতে

قَالَ يٰقَوْمِ اَرَءَيْتُمْ اِنْ كُنْتُ عَلٰى بَيِّنَةٍ مِّنْ رَّبِّىْ وَاٰتٰنِىْ مِنْهُ رَحْمَةً فَمَنْ يَّنْصُرُنِىْ مِنَ اللّٰهِ اِنْ عَصَيْتُهٗ ۚ فَمَا تَزِيْدُوْنَنِىْ غَيْرَ تَخْسِيْرٍ ﴿٦٣﴾ وَيٰقَوْمِ هٰذِهٖ نَاقَةُ اللّٰهِ لَكُمْ اٰيَةً فَذَرُوْهَا تَاْكُلْ فِىْۤ اَرْضِ اللّٰهِ وَلَا تَمَسُّوْهَا بِسُوْٓءٍ فَيَاْخُذَكُمْ عَذَابٌ قَرِيْبٌ ﴿٦٤﴾

সালেহ বললো, "হে আমার সম্প্রদায়ের ভাইয়েরা! তোমরা কি কখনো একথাটিও চিন্তা করেছো যে, যদি আমি আমার রবের পক্ষ থেকে একটি অকাট্য প্রমাণ পেয়ে থাকি এবং তারপর তিনি তাঁর অনুগ্রহও আমাকে দান করে থাকেন, আর এরপরও যদি আমি তাঁর নাফরমানী করি তাহলে আল্লাহর পাকড়াও থেকে কে আমাকে বাঁচাবে? আমাকে আরো বেশী ক্ষতিগ্রস্ত করা ছাড়া তোমরা আমার আর কোন্ কাজে লাগতে পারো?[৭৩] আর হে আমার কওমের লোকেরা! দেখো, এ আল্লাহর উটনীটি তোমাদের জন্য একটি নিদর্শন। একে আল্লাহর যমীনে স্বাধীনভাবে চরে বেড়াবার জন্য ছেড়ে দাও। একে পীড়া দিয়ো না। অন্যথায় তোমাদের ওপর আল্লাহর আযাব আসতে বেশী দেরী হবে না"।

থাকলেন তখন তারা তাঁর ব্যাপারে কেবল নিরাশই হলো না বরং তাঁর প্রতি হয়ে উঠলো অসন্তুষ্ট। তারা বলতে লাগলো, বেশ ভালো কাজের লোকটি ছিল কিন্তু কি জানি তাকে কি পাগলামিতে পেয়ে বসলো, নিজের জীবনটাও বরবাদ করলো এবং আমাদের সমস্ত প্রত্যাশাও ধূলায় মিশিয়ে দিল।

৭১. এ মাবুদগুলো ইবাদাত লাভের হকদার কেন এবং কেন এদের পূজা করা উচিত—এর যুক্তি হিসেবে একথা বলা হয়েছে। এখানে ইসলাম ও জাহেলিয়াতের যুক্তি উপস্থাপন পদ্ধতির পার্থক্য একেবারে সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। হযরত সালেহ (আ) বলেছিলেন, আল্লাহ ছাড়া আর কোন প্রকৃত মাবুদ নেই এবং এর যুক্তি হিসেবে তিনি বলেছিলেন, আল্লাহই তোমাদের সৃষ্টি করেছেন এবং পৃথিবীতে বসবাস করিয়েছেন। এর জবাবে এ মুশরিকরা বলছে, আমাদের এ মাবুদরাও ইবাদাত লাভের হকদার এবং এদের ইবাদাতও পরিত্যাগ করা যেতে পারে না। কারণ বাপ-দাদাদের আমল থেকে এদের ইবাদাত হতে চলে আসছে। অর্থাৎ গড্ডালিকা প্রবাহে ভেসে চলা উচিত। কারণ শুরুতে একটি নির্বোধ এ পথে চলেছিল। তাই এখন এ পথে চলার জন্য আর এর চেয়ে বেশী কোন যুক্তির প্রয়োজন নেই যে, দীর্ঘকাল ধরে বহু বেকুফ এ পথেই চলছে।

৭২. এ সন্দেহ ও সংশয় কোন্ বিষয়ে ছিল? এখানে একথা স্পষ্ট করে বলা হয়নি। এর কারণ, সবাই সন্দেহের মধ্যে পড়ে গিয়েছিল। কিন্তু প্রত্যেকের সন্দেহের ধরন ছিল আলাদা। সত্যের দাওয়াতের বৈশিষ্ট হচ্ছে, এ দাওয়াত দেবার পর লোকদের মানসিক প্রশান্তি

فَعَقَرُوهَا فَقَالَ تَمَتَّعُوا فِي دَارِكُمْ ثَلٰثَةَ أَيَّامٍ ۖ ذٰلِكَ وَعْدٌ غَيْرُ مَكْذُوبٍ ﴿٦٥﴾ فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا صٰلِحًا وَالَّذِينَ اٰمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَمِنْ خِزْيِ يَوْمِئِذٍ ۗ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ ﴿٦٦﴾ وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جٰثِمِينَ ﴿٦٧﴾ كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا ۗ أَلَا إِنَّ ثَمُودَا كَفَرُوا رَبَّهُمْ ۗ أَلَا بُعْدًا لِّثَمُودَ ﴿٦٨﴾

কিন্তু তারা উটনীটিকে মেরে ফেললো। এর ফলে সালেহ তাদেরকে সাবধান করে দিলো এই বলে, "ব্যস, আর তিন দিন তোমাদের গৃহে অবস্থান করে নাও। এটি এমন একটি মেয়াদ, যা মিথ্যা প্রমাণিত হবে না।"

শেষ পর্যন্ত যখন আমার ফায়সালার সময় এসে গেলো তখন আমি নিজ অনুগ্রহে সালেহ ও তার ওপর যারা ঈমান এনেছিল তাদেরকে রক্ষা করলাম এবং সেই দিনের লাঞ্ছনা থেকে তাদেরকে বাঁচালাম।[৭৪] নিসন্দেহে তোমার রবই আসলে শক্তিশালী ও পরাক্রমশালী। আর যারা জুলুম করেছিল একটি বিকট আওয়াজ তাদেরকে আঘাত করলো এবং তারা নিজেদের বাড়ীঘরে এমন অসাড় ও প্রাণহীন হয়ে পড়ে রইলো যেন তারা সেখানে কখনো বসবাসই করেনি।

শোনো! সামূদ তার রবের সাথে কুফরী করলো। শোনো! দূরে নিক্ষেপ করা হলো সামূদকে।

খতম হয়ে যায় এবং একটি ব্যাপক অস্থিরতা জন্ম নেয়। যদিও প্রত্যেকের অনুভূতি অন্যের থেকে ভিন্নতর হয় কিন্তু এ অস্থিরতার অংশ প্রত্যেকেই কিছু না কিছু পেয়ে যায়। ইতিপূর্বে লোকেরা যেমন নিশ্চিন্ত মনে গোমরাহীতে লিপ্ত থাকতো এবং নিজেরা কি করে যাচ্ছে একথা একবার চিন্তা করার প্রয়োজন অনুভব করতো না, ঠিক এ ধরনের নিশ্চিন্ততা এ সত্যের দাওয়াত দানের পর আর অব্যাহত থাকতো না এবং থাকতে পারে না। জাহেলী ব্যবস্থার দুর্বলতার ওপর সত্যের আহবায়কের নির্দয় সমালোচনা, সত্যকে প্রমাণ করার জন্য তার শক্তিশালী ও হৃদয়গ্রাহী যুক্তি, তারপর তার উন্নত চরিত্র, দৃঢ় সংকল্প, ধৈর্য–স্থৈর্য ও ব্যক্তিগত চরিত্রমাধুর্য তার অত্যন্ত স্পষ্ট সরল ও সত্যনিষ্ঠ ভূমিকা এবং তার অসাধারণ প্রজ্ঞা ও বিচক্ষণতা, যার প্রভাব তার চরম হঠকারী ও কট্টর বিরুদ্ধবাদীরও মনের গভীরে শিকড় গেড়ে বসে, সর্বোপরি সমকালীন সমাজের সর্বোত্তম ব্যক্তিবর্গের তাঁর কথায় প্রভাবিত হতে থাকা এবং তাদের জীবনে সত্যের দাওয়াতের প্রভাবে অস্বাভাবিক পরিবর্তন সূচিত হওয়া—এসব জিনিস মিলেমিশে একটা জটিল

وَلَقَدْ جَآءَتْ رُسُلُنَآ إِبْرٰهِيمَ بِالْبُشْرٰى قَالُوا سَلٰمًا ۖ قَالَ سَلٰمٌ
فَمَا لَبِثَ أَنْ جَآءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ ﴿٦٩﴾ فَلَمَّا رَآ أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ
إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً ۚ قَالُوا لَا تَخَفْ إِنَّآ
أُرْسِلْنَآ إِلٰى قَوْمِ لُوطٍ ﴿٧٠﴾ وَامْرَأَتُهُ قَآئِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنٰهَا
بِإِسْحٰقَ ۙ وَمِنْ وَّرَآءِ إِسْحٰقَ يَعْقُوبَ ﴿٧١﴾

৭ রুকূ'

আর দেখো ইবরাহীমের কাছে আমার ফেরেশতারা সুখবর নিয়ে পৌঁছলো। তারা বললো, তোমার প্রতি সালাম বর্ষিত হোক। ইবরাহীম জওয়াবে বললো, তোমাদের প্রতিও সালাম বর্ষিত হোক। তারপর কিছুক্ষণ যেতে না যেতেই ইবরাহীম একটি কাবাব করা বাছুর (তাদের মেহমানদারীর জন্য)[৭৫] নিয়ে এলো। কিন্তু যখন দেখলো তাদের হাত আহারের দিকে এগুচ্ছে না তখন তাদের প্রতি সন্দিহান হয়ে পড়লো এবং তাদের ব্যাপারে মনে মনে ভীতি অনুভব করতে লাগলো।[৭৬] তারা বললো, "ভয় পাবেন না, আমাদের তো লূতের সম্প্রদায়ের কাছে পাঠানো হয়েছে।"[৭৭] ইবরাহীমের স্ত্রীও দাঁড়িয়ে ছিল, সে একথা শুনে হেসে ফেললো।[৭৮] তারপর আমি তাকে ইসহাকের এবং ইসহাকের পরে ইয়াকুবের সুখবর দিলাম।[৭৯]

পরিস্থিতির সৃষ্টি করে। এর ফলে যারা সত্যের আগমনের পরও পুরাতন জাহেলিয়াতের ঝাণ্ডা উঁচু করে রাখতে চায় তাদের মনে অস্থিরতা সৃষ্টি হয়ে যায়।

৭৩. অর্থাৎ যদি আমি নিজের অন্তরদৃষ্টির বিরুদ্ধে এবং আল্লাহ আমাকে যে জ্ঞান দান করেছেন সেই জ্ঞানের বিরুদ্ধে নিছক তোমাদের খুশী করার জন্য গোমরাহীর পথ অবলম্বন করি তাহলে শুধু আল্লাহর পাকড়াও থেকে তোমরা আমাকে বাঁচাতে পারবে না। তাই নয় বরং তোমাদের কারণে আমার অপরাধ আরো বেশী বেড়ে যাবে। উপরন্তু আমি তোমাদের সোজা পথ বাতলে দেবার পরিবর্তে উলটো আরো জেনেবুঝে তোমাদের গোমরাহ করেছি এ অপরাধে আল্লাহ আমাকে আরো অতিরিক্ত শাস্তি দেবেন।

৭৪. সিনাই উপদ্বীপে প্রচলিত কিংবদন্তী অনুসারে জানা যায়, যখন সামূদ জাতির ওপর আযাব আসে তখন হযরত সালেহ (আ) হিজরাত করে সেখান থেকে চলে গিয়েছিলেন। এ জন্যই "হযরত মূসার পাহাড়ের" কাছেই একটি ছোট পাহাড়ের নাম "নবী সালেহের পাহাড়" এবং কথিত আছে যে, এখানেই তিনি অবস্থান করেছিলেন।

৭৫. এ থেকে জানা যায়, ফেরেশতারা হযরত ইবরাহীমের কাছে এসেছিলেন মানুষের আকৃতি ধরে। শুরুতে তারা নিজেদের পরিচয় দেননি। তাই হযরত ইবরাহীম (আ) তাদেরকে অপরিচিত বিদেশী মেহমান মনে করে আসার সাথে সাথেই তাদের খানাপিনার ব্যবস্থা করেছিলেন।

৭৬. কোন কোন মুফাস্সিরের মতে এ ভয়ের কারণ ছিল এই যে, অপরিচিত নবাগতরা খেতে ইতস্তত করলে তাদের নিয়তের ব্যাপারে হযরত ইবরাহীমের মনে সন্দেহ জাগে এবং তারা কোন প্রকার শত্রুতার উদ্দেশ্য নিয়ে এসেছে কিনা—এ চিন্তা তাঁর মনকে আতঙ্কিত করে তোলে। কারণ আরব দেশে কোন ব্যক্তি কারোর মেহমানদারীর জন্য আনা খাবার গ্রহণ না করলে মনে করা হতো সে মেহমান হিসেবে নয় বরং হত্যা ও লুটতরাজের উদ্দেশ্যে এসেছে। কিন্তু পরবর্তী আয়াতগুলো এ ব্যাখ্যা সমর্থন করে না।'

৭৭. কথা বলার এ ধরন থেকে পরিষ্কার বুঝা যাচ্ছে যে, খাবারের দিকে তাদের হাত এগিয়ে যেতে না দেখে হযরত ইবরাহীম (আ) বুঝতে পেরেছিলেন যে, তারা ফেরেশতা। আর যেহেতু ফেরেশতাদের প্রকাশ্যে মানুষের বেশে আসা অস্বাভাবিক অবস্থাতেই হয়ে থাকে, তাই হযরত ইবরাহীম মূলত যে বিষয়ে ভীত হয়েছিলেন তা ছিল এই যে, তাঁর পরিবারের সদস্যরা বা তাঁর জনপদের লোকেরা অথবা তিনি নিজেই এমন কোন দোষ করে বসেননি তো যে ব্যাপারে পাকড়াও করার জন্য ফেরেশতাদের এই আকৃতিতে পাঠানো হয়েছে। কোন কোন মুফাস্সির যে কথা বুঝেছেন প্রকৃত ব্যাপার যদি তাই হতো তাহলে ফেরেশতারা এভাবে বলতো ঃ "ভয় পেয়ো না, আমরা তোমার রবের প্রেরিত ফেরেশতা।" কিন্তু যখন তারা তাঁর ভয় দূর করার জন্য বললো ঃ "আমাদের তো লূতের সম্প্রদায়ের কাছে পাঠানো হয়েছে," তখন জানা গেলো যে, তাদের ফেরেশতা হওয়ার ব্যাপারটা হযরত ইবরাহীম জেনে গিয়েছিলেন, তবে এ ভেবে তিনি শংকিত হয়ে পড়েছিলেন যে, ফেরেশতারা যখন এ ফিতনা ও পরীক্ষার আবরণে হাযির হয়েছেন তখন কে সেই দুর্ভাগা যার সর্বনাশ সূচিত হতে যাচ্ছে?

৭৮. এ থেকে বুঝা যায়, ফেরেশতার মানুষের আকৃতিতে আসার খবর শুনেই পরিবারের সবাই পেরেশান হয়ে পড়েছিল। এ খবর শুনে হযরত ইবরাহীমের স্ত্রীও ভীত হয়ে বাইরে বের হয়ে এসেছিলেন। তারপর যখন তিনি শুনলেন, তাদের গৃহের বা পরিবারের ওপর কোন বিপদ আসছে না। তখনই তার ধড়ে প্রাণ এলো এবং তিনি আনন্দিত হলেন।

৭৯. ফেরেশতাদের হযরত ইবরাহীমের পরিবর্তে তাঁর স্ত্রী হযরত সারাহকে এ খবর শুনাবার কারণ এই ছিল যে, ইতিপূর্বে হযরত ইবরাহীম একটি পুত্র সন্তান লাভ করেছিলেন। তাঁর দ্বিতীয়া স্ত্রী হযরত হাজেরার গর্ভে সাইয়্যিদিনা ইসমাঈল আলাইহিস সালামের জন্ম হয়েছিল। কিন্তু এ পর্যন্ত হযরত সারাহ ছিলেন সন্তানহীনা। তাই তাঁর মনটিই ছিল বেশী বিষন্ন। তাঁর মনের এ বিষন্নতা দূর করার জন্য তাঁকে শুধু ইসহাকের মতো মহান গৌরবান্বিত পুত্রের জন্মের সুসংবাদ দিয়ে ক্ষান্ত হননি বরং এ সংগে এ সুসংবাদও দেন যে, এ পুত্রের পরে আসছে ইয়াকূবের মতো নাতি, যিনি হবেন বিপুল মর্যাদাসম্পন্ন পয়গম্বর।

قَالَتْ يٰوَيْلَتٰىٓ ءَاَلِدُ وَاَنَا عَجُوْزٌ وَّهٰذَا بَعْلِىْ شَيْخًا ۭ اِنَّ هٰذَا لَشَىْءٌ عَجِيْبٌ ﴿٧٢﴾ قَالُوْٓا اَتَعْجَبِيْنَ مِنْ اَمْرِ اللّٰهِ رَحْمَتُ اللّٰهِ وَبَرَكٰتُهٗ عَلَيْكُمْ اَهْلَ الْبَيْتِ ۭ اِنَّهٗ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ ﴿٧٣﴾ فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ اِبْرٰهِيْمَ الرَّوْعُ وَجَاۗءَتْهُ الْبُشْرٰى يُجَادِلُنَا فِىْ قَوْمِ لُوْطٍ ﴿٧٤﴾ اِنَّ اِبْرٰهِيْمَ لَحَلِيْمٌ اَوَّاهٌ مُّنِيْبٌ ﴿٧٥﴾ يٰٓاِبْرٰهِيْمُ اَعْرِضْ عَنْ هٰذَا ۚ اِنَّهٗ قَدْ جَاۗءَ اَمْرُ رَبِّكَ ۚ وَاِنَّهُمْ اٰتِيْهِمْ عَذَابٌ غَيْرُ مَرْدُوْدٍ ﴿٧٦﴾

সে বললো : হায়, আমার পোড়া কপাল![৮০] এখন আমার সন্তান হবে নাকি, যখন আমি হয়ে গেছি খুনখুনে বুড়ী আর আমার স্বামীও হয়ে গেছে বুড়ো?[৮১] এ তো বড় আশ্চর্য ব্যাপার।" ফেরেশতারা বললো : "আল্লাহর হুকুমের ব্যাপারে অবাক হচ্ছো?[৮২] হে ইবরাহীমের গৃহবাসীরা! তোমাদের প্রতি তো রয়েছে আল্লাহর রহমত ও বরকত, আর অবশ্যি আল্লাহ অত্যন্ত প্রশংসাই এবং বড়ই শান শওকতের অধিকারী।"

তারপর যখন ইবরাহীমের আশংকা দূর হলো এবং (সন্তানের সুসংবাদে) তার মন খুশীতে ভরে গেলো তখন সে লূতের সম্প্রদায়ের ব্যাপারে আমার সাথে বাদানুবাদ শুরু করলো।[৮৩] আসলে ইবরাহীম ছিল বড়ই সহনশীল ও কোমল হৃদয়ের অধিকারী এবং সে সকল অবস্থায়ই আমার দিকে রুজু করতো। (অবশেষে আমার ফেরেশ্তারা তাকে বললা :) "হে ইবরাহীম! এ থেকে বিরত হও। তোমার রবের হুকুম হয়ে গেছে, কাজেই এখন তাদের ওপর এ আযাব অবধারিত। কেউ ফেরাতে চাইলেই তা ফিরতে পারে না।"[৮৪]

৮০. এর মানে এ নয় যে, হযরত সারাহ এ খবর শুনে যথার্থই খুশী হবার পরিবর্তে উলটো একে দুর্ভাগ্য মনে করেছিলেন। বরং আসলে এগুলো এমন ধরনের শব্দ ও বাক্য, যা মেয়েরা সাধারণত কোন ব্যাপারে অবাক হয়ে গেলে বলে থাকে। এ ক্ষেত্রে এর শাব্দিক অর্থ এখানে লক্ষ হয় না বরং নিছক বিস্ময় প্রকাশই উদ্দেশ্য হয়ে থাকে।

৮১. বাইবেল থেকে জানা যায়, হযরত ইবরাহীমের বয়স এ সময় ছিল ১০০ বছর এবং হযরত সারাহর বয়স ছিল ৯০ বছর।

৮২. এর মানে হচ্ছে, যদিও প্রকৃতিগত নিয়ম অনুযায়ী এ বয়সে মানুষের সন্তান হয় না তবুও আল্লাহর কুদরতে এমনটি হওয়া কোন অসম্ভব ব্যাপারও নয়। আর এ সুসংবাদ

যখন তোমাকে আল্লাহর পক্ষ থেকে দেয়া হচ্ছে তখন তোমার মতো একজন মুমিনা মহিলার পক্ষে এ ব্যাপারে বিস্ময় প্রকাশ করার কোন কারণ নেই।

৮৩. এহেন পরিস্থিতিতে "বাদানুবাদ" শব্দটি আল্লাহর সাথে হযরত ইবরাহীমের গভীর ভালোবাসা ও মান-অভিমানের সম্পর্কের কথা প্রকাশ করে। এ শব্দটি বান্দা ও আল্লাহর মধ্যে দীর্ঘক্ষণ বিতর্ক জারি থাকার একটি দৃশ্যপট অংকন করে। লূতের সম্প্রদায়ের ওপর থেকে কোন প্রকারে আযাব সরিয়ে দেবার জন্য বান্দা বারবার জোর দিচ্ছে। আর জবাবে আল্লাহ বলছেন, এ সম্প্রদায়টির মধ্যে এখন ন্যায়, কল্যাণ ও সততার কোন অংশই নেই। এর অপরাধসমূহ এমনভাবে সীমা অতিক্রম করেছে যে, একে আর কোন প্রকার সুযোগ দেয়া যেতে পারে না। বান্দা তবুও আবার বলে যাচ্ছে ঃ "হে পরওয়ারদিগার! যদি সামান্যতম সদ্‌গুণও এর মধ্যে থেকে থাকে, তাহলে একে আরো একটু অবকাশ দিন, হয়তো এ সদগুণ কোন সুফল বয়ে আনবে।" বাইবেলে এ বাদানুবাদের কিছু বিস্তারিত বর্ণনা উদ্ধৃত হয়েছে। কিন্তু কুরআনের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা তার তুলনায় আরো বেশী অর্থবহ ব্যাপকতার অধিকারী। তুলনামূলক অধ্যয়নের জন্য বাইবেল আদি পুস্তকের ১৮ অধ্যায়ের ২৩-৩২ বাক্য দেখুন)

৮৪. বর্ণনার এ ধারাবাহিকতায় হযরত ইবরাহীমের এ ঘটনাটি বিশেষ করে লূতের সম্প্রদায়ের ঘটনার মুখবন্ধ হিসেবে বাহ্যত কিছুটা বেখাপ্পা মনে হয়। কিন্তু আসলে যে উদ্দেশ্যে অতীত ইতিহাসের এ ঘটনাবলী এখানে বর্ণনা করা হচ্ছে তার প্রেক্ষিতে এটা এখানে যথার্থই প্রযোজ্য হয়েছে। ঘটনাগুলোর এ পারস্পরিক যোগসূত্র অনুধাবন করার জন্য নিম্নোক্ত দু'টি বিষয় সামনে রাখতে হবে।

এক ঃ এখানে কুরাইশ গোত্রের লোকদেরকে সম্বোধন করা হয়েছে। হযরত ইবরাহীমের আওলাদ হওয়ার কারণে তারা আরব এলাকার সমগ্র জনবসতির কাছে পীরজাদা, আল্লাহর ঘর কা'বার খাদেম এবং ধর্মীয়, নৈতিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক নেতৃত্বের অধিকারী সেজে বসেছে। তারা প্রচন্ড অহংকারে মত্ত। তারা মনে করে, তাদের ওপর আল্লাহর গজব কেমন করে আসতে পারে! তারা তো আল্লাহর সেই প্রিয় বান্দার আওলাদ। আল্লাহর দরবারে তাদের পক্ষে সুপারিশ করার জন্য তিনি রয়েছেন। তাদের এ মিথ্যা অহংকার চূর্ণ করার জন্য প্রথমে তাদের এ দৃশ্য দেখানো হলো যে, হযরত নূহের মতো মহান মর্যাদাশালী নবী নিজের চোখের সামনে নিজের কলিজার টুকরা ছেলেকে ডুবতে দেখছেন। তাকে বাঁচাবার জন্য আল্লাহর কাছে কাতর কন্ঠে প্রার্থনা করছেন। কিন্তু শুধু যে, তাঁর সুপারিশ তাঁর ছেলের কোন কাজে আসেনি তা নয় বরং উল্টো এ সুপারিশ করার কারণে তাঁকে ধমক খেতে হচ্ছে। তারপর এখন এ দ্বিতীয় দৃশ্য দেখানো হচ্ছে খোদ হযরত ইবরাহীমের। একদিকে তাঁর ওপর অজস্র অনুগ্রহ বর্ষণ করা হয়েছে এবং অত্যন্ত স্নেহার্দ্র ও কোমল ভংগীতে তাঁর কথা আলোচনা করা হচ্ছে। কিন্তু অন্যদিকে যখন সেই ইবরাহীম খলীলুল্লাহ আবার ইনসাফের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করেছেন তখন তাঁর তাকীদ ও চাপ প্রদান সত্ত্বেও আল্লাহ অপরাধী জাতির মোকাবিলায় তাঁর সুপারিশ রদ করে দিচ্ছেন।

দুই ঃ এ ভাষণের উদ্দেশ্য কুরাইশদের মনের মধ্যে একথাও গেঁথে দেয়া যে, আল্লাহর যে কর্মফল বিধির ব্যাপারে একেবারে নির্ভীক ও নিশ্চিন্ত হয়ে তারা বসে ছিল,

وَلَمَّا جَاۤءَتۡ رُسُلُنَا لُوۡطًا سِیۡٓءَ بِهِمۡ وَضَاقَ بِهِمۡ ذَرۡعًا وَّقَالَ هٰذَا یَوۡمٌ عَصِیۡبٌ ﴿۷۷﴾ وَجَآءَهٗ قَوۡمُهٗ یُهۡرَعُوۡنَ اِلَیۡهِ ؕ وَمِنۡ قَبۡلُ کَانُوۡا یَعۡمَلُوۡنَ السَّیِّاٰتِ ؕ قَالَ یٰقَوۡمِ هٰۤؤُلَآءِ بَنَاتِیۡ هُنَّ اَطۡهَرُ لَکُمۡ فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَلَا تُخۡزُوۡنِ فِیۡ ضَیۡفِیۡ ؕ اَلَیۡسَ مِنۡکُمۡ رَجُلٌ رَّشِیۡدٌ ﴿۷۸﴾ قَالُوۡا لَقَدۡ عَلِمۡتَ مَا لَنَا فِیۡ بَنٰتِکَ مِنۡ حَقٍّ ۚ وَاِنَّکَ لَتَعۡلَمُ مَا نُرِیۡدُ ﴿۷۹﴾

আর যখন আমার ফেরেশতারা লূতের কাছে পৌঁছে গেলো[৮৫] তখন তাদের আগমনে সে খুব ঘাবড়ে গেলো এবং তার মন ভয়ে জড়সড় হয়ে গেলো। সে বলতে লাগলো, আজ বড় বিপদের দিন।[৮৬] (এ মেহমানদের আসার সাথে সাথেই) তার সম্প্রদায়ের লোকেরা নির্দ্বিধায় তার ঘরের দিকে ছুটে আসতে লাগলো। আগে থেকেই তারা এমনি ধরনের কুকর্মে অভ্যস্ত ছিল। লূত তাদেরকে বললো ঃ "ভাইয়েরা! এই যে, এখানে আমার মেয়েরা আছে, এরা তোমাদের জন্য পবিত্রতর।[৮৭] আল্লাহর ভয়–ডর কিছু করো এবং আমার মেহমানদের ব্যাপারে আমাকে লাঞ্ছিত করো না, তোমাদের মধ্যে কি একজনও ভালো লোক নেই?" তারা জবাব দিল ঃ "তুমি তো জানোই, তোমার মেয়েদের দিয়ে আমাদের কোন কাজ নেই[৮৮] এবং আমরা কি চাই তাও তুমি জানো।"

তা কিভাবে ইতিহাসের আবর্তনে ধারাবাহিকভাবেও যথারীতি প্রকাশ পেয়ে এসেছে এবং কেমন সব প্রকাশ্য লক্ষণ তাদের নিজেদের চারপাশে ছড়িয়ে রয়েছে। একদিকে রয়েছেন হযরত ইবরাহীম। তিনি সত্য ও ন্যায়ের খাতিরে গৃহহারা হয়ে একটি অপরিচিত দেশে অবস্থান করছেন। আপাতদৃষ্টিতে তাঁর কোন শক্তি–সামর্থ নেই। কিন্তু তাঁর সৎকর্মের ফল আল্লাহ তাঁকে এমনভাবে দান করেন যে, তাঁর বুড়ী ও বন্ধ্যা স্ত্রীর গর্ভে ইসহাক আলাইহিস সালামের জন্ম হয়। তারপর হযরত ইসহাকের ঔরসে ইয়াকূব আলাইহিস সালামেরও জন্ম হয়। তাঁর থেকে বনী ইসরাঈলের সুবিশাল বংশধারা এগিয়ে চলে। তাদের শ্রেষ্ঠত্বের ডংকা শত শত বছর ধরে বাজতে থাকে ফিলিস্তিন ও সিরীয় ভূখণ্ডে, যেখানে হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালাম একদিন গৃহহারা মুহাজির হিসেবে এসে বসতি স্থাপন করেছিলেন। অন্যদিকে রয়েছে লূতের সম্প্রদায়। এ ভূখণ্ডের একটি অংশে তারা প্রাচুর্য ও সমৃদ্ধির সাগরে ভেসে বেড়াচ্ছে এবং নিজেদের ব্যভিচারমূলক কার্যকলাপে লিপ্ত

থাকছে। বহুদূর পর্যন্ত কোথাও তারা নিজেদের বদকর্মের জন্য কোন আযাবের লক্ষণ দেখতে পাচ্ছে না। লূত আলাইহিস সালামের উপদেশকে তারা ফুৎকারে উড়িয়ে দিচ্ছে। কিন্তু যে তারিখে ইবরাহীমের বংশ থেকে একটি বিরাট সৌভাগ্যবান জাতির উত্থানের ফায়সালা করা হয় ঠিক সেই একই তারিখেই এ ব্যভিচারী জাতিটিকে দুনিয়ার বুক থেকে নিশ্চিহ্ন করে দেবার ফরমানও জারি হয়ে যায়। এমন বিভীষিকাময় পদ্ধতিতে তাদেরকে ধ্বংস করে দেয়া হয় যে, আজ তাদের জনবসতির নাম-নিশানাও কোথাও খুঁজে পাওয়া যায় না।

৮৫. সূরা আ'রাফের ১০ রুকূ'র টীকাগুলো দেখুন।

৮৬. এ ঘটনার যে বিস্তারিত বিবরণ কুরআন মজীদে দেয়া হয়েছে তার বক্তব্যের অন্তরনিহিত তাৎপর্য থেকে একথা সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, ফেরেশতারা সুন্দর ছেলেদের ছদ্মবেশে হযরত লূতের গৃহে এসেছিলেন। তারা যে ফেরেশতা একথা হযরত লূত জানতেন না। এ কারণে এ মেহমানদের আগমনে তিনি খুব বেশী মানসিক উৎকণ্ঠা অনুভব করছিলেন এবং তাঁর মনও সংকুচিত হয়ে গিয়েছিল। তিনি নিজের সম্প্রদায়কে জানতেন। তারা কেমন ব্যভিচারী এবং কী পর্যায়ের নির্লজ্জ হয়ে গেছে তা তাঁর জানা ছিল।

৮৭. হতে পারে হযরত লূত সমগ্র সম্প্রদায়ের মেয়েদের দিকে ইংগিত করেছেন। কারণ নবী তার সম্প্রদায়ের জন্য বাপের পর্যায়ভুক্ত হয়ে থাকেন। আর সম্প্রদায়ের মেয়েরা তাঁর দৃষ্টিতে নিজের মেয়ের মতো হয়ে থাকে। আবার এও হতে পারে যে, তাঁর ইংগিত ছিল তাঁর নিজের মেয়েদের প্রতি। তবে ব্যাপার যাই হোক না কেন উভয় অবস্থাতেই একথা ধারণা করার কোন কারণই নেই যে, হযরত লূত তাদেরকে যিনা করার জন্য আহবান জানিয়েছিলেন। "এরা তোমাদের জন্য পবিত্রতর"— একথাই যাবতীয় ভুল অর্থের অবকাশ খতম করে দিয়েছে। হযরত লূতের বক্তব্যের পরিষ্কার উদ্দেশ্য এই ছিল যে, আল্লাহ যে জায়েয পদ্ধতি নির্ধারণ করেছেন সেই পদ্ধতিতেই নিজেদের যৌন কামনা পূর্ণ করো এবং এ জন্য মেয়েদের অভাব নেই।

৮৮. এ বাক্যটি তাদের মানসিক অবস্থার পূর্ণচিত্র এঁকে দেয়। বুঝা যায় লাম্পট্যের ক্ষেত্রে তারা কত নিচে নেমে গিয়েছিল। তারা স্বভাব-প্রকৃতি ও পবিত্রতার পথ পরিহার করে একটি পূতিগন্ধময় প্রকৃতি বিরোধী পথে চলতে শুরু করেছিল, ব্যাপার শুধুমাত্র এতটুকুই ছিল না বরং অবস্থা এমন পর্যায়ে পৌঁছে দিয়েছিল যে, এখন শুধুমাত্র এ একটি নোংরা পথের প্রতিই ছিল তাদের সমস্ত ঝোঁক-প্রবণতা, আকর্ষণ ও অনুরাগ। তাদের প্রবৃত্তি এখন শুধুমাত্র এ নোংরামিরই অনুসন্ধান করে ফিরছিল। প্রকৃতি ও পবিত্রতার পথ তো আমাদের জন্য তৈরীই হয়নি—একথা বলতে তারা কোন লজ্জা অনুভব করতো না। এটা হচ্ছে নৈতিক অধপতন ও চারিত্রিক বিকৃতির চূড়ান্ত পর্যায়। এর চেয়ে বেশী নিম্নগামিতার কথা কল্পনাই করা যেতে পারে না। যে ব্যক্তি নিছক নফ্স ও প্রবৃত্তির দুর্বলতার কারণে হারাম কাজে লিপ্ত হয়ে যায়, এ সত্ত্বেও হালালকে কাংখিত এবং হারামকে পরিত্যাজ্য মনে করে, তার বিষয়টি খুবই হাল্‌কা। এমন ব্যক্তি কখনো সংশোধিত হয়ে যেতে পারে। আর সংশোধিত হয়ে না গেলেও তার সম্পর্কে বড় জোর এতটুকু বলা যেতে পারে যে, সে একজন বিকৃত চরিত্রসম্পন্ন ব্যক্তি। কিন্তু যখন কোন ব্যক্তির সমস্ত আগ্রহ হারামের মধ্যেই কেন্দ্রীভূত হয়ে যায় এবং সে মনে করতে থাকে

قَالَ لَوْ اَنَّ لِيْ بِكُمْ قُوَّةً اَوْ اٰوِيْٓ اِلٰى رُكْنٍ شَدِيْدٍ ۝٨٠ قَالُوْا يٰلُوْطُ اِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ لَنْ يَّصِلُوْٓا اِلَيْكَ فَاَسْرِ بِاَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ الَّيْلِ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ اَحَدٌ اِلَّا امْرَاَتَكَ ؕ اِنَّهٗ مُصِيْبُهَا مَآ اَصَابَهُمْ ؕ اِنَّ مَوْعِدَهُمُ الصُّبْحُ ؕ اَلَيْسَ الصُّبْحُ بِقَرِيْبٍ ۝٨١ فَلَمَّا جَآءَ اَمْرُنَا جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَاَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّنْ سِجِّيْلٍ ۙ۬ مَّنْضُوْدٍ ۝٨٢ مُّسَوَّمَةً عِنْدَ رَبِّكَ ؕ وَمَا هِيَ مِنَ الظّٰلِمِيْنَ بِبَعِيْدٍ ۝٨٣

লূত বললো : "হায়! যদি আমার এতটা শক্তি থাকতো যা দিয়ে আমি তোমাদের সোজা করে দিতে পারতাম অথবা কোন শক্তিশালী আশ্রয় থাকতো সেখানে আশ্রয় নিতে পারতাম।" তখন ফেরেশতারা তাকে বললো : "হে লূত! আমরা তোমার রবের প্রেরিত ফেরেশতা। এরা তোমার কোন ক্ষতি করতে পারবে না। তুমি কিছুটা রাত থাকতে তোমার পরিবার পরিজন নিয়ে বের হয়ে যাও। আর সাবধান! তোমাদের কেউ যেন পেছন ফিরে না তাকায়।[৮৯] কিন্তু তোমার স্ত্রী ছাড়া (সে সাথে যাবে না) কারণ তার ওপরও তাই ঘটবে যা ঐ সব লোকের ঘটবে।[৯০] তাদের ধ্বংসের জন্য প্রভাতকাল নির্দিষ্ট রয়েছে।–প্রভাত হবার আর কতটুকুই বা দেরী আছে!"

তারপর যখন আমার ফায়সালার সময় এসে গেলো, আমি গোটা জনপদটি উল্‌টে দিলাম এবং তার ওপর পাকা মাটির পাথর অবিরামভাবে বর্ষণ করলাম,[৯১] যার মধ্য থেকে প্রত্যেকটি পাথর তোমার রবের কাছে চিহ্নিত ছিল।[৯২] আর জালেমদের থেকে এ শাস্তি মোটেই দূরে নয়।[৯৩]

হালাল তার জন্য তৈরীই হয়নি তখন তাকে মানুষের মধ্যেই গণ্য করা যেতে পারে না। সে আসলে একটি নোংরা কীট। মলমূত্র ও দুর্গন্ধের মধ্যেই সে প্রতিপালিত হয় এবং পাক–পবিত্রতার সাথে তার প্রকৃতিগত কোন সম্পর্কই নেই। এ ধরনের কীট যদি কোন পরিচ্ছন্নতা প্রিয় মানুষের ঘরে জন্ম নেয় তাহলে প্রথম সুযোগেই সে ফিনাইল ঢেলে দিয়ে তার অস্তিত্ব থেকে নিজের গৃহকে মুক্ত করে নেয়। তাহলে আল্লাহ তার যমীনে এ ধরনের নোংরা কীটদের সমাবেশকে কতদিন বরদাশ্‌ত করতে পারতেন।

৮৯. এর মানে হচ্ছে, এখন তোমাদের কিভাবে তাড়াতাড়ি এ এলাকা থেকে বের হয়ে যেতে পারো সে চিন্তা করা উচিত। পেছনে শোরগোল ও বিস্ফোরণের আওয়াজ শুনে তোমরা

وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا ۚ قَالَ يَٰقَوْمِ ٱعْبُدُوا۟ ٱللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُۥ ۖ وَلَا تَنقُصُوا۟ ٱلْمِكْيَالَ وَٱلْمِيزَانَ ۚ إِنِّىٓ أَرَىٰكُم بِخَيْرٍ وَإِنِّىٓ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُّحِيطٍ ﴿٨٤﴾ وَيَٰقَوْمِ أَوْفُوا۟ ٱلْمِكْيَالَ وَٱلْمِيزَانَ بِٱلْقِسْطِ ۖ وَلَا تَبْخَسُوا۟ ٱلنَّاسَ أَشْيَآءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا۟ فِى ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿٨٥﴾ بَقِيَّتُ ٱللَّهِ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ۚ وَمَآ أَنَا۠ عَلَيْكُم بِحَفِيظٍ ﴿٨٦﴾

৮ রুকূ'

আর মাদ্‌য়ানবাসীদের কাছে আমি তাদের ভাই শো'আয়েবকে পাঠালাম।[৯৪] সে বললো ঃ "হে আমার সম্প্রদায়ের লোকেরা! আল্লাহর বন্দেগী করো। তিনি ছাড়া তোমাদের আর কোন ইলাহ নেই। আর মাপে ও ওজনে কম করো না। আজ আমি তোমাদের ভালো অবস্থায় দেখছি কিন্তু আমার ভয় হয় কাল তোমাদের ওপর এমন দিন আসবে যার আযাব সবাইকে ঘেরাও করে ফেলবে। আর হে আমার সম্প্রদায়ের ভাইয়েরা! যথাযথ ইনসাফ সহকারে মাপো ও ওজন করো এবং লোকদেরকে তাদের প্রাপ্য সামগ্রী কম দিয়ো না। আর পৃথিবীতে বিপর্যয় ছড়িয়ে বেড়িয়ো না। আল্লাহর দেয়া উদ্বৃত্ত তোমাদের জন্য ভালো যদি তোমরা মুমিন হয়ে থাকো। মোট কথা আমি তোমাদের ওপর কোন কর্ম তত্ত্বাবধানকারী নই।[৯৫]

যেন পথে থেমে না যাও এবং আযাবের জন্য যে এলাকা নির্ধারিত হয়েছে আযাবের সময় এসে যাবার পরও তোমাদের কেউ যেন সেখানে অবস্থান না করে।

৯০. এটি তৃতীয় মর্মন্তুদ শিক্ষণীয় ঘটনা। এ সূরায় লোকদেরকে একথা শিক্ষা দেবার জন্য বর্ণনা করা হয়েছে যে, কোন বুযর্গের সাথে আত্মীয়তার সম্পর্ক এবং কোন বুযর্গের সুপারিশ তোমাদের নিজেদের গোনাহের পরিণতি থেকে বাঁচাতে পারে না।

৯১. সম্ভবত একটি ভয়াবহ ভূমিকম্প ও আগ্নেয়গিরির অগ্নুৎপাতের আকারে এ আযাব এসেছিল। ভূমিকম্প জনবসতিটিকে ওলট–পালট করে দিয়েছিল এবং অগ্নুৎপাতের ফলে তার ওপর হয়েছিল ব্যাপক হারে পাথর বৃষ্টি। "পাকা মাটির পাথর" বলতে সম্ভবত এমন মাটি বুঝানো হয়েছে যা আগ্নেয়গিরির আওতাধীন এলাকার ভূগর্ভস্থ উত্তাপ ও লাভার প্রভাবে পাথরে পরিণত হয়। আজ পর্যন্ত লূত সাগরের (Dead Sea) দক্ষিণ ও পূর্ব এলাকায় এ পাথর বর্ষণের চিহ্ন সর্বত্র সুস্পষ্টভাবে দেখা যায়।

قَالُوْا يٰشُعَيْبُ اَصَلٰوتُكَ تَاْمُرُكَ اَنْ نَّتْرُكَ مَا يَعْبُدُ اٰبَآؤُنَآ اَوْ اَنْ نَّفْعَلَ فِيْٓ اَمْوَالِنَا مَا نَشٰٓؤُا ؕ اِنَّكَ لَاَنْتَ الْحَلِيْمُ الرَّشِيْدُ ۝

তারা জবাব দিল : "হে শো'আয়েব! তোমার নামায কি তোমাকে একথা শেখায়[৯৬] যে, আমরা এমন সমস্ত মাবুদকে পরিত্যাগ করবো যাদেরকে আমাদের বাপ–দাদারা পূজা করতো? অথবা নিজেদের ধন–সম্পদ থেকে নিজেদের ইচ্ছা অনুযায়ী খরচ করার ইখতিয়ার আমাদের থাকবে না?[৯৭] ব্যস, শুধু তুমিই রয়ে গেছো একমাত্র উচ্চ হৃদয়ের অধিকারী ও সদাচারী।"

৯২. অর্থাৎ আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রত্যেকটি পাথরকে কি ধ্বংসাত্মক কাজ করতে হবে এবং কোন্ পাথরটি কোন্ অপরাধীর ওপর পড়বে তা পূর্ব থেকেই নির্ধারিত করে দেয়া হয়েছিল।

৯৩. অর্থাৎ আজ যারা জুলুমের পথে চলছে তারাও যেন এ আযাবকে নিজেদের থেকে দূরে না মনে করে। লূতের সম্প্রদায়ের ওপর যদি আযাব আসতে পেরে থাকে তাহলে তাদের ওপরও আসতে পারে। লূতের সম্প্রদায় আল্লাহর আযাব ঠেকাতে পারেনি, এরাও পারবে না।

৯৪. সূরা আ'রাফের ১১ রুকূ' দেখুন।

৯৫. অর্থাৎ তোমাদের ওপর আমার কোন জোর নেই। আমি তো শুধু একজন কল্যাণকামী উপদেষ্টা মাত্র। বড় জোর আমি তোমাদের বুঝাতে পারি। তারপর তোমরা চাইলে মানতে পারো আবার নাও মানতে পারো। আমার কাছে জবাবদিহি করার ভয় করা বা না করার প্রশ্ন নয়। বরং আসল প্রশ্ন হচ্ছে আল্লাহর সামনে জবাবদিহি করা। আল্লাহর কিছু ভয় যদি তোমাদের মনে থেকে থাকে তাহলে তোমরা যা কিছু করছো তা থেকে বিরত থাকো।

৯৬. এটি আসলে একটি তিরস্কারসূচক বাক্য। যে সমাজ আল্লাহকে ভুলে গেছে এবং ফাসেকী, অশ্লীলতা ও নৈতিকতা বিরোধী কার্যকলাপের মধ্যে ডুবে গেছে এমন প্রত্যেকটি সমাজেই এ ভাবধারা আজো মূর্ত দেখা যাবে। যেহেতু নামায দীনদারীর সর্বপ্রথম ও সবচেয়ে সুস্পষ্ট চিহ্ন এবং ফাসেক ও ব্যভিচারী লোকেরা নামাযকে একটি ভয়ংকর বরং সবচেয়ে মারাত্মক রোগ মনে করে থাকে তাই এ ধরনের লোকদের সমাজে নামায ইবাদাতের পরিবর্তে রোগের চিহ্ন হিসেবে গণ্য হয়ে থাকে। নিজেদের মধ্যে কোন ব্যক্তিকে নামায পড়তে দেখলে সংগে সংগেই তাদের মনে এ অনুভূতি জাগে যে, এ ব্যক্তির ওপর "দীনদারীর আক্রমণ" ঘটেছে। তারপর এরা দীনদারীর এ বৈশিষ্টও ভালোভাবে জানে যে, এ জিনিসটি যার মধ্যে সৃষ্টি হয়ে যায় সে কেবল নিজের সৎ ও পরিচ্ছন্ন কর্মধারার ওপরই সন্তুষ্ট থাকে না বরং অন্যদেরকেও সংশোধন করার চেষ্টা করে এবং বে–দীনী ও নৈতিকতা বিরোধী কার্যকলাপের বিরুদ্ধে সমালোচনা না করে সে স্থির থাকতে পারে না। তাই নামাযের বিরুদ্ধে এদের অস্থিরতা শুধুমাত্র এ আকারে দেখা দেয় না যে, এদের এক ভাই দীনদারীর মধ্যে পরিবেষ্টিত হয়ে গেছে বরং এ সংগে এদের মনে সন্দেহও

قَالَ يٰقَوْمِ اَرَءَيْتُمْ اِنْ كُنْتُ عَلٰى بَيِّنَةٍ مِّنْ رَّبِّىْ وَرَزَقَنِىْ مِنْهُ رِزْقًا حَسَنًا ۗ وَمَآ اُرِيْدُ اَنْ اُخَالِفَكُمْ اِلٰى مَآ اَنْهٰكُمْ عَنْهُ ۗ اِنْ اُرِيْدُ اِلَّا الْاِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ ۗ وَمَا تَوْفِيْقِىْ اِلَّا بِاللّٰهِ ۗ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَاِلَيْهِ اُنِيْبُ ﴿٨٨﴾

শো'আয়েব বললো ঃ "ভাইয়েরা! তোমরা নিজেরাই ভেবে দেখো, যদি আমি আমার রবের পক্ষ থেকে একটি সুস্পষ্ট সাক্ষের ওপর প্রতিষ্ঠিত থেকে থাকি, তারপর তিনি আমাকে উত্তম রিযিকও দান করেন[৯৮] (তাহলে এরপর আমি তোমাদের গোমরাহী ও হারামখোরীর কাজে তোমাদের সাথে কেমন করে শরীক হতে পারি?) আর যেসব বিষয় থেকে আমি তোমাদের বিরত রাখতে চাই আমি নিজে কখনো সেগুলোতে লিপ্ত হতে চাই না।[৯৯] আমি তো আমার সাধ্য অনুযায়ী সংশোধন করতে চাই। যাকিছু আমি করতে চাই তা সবই আল্লাহর তাওফীকের ওপর নির্ভর করে। তাঁরি ওপর আমি ভরসা করেছি এবং সব ব্যাপারে তাঁরই দিকে রুজু করি।

জাগে যে, এবার খুব শিগগির চরিত্র, নৈতিকতা ও দীনদারীর ওয়াজ–নসীহত শুরু হয়ে যাবে আর এ সাথে সমাজ জীবনের প্রত্যেকটি দিকে খুঁত বের করার একটি দীর্ঘ সিলসিলার সূচনা হবে। এ কারণেই এ ধরনের সমাজে নামায সবচেয়ে বেশী ভর্ৎসনা, তিরস্কার, নিন্দা ও সমালোচনার সম্মুখীন হয়। আর নামাযী সম্পর্কে পূর্বাহ্নে যে ধরনের আশংকা করা হয়েছিল কোন নামাযী যদি ঠিক সেই পর্যায়েই অসৎকাজের সমালোচনা ও ভালো কাজ করার উপদেশ দিতে শুরু করে দেয় তাহলে তো নামাযীকে এমনভাবে দোষারোপ করা শুরু হয়ে যায় যেন সে–ই এসব আপদের উৎস।

৯৭. এ বক্তব্যটি ইসলামের মোকাবিলায় জাহেলী মতবাদের পূর্ণ পরিচয় তুলে ধরছে। ইসলামের দৃষ্টিভংগী হচ্ছে, আল্লাহর বন্দেগী ছাড়া বাকি অন্যান্য যাবতীয় পদ্ধতিই ভুল। এগুলো অনুসরণ করা উচিত নয়। কারণ অন্য কোন পদ্ধতির পক্ষে বুদ্ধি, জ্ঞান ও আসমানী কিতাবসমূহে কোন যুক্তি–প্রমাণ নেই। আর তাছাড়া শুধুমাত্র একটি সীমিত ধর্মীয় গণ্ডীর মধ্যে আল্লাহর বন্দেগী হওয়া উচিত নয় বরং তামাদ্দুনিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক তথা জীবনের সকল বিভাগেই হওয়া উচিত। কারণ দুনিয়ায় মানুষের কাছে যা কিছু আছে সব আল্লাহর মালিকানাধীন। আল্লাহর ইচ্ছার গণ্ডী ভেদ করে স্বাধীনভাবে কোন একটি জিনিসও মানুষ ব্যবহার করার অধিকার রাখে না। এর মোকাবিলায় জাহেলী মতবাদ হচ্ছে, বাপ–দাদা থেকে যে পদ্ধতি চলে আসছে মানুষের তারই অনুসারী হওয়া উচিত। এর অনুসরণের জন্য এ ছাড়া আর অতিরিক্ত কোন যুক্তি প্রমাণের প্রয়োজন নেই যে, এটা বাপ–দাদাদের পদ্ধতি। তাছাড়া শুধুমাত্র পূজা–অর্চনার

সাথে দীন ও ধর্মের সম্পর্ক রয়েছে। আর আমাদের জীবনের সাধারণ পার্থিব বিষয়াবলীর ব্যাপারে আমাদের পূর্ণ স্বাধীনতা থাকা দরকার, যেভাবে ইচ্ছা আমরা সেভাবে কাজ করতে পারি।

এ থেকে একথাও আন্দাজ করা যেতে পারে যে, জীবনকে ধর্মীয় ও পার্থিব এ দু'ভাগে ভাগ করার চিন্তা আজকের কোন নতুন চিন্তা নয় বরং আজ থেকে তিন সাড়ে তিন হাজার বছর আগে হযরত শো'আয়েব আলাইহিস সালামের সম্প্রদায়ও এ বিভক্তির ওপর ঠিক তেমনিই জোর দিয়েছিল যেমন আজকের যুগে পাশ্চাত্যবাসীরা এবং তাদের প্রাচ্যদেশীয় শাগরিদবৃন্দ জোর দিচ্ছেন। এটা আসলে কোন "নতুন আলো" বা "প্রগতি" নয় যা "মানসিক উন্নয়নে"র কারণে মানুষ আজ লাভ করতে সক্ষম হয়েছে। বরং এটা সেই একই পুরাতন অন্ধকার ও পশ্চাতপদ চিন্তা যা হাজার হাজার বছর আগের জাহেলিয়াতের মধ্যেও আজকের মতো একই আকারে বিরাজমান ছিল। এর সাথে ইসলামের সংঘাত আজকের নয়, অনেক পুরাতন।

৯৮. রিজিক শব্দটি এখানে দ্বিবিধ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। এর একটি অর্থ হচ্ছে, সত্য–সঠিক জ্ঞান, যা আল্লাহর পক্ষ থেকে দেয়া হয়েছে, আর দ্বিতীয় অর্থ হচ্ছে এ শব্দটি থেকে সাধারণত যে অর্থ বুঝা যায় সেটি অর্থাৎ আল্লাহ তাঁর বান্দাদেরকে জীবন যাপন করার জন্য যে জীবন সামগ্রী দান করে থাকেন। প্রথম অর্থটির প্রেক্ষিতে এ আয়াত থেকে এমন একটি বিষয়বস্তুর প্রকাশ ঘটে, যা এ সূরায় মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, নূহ (আ) ও সালেহ আলাইহিস সালামের মুখ থেকে প্রকাশ হয়ে এসেছে। অর্থাৎ নবুওয়াতের আগেও আমি নিজের রবের পক্ষ থেকে সত্যের স্বপক্ষে সুস্পষ্ট সাক্ষ নিজের মনের মধ্যে ও বিশ্ব–জগতের সমস্ত নিদর্শনের মধ্যে পাচ্ছিলাম এবং এরপর আমার রব আমাকে সরাসরিভাবেও সত্য–জ্ঞান দান করেছেন। এখন তোমরা যেসব গোমরাহী ও নৈতিকতা বিরোধী কাজে লিপ্ত রয়েছো তাতে আমার পক্ষে জেনে বুঝে লিপ্ত হওয়া কেমন করে সম্ভবপর হতে পারে? আর দ্বিতীয় অর্থের প্রেক্ষিতে হযরত শো'আয়েবকে তারা ভর্ৎসনা করেছিল এ আয়াতটিকে তার জওয়াব বলা যায়। হযরত শো'আয়েবকে তারা ভর্ৎসনা করে বলেছিল ঃ "ব্যস শুধু তুমিই রয়ে গেছো একজন উদারমনা ও সত্যনিষ্ঠ ব্যক্তি! এ কড়া ও তিক্ত অক্রমণের জবাব এভাবে দেয়া হয়েছে ঃ "ভাইয়েরা! যদি আমার রব সত্যকে চিনবার মতো অন্তরদৃষ্টি এবং হালাল রিযিক আমাকে দিয়ে থাকেন তাহলে তোমাদের নিন্দাবাদের কারণে এ অনুগ্রহ কি করে বিগ্রহে পরিণত হবে? আল্লাহ যখন আমার প্রতি মেহেরবানী করেছেন তখন তোমাদের ভ্রষ্টতা ও হারাম খাওয়াকে আমি সত্য ও হালাল গণ্য করে তাঁর প্রতি অকৃতজ্ঞ হই কেমন করে?

৯৯. অর্থাৎ একথা থেকেই তোমরা আমার সত্যতা আন্দাজ করে নিতে পারো যে, অন্যদের আমি যাকিছু বলি আমি নিজেও তা করি। যদি আমি তোমাদের আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন ইলাহ্‌র পূজা বেদীতে যেতে নিষেধ করতাম এবং নিজে কোন বেদীর সেবক হয়ে বসতাম তাহলে নিসন্দেহে তোমরা বলতে পারতে, নিজের পীরগিরির ব্যবসায়ের প্রসারের জন্য অন্য দোকানগুলোর সুনাম নষ্ট করতে চাচ্ছি। যদি আমি তোমাদের হারাম

وَيٰقَوْمِ لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شِقَاقِيْٓ اَنْ يُّصِيْبَكُمْ مِّثْلُ مَآ اَصَابَ قَوْمَ نُوْحٍ اَوْ قَوْمَ هُوْدٍ اَوْ قَوْمَ صٰلِحٍ ؕ وَمَا قَوْمُ لُوْطٍ مِّنْكُمْ بِبَعِيْدٍ ﴿۸۹﴾ وَاسْتَغْفِرُوْا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوْبُوْٓا اِلَيْهِ ؕ اِنَّ رَبِّيْ رَحِيْمٌ وَّدُوْدٌ ﴿۹۰﴾

আর হে আমার সম্প্রদায়ের ভাইয়েরা! আমার বিরুদ্ধে তোমাদের একগুঁয়েমি যেন এমন পর্যায়ে না পৌঁছে যায় যে, শেষ পর্যন্ত তোমাদের ওপরও সেই একই আযাব এসে পড়ে, যা এসেছিল নূহ, হূদ বা সালেহের সম্প্রদায়ের ওপর। আর লূতের সম্প্রদায় তো তোমাদের থেকে বেশী দূরের নয়।[১০০] দেখো, নিজেদের রবের কাছে ক্ষমা চাও এবং তাঁর দিকে ফিরে এসো। অবশ্যি আমার রব করুণাশীল এবং নিজের সৃষ্টিকে ভালোবাসেন।[১০১]

জিনিস খেতে নিষেধ করতাম এবং নিজের কারবারে বেঈমানী করতে থাকতাম তাহলে তোমরা অবশ্যি এ সন্দেহ পোষণ করতে পারতে যে, আমি নিজের সুনাম প্রতিষ্ঠিত করার জন্য ঈমানদারীর ঢাক পিটাচ্ছি। কিন্তু তোমরা দেখছো, যেসব অসৎকাজ থেকে আমি তোমাদের নিষেধ করছি। আমি নিজেও সেগুলো থেকে দূরে থাকছি। যেসব কলংক থেকে আমি তোমাদের মুক্ত দেখতে চাচ্ছি আমার নিজের জীবনও তা থেকে মুক্ত। তোমাদের আমি যে পথের দিকে আহবান জানাচ্ছি আমার নিজের জন্যও আমি সেই পথটিই পছন্দ করেছি। এসব জিনিস একথা প্রমাণ করে যে, আমি যে দাওয়াত দিয়ে যাচ্ছি সে ব্যাপারে আমি সত্যবাদী ও একনিষ্ঠ।

১০০. অর্থাৎ লূতের সম্প্রদায়ের ঘটনা তো খুব বেশী দিনের কথা নয়। তোমাদের সামনে এ ঘটনা এখনো তরতাজা আছে। তোমাদের কাছাকাছি এলাকায় এ ঘটনা ঘটেছিল। সম্ভবত লূতের কওমের ধ্বংসের পর তখন ছ'–সাতশো বছরের বেশী সময় অতিক্রান্ত হয়নি। আর ভৌগোলিক দিক দিয়েও লূতের কওম যেখানে বসবাস করতো শো'আয়েবের কওমের এলাকাও ছিল একেবারে তার লাগোয়া।

১০১. অর্থাৎ মহান আল্লাহ পাষাণ হৃদয় ও নির্দয় নন। নিজের সৃষ্টির সাথে তাঁর কোন শত্রুতা নেই। তাদেরকে অযথা শাস্তি দিতে তিনি চান না। নিজের বান্দাদেরকে মারপিট করে তিনি খুশী হন না। তোমরা যখন নিজেদের বিদ্রোহাত্মক কার্যকলাপে সীমা অতিক্রম করে যাও এবং কোন প্রকারেই বিপর্যয় সৃষ্টিতে বিরত হও না তখন তিনি অনিচ্ছাসত্ত্বেও তোমাদের শাস্তি দেন। নয়তো তাঁর অবস্থা হচ্ছে এই যে, তোমরা যতই দোষ কর না কেন যখনই তোমরা নিজেদের কৃতকর্মের ব্যাপারে লজ্জিত হয়ে তাঁর দিকে ফিরে আসবে তখনই তাঁর হৃদয়কে নিজেদের জন্য প্রশস্ততর পাবে। কারণ নিজের সৃষ্ট জীবের প্রতি তাঁর স্নেহ ও ভালোবাসার অন্ত নেই।

قَالُوْا يٰشُعَيْبُ مَا نَفْقَهُ كَثِيْرًا مِّمَّا تَقُوْلُ وَاِنَّا لَنَرٰىكَ فِيْنَا ضَعِيْفًا ۚ وَلَوْلَا رَهْطُكَ لَرَجَمْنٰكَ ۫ وَمَآ اَنْتَ عَلَيْنَا بِعَزِيْزٍ ﴿٩١﴾

তারা জবাব দিল ঃ "হে শোআয়েব! তোমার অনেক কথাই তো আমরা বুঝতে পারি না[১০২] আর আমরা দেখছি তুমি আমাদের মধ্যে একজন দুর্বল ব্যক্তি। তোমার ভ্রাতৃগোষ্ঠী না থাকলে আমরা কবেই তোমাকে পাথর নিক্ষেপে মেরে ফেলতাম। আমাদের ওপর প্রবল হবার মতো ক্ষমতা তোমার নেই।[১০৩]

এ বিষয়বস্তুটিকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দু'টি অত্যন্ত সূক্ষ্ম দৃষ্টান্ত দিয়ে সুস্পষ্ট করেছেন। তিনি একটি দৃষ্টান্ত এভাবে দিয়েছেন যে, তোমাদের কোন ব্যক্তির উট যদি কোন বিশুষ্ক তৃণপানিহীন এলাকায় হারিয়ে গিয়ে থাকে, তার পিঠে তার পানাহারের সামগ্রীও থাকে এবং সে ব্যক্তি তার খোঁজ করতে করতে নিরাশ হয়ে পড়ে। এ অবস্থায় জীবন সম্পর্কে নিরাশ হয়ে সে একটি গাছের নীচে শুয়ে পড়ে। ঠিক এমনি অবস্থায় সে দেখে তার উটটি তার সামনে দাঁড়িয়ে আছে। এ সময় সে যে পরিমাণ খুশী হবে আল্লাহর পথভ্রষ্ট বান্দা সঠিক পথে ফিরে আসার ফলে আল্লাহ তার চেয়ে অনেক বেশী খুশী হন। দ্বিতীয় দৃষ্টান্তটি এর চেয়ে আরো বেশী মর্মস্পর্শী। হযরত উমর (রা) বলেন, একবার নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে কিছু যুদ্ধবন্দী এলো। এদের মধ্যে একজন মহিলাও ছিল। তার দুগ্ধপোষ্য শিশুটি হারিয়ে গিয়েছিল। মাতৃস্নেহে সে এতই অস্থির হয়ে পড়েছিল যে, কোন বাচ্চা সামনে দেখলেই তাকে তুলে নিয়ে বুকে চেপে ধরতো এবং নিজের বুকের দুধ তাকে পান করাতে থাকতো। তার এ অবস্থা দেখে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা কি মনে করো এ মা তার নিজের বাচ্চাকে নিজের হাতে আগুনে ছুঁড়ে ফেলতে পারে? আমরা জবাব দিলাম ঃ কখনোই নয়, তার নিজের ছুঁড়ে দেবার তো কোন প্রশ্নই ওঠে না, বাচ্চা নিজেই যদি আগুনে পড়ে যায় তাহলে সে তাকে বাঁচাবার জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালাবে। তিনি বলেন ঃ

الله ارحم بعباده من هذه بولدها

"এ মহিলা তার বাচ্চার প্রতি যে পরিমাণ অনুগ্রহশীল আল্লাহর অনুগ্রহ তাঁর বান্দার প্রতি তার চেয়ে অনেক বেশী।"

আর এমনি চিন্তা-ভাবনা করলে একথা সহজেই বুঝা যায়। আল্লাহই তো বাচ্চার লালন-পালনের জন্য মা-বাপের মনে স্নেহ-প্রীতি সৃষ্টি করে দিয়েছেন। নয়তো আল্লাহ যদি এ স্নেহ-প্রীতি সৃষ্টি না করে দিতেন তাহলে বাচ্চাদের মা-বাপের চেয়ে বড় শত্রু আর হতো না। কারণ তারা মা-বাপের জন্য হয় সবচেয়ে বেশী কষ্টদায়ক। এখন যে আল্লাহ মাতৃ-পিতৃস্নেহের স্রষ্টা তার নিজের মধ্যে নিজের সৃষ্টির জন্য কি পরিমাণ স্নেহ-প্রীতি-ভালোবাসা থাকবে—একথা প্রত্যেক ব্যক্তি নিজেই আন্দাজ করতে পারে।

قَالَ يَٰقَوْمِ أَرَهْطِىٓ أَعَزُّ عَلَيْكُم مِّنَ ٱللَّهِ وَٱتَّخَذْتُمُوهُ وَرَآءَكُمْ ظِهْرِيًّا ۖ إِنَّ رَبِّى بِمَا تَعْمَلُونَ مُحِيطٌ ﴿٩٢﴾ وَيَٰقَوْمِ ٱعْمَلُوا۟ عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنِّى عَٰمِلٌ ۖ سَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَمَنْ هُوَ كَٰذِبٌ ۖ وَٱرْتَقِبُوٓا۟ إِنِّى مَعَكُمْ رَقِيبٌ ﴿٩٣﴾ وَلَمَّا جَآءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا شُعَيْبًا وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ مَعَهُۥ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَأَخَذَتِ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا۟ ٱلصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا۟ فِى دِيَٰرِهِمْ جَٰثِمِينَ ﴿٩٤﴾ كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا۟ فِيهَآ ۗ أَلَا بُعْدًا لِّمَدْيَنَ كَمَا بَعِدَتْ ثَمُودُ ﴿٩٥﴾

শো'আয়েব বললো : "ভাইয়েরা! আমার ভ্রাতৃজোট কি তোমাদের ওপর আল্লাহর চাইতে প্রবল যে, তোমরা (ভ্রাতৃজোটের ভয় করলে এবং) আল্লাহকে একেবারে পেছনে ঠেলে দিলে? জেনে রাখো, যাকিছু তোমরা করছো তা আল্লাহর পাকড়াও–এর বাইরে নয়। হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা নিজেদের পথে কাজ করে যাও এবং আমি আমার পথে কাজ করে যেতে থাকবো। শিগগীরই তোমরা জানতে পারবে কার ওপর লাঞ্ছনার আযাব আসছে এবং কে মিথ্যুক? তোমরা প্রতীক্ষা করতে থাকো এবং আমিও তোমাদের সাথে প্রতীক্ষারত রইলাম।"

শেষ পর্যন্ত যখন আমার ফায়সালার সময় এসে গেলো তখন আমি নিজের রহমতের সাহায্যে শো'আয়েব ও তার সাথী মুমিনদেরকে উদ্ধার করলাম। আর যারা জুলুম করেছিল একটি প্রচণ্ড আওয়াজ তাদেরকে এমনভাবে পাকড়াও করলো যে, নিজেদের আবাসভূমিতেই তারা নির্জীব নিস্পন্দের মতো পড়ে রইলো, যেন তারা সেখানে কোনদিন বসবাসই করতো না।

শোন, মাদয়ানবাসীরাও দূরে নিক্ষিপ্ত হয়েছে যেমন সামূদ নিক্ষিপ্ত হয়েছিল।

১০২. হযরত শো'আয়েব কোন বিদেশী ভাষায় কথা বলছিলেন তাই তারা বুঝতে পারছিল না, এমন কোন ব্যাপার ছিল না। অথবা তাঁর কথা কঠিন, সূক্ষ্ম বা জটিলও ছিল না। কথা সবই সোজা ও পরিষ্কার ছিল। সেখানকার প্রচলিত ভাষায়ই কথা বলা হতো। কিন্তু তাদের মানসিক কাঠামো এত বেশী বেঁকে গিয়েছিল যে, হযরত শো'আয়েবের সোজা সরল কথাবার্তা তার মধ্যে কোনপ্রকারেই প্রবেশ করতে পারতো না। একথা স্বতসিদ্ধ যে,

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ ﴿٩٦﴾ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ
فَاتَّبَعُوا أَمْرَ فِرْعَوْنَ ۖ وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ ﴿٩٧﴾ يَقْدُمُ قَوْمَهُ يَوْمَ
الْقِيَامَةِ فَأَوْرَدَهُمُ النَّارَ ۖ وَبِئْسَ الْوِرْدُ الْمَوْرُودُ ﴿٩٨﴾ وَأُتْبِعُوا فِي
هَٰذِهِ لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ ۚ بِئْسَ الرِّفْدُ الْمَرْفُودُ ﴿٩٩﴾ ذَٰلِكَ مِنْ
أَنبَاءِ الْقُرَىٰ نَقُصُّهُ عَلَيْكَ ۖ مِنْهَا قَائِمٌ وَحَصِيدٌ ﴿١٠٠﴾

৯ রুকূ'

আর মূসাকে আমি নিজের নিদর্শনাবলী ও স্পষ্ট নিয়োগপত্রসহ ফেরাউন ও তার রাজ্যের প্রধান কর্মকর্তাদের কাছে পাঠালাম। কিন্তু তারা ফেরাউনের নির্দেশ মেনে চললো। অথচ ফেরাউনের নির্দেশ সত্যাশ্রয়ী ছিল না। কিয়ামতের দিন সে নিজের কওমের অগ্রবর্তী হবে এবং নিজের নেতৃত্বে তাদেরকে জাহান্নামের দিকে নিয়ে যাবে।[১০৪] *অবস্থানের জন্য কেমন নিকৃষ্ট স্থান সেটা! আর তাদের ওপর এ দুনিয়ায় লানত পড়েছে এবং কিয়ামতের দিনও পড়বে। কত নিকৃষ্ট প্রতিদান সেটা, যা কেউ লাভ করবে!*

এগুলো কতক জনপদের খবর, যা আমি তোমাকে শুনাচ্ছি। এদের কোনটা এখনো দাঁড়িয়ে আছে আবার কোনটার ফসল কাটা হয়ে গেছে।

যারা অন্ধপ্রীতি, বিদ্বেষ ও গোষ্ঠী স্বার্থ দোষে দুষ্ট হয় এবং প্রবৃত্তির লালসার পূজা করার ক্ষেত্রে একগুঁয়েমির নীতি অবলম্বন করে, আবার এ সংগে কোন বিশেষ চিন্তাধারার ওপর অনড় হয়ে বসে থাকে তারা তো প্রথমত এমন কোন কথা শুনতেই পারে না যা তাদের চিন্তাধারা থেকে ভিন্নতর আর যদি কখনো শুনেই নিয়ে থাকে তাহলে তারা বুঝতেই পারে না যে, এসব আবার কেমন ধারার কথা!

১০৩. একথা অবশ্যি সামনে থাকা দরকার যে, এ আয়াতগুলো যখন নাযিল হয় তখন হুবহু একই রকম অবস্থা মক্কাতেও বিরাজ করছিল। সে সময় কুরাইশরাও একইভাবে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের রক্ত পিপাসু হয়ে উঠেছিল। তারা তাঁর জীবননাশ করতে চাচ্ছিল। কিন্তু শুধু বনী হাশেম তাঁর পেছনে ছিল বলেই তাঁর গায়ে হাত দিতে ভয় পাচ্ছিল। কাজেই হযরত শো'আয়েব ও তার কওমের এ ঘটনাকে যথাযথভাবে কুরাইশ ও মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অবস্থার সাথে খাপ খাইয়ে দিয়ে বর্ণনা করা হচ্ছে এবং সামনের দিকে হযরত শো'আয়েবের যে চরম শিক্ষণীয়

وَمَا ظَلَمْنٰهُمْ وَلٰكِنْ ظَلَمُوْٓا اَنْفُسَهُمْ فَمَآ اَغْنَتْ عَنْهُمْ اٰلِهَتُهُمُ الَّتِىْ يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مِنْ شَىْءٍ لَّمَّا جَآءَ اَمْرُ رَبِّكَ ؕ وَمَا زَادُوْهُمْ غَيْرَ تَتْبِيْبٍ ﴿١٠١﴾

আমি তাদের প্রতি জুলুম করিনি, তারা নিজেরাই নিজেদের ওপর অত্যাচার করেছে। আর যখন আল্লাহর হুকুম এসে গেলো তখন আল্লাহকে বাদ দিয়ে তারা নিজেদের যেসব মাবুদকে ডাকতো তারা তাদের কোন কাজে লাগলো না এবং তারা ধ্বংস ছাড়া তাদের আর কোন উপকার করতে পারলো না।

জবাব উদ্ধৃত করা হয়েছে তার মধ্যে এ অর্থ লুকিয়ে রয়েছে যে, হে কুরাইশের লোকেরা! তোমাদের জন্যও মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পক্ষ থেকে এ একই জবাব দেয়া হলো।

১০৪. এ আয়াত ও কুরআনের অন্য কিছু বক্তব্য থেকে জানা যায়, যারা দুনিয়ায় কোন জাতির বা দলের নেতৃত্ব দেয় কিয়ামতের দিনও তারাই তাদের নেতা হবে। যদি তারা দুনিয়ায় নেকী, সততা ও সত্যের পথে নেতৃত্ব দিয়ে থাকে তাহলে এখানে যারা তাদের অনুসরণ করেছে তারা কিয়ামতের দিনও তাদেরই পতাকাতলে সমবেত হবে এবং তাদের নেতৃত্বে জান্নাতের দিকে এগিয়ে যাবে। আর যদি তারা দুনিয়ায় কোন ভ্রষ্টতা, নৈতিকতা বিরোধী কার্যকলাপ ও এমনং কোন পথের দিকে মানুষকে আহবান জানিয়ে থাকে যা সত্য দীনের পথ নয়, তাহলে যারা এখানে তাদের পথে চলেছে তারা সেখানেও তাদেরই পেছনে থাকবে এবং তাদের নেতৃত্বে জাহান্নামের দিকে এগিয়ে যাবে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিম্নোক্ত হাদীসটি এ একই বক্তব্যের প্রতিধ্বনি করছে ঃ

امرو القيس حامل لواء شعراء الجاهلية الى النار

"কিয়ামতের দিন কবি ইমরাউল কয়েসের হাতে থাকবে জাহেলী কাব্যচর্চার ঝাণ্ডা এবং আরবের জাহেলিয়াত পন্থী সমস্ত কবি তার নেতৃত্বে জাহান্নামের পথে এগিয়ে যাবে।"

এ দু'ধরনের শোভাযাত্রা কোন্ ধরনের জৌলুস ও জাঁক জমকের সাথে তাদের গন্তব্যের দিকে এগিয়ে যাবে তার চিত্র এখন প্রত্যেক ব্যক্তি নিজের চিন্তা ও কল্পনার পটে এঁকে নিতে পারে। যেসব নেতা দুনিয়ায় লোকদেরকে গোমরাহ করেছে এবং সত্য বিরোধী পথে চালিয়েছে তাদের অনুসারীরা যখন নিজেদের চোখে দেখে নেবে এ জালেমরা কী ভয়াবহ পরিণতির দিকে তাদেরকে টেনে এনেছে তখন তারা নিজেদের সমস্ত বিপদ–

وَكَذٰلِكَ اَخْذُ رَبِّكَ اِذَآ اَخَذَ الْقُرٰى وَهِىَ ظَالِمَةٌ ؕ اِنَّ اَخْذَهٗۤ اَلِيْمٌ شَدِيْدٌ ۝ اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لِّمَنْ خَافَ عَذَابَ الْاٰخِرَةِ ؕ ذٰلِكَ يَوْمٌ مَّجْمُوْعٌ ۙ لَّهُ النَّاسُ وَذٰلِكَ يَوْمٌ مَّشْهُوْدٌ ۝

আর তোমার রব যখন কোন অত্যাচারী জনপদকে পাকড়াও করেন তখন তার পাকড়াও এমনি ধরনেরই হয়। প্রকৃতপক্ষে তার পাকড়াও হয় বড়ই কঠিন ও যন্ত্রণাদায়ক। আসলে এর মধ্যে একটি নিশানী আছে এমন প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য যে আখেরাতের আযাবের ভয় করে।[১০৫] তা হবে এমন একটি দিন যেদিন সমস্ত লোক একত্র হবে এবং তারপর সেদিন যা কিছু হবে সবার চোখের সামনে হবে।

মুসীবতের জন্য তাদেরকে দায়ী মনে করবে এবং তাদের শোভাযাত্রা তাদেরকে নিয়ে এমন অবস্থায় জাহান্নামের দিকে রওয়ানা দেবে যে, আগে আগে তাদের নেতারা চলবে এবং তারা পেছনে পেছনে তাদেরকে গালি দিতে দিতে এবং তাদের প্রতি লানত বর্ষণ করতে করতে চলতে থাকবে। অন্যদিকে যাদের নেতৃত্ব মানুষকে নিয়ামতপূর্ণ জান্নাতের অধিকারী করবে তাদের অনুসারীরা নিজেদের শুভ পরিণাম দেখে তাদের নেতাদের জন্য দোয়া করতে থাকবে এবং তাদের ওপর প্রশংসা ও শুভেচ্ছার পুষ্প বর্ষণ করতে করতে এগিয়ে যাবে।

১০৫. অর্থাৎ ইতিহাসের এ ঘটনাবলীর মধ্যে এমন একটি নিশানী রয়েছে যে সম্পর্কে চিন্তা–ভাবনা করলে মানুষের মনে নিশ্চিত বিশ্বাস জন্মাবে যে, আখেরাতের আযাব অবশ্যি আসবে এবং এ সম্পর্কিত নবীদের দেয়া খবর সত্য। তাছাড়া এ নিশানী থেকে সেই আখেরাতের আযাব কেমন কঠিন ও ভয়াবহ হবে সেকথাও জানতে পারবে। ফলে এ জ্ঞান তার মনে ভীতির সঞ্চার করে তাকে সঠিক পথে এনে দাঁড় করিয়ে দেবে।

এখন প্রশ্ন থেকে যায়, ইতিহাসের সেই জিনিসটি কি, যাকে আখেরাত ও তার আযাবের আলামত বলা যেতে পারে? এর জবাবে বলা যায়, যে ব্যক্তি ইতিহাসকে শুধুমাত্র ঘটনার সমষ্টি মনে করে না বরং এ ঘটনার যুক্তি প্রমাণ নিয়েও মাথা ঘামায় এবং তা থেকে ফলাফল গ্রহণ করতেও অভ্যস্ত হয় সে সহজেই তা অনুধাবন করতে পারে। মানব জাতির হাজার হাজার বছরের ইতিহাসে যে ধারাবাহিকতা ও নিয়মতান্ত্রিকতার সাথে জাতি, সম্প্রদায় ও দলের উত্থান ও পতন ঘটতে থেকেছে এবং এ উত্থান ও পতনে যেমন সুস্পষ্টভাবে কিছু নৈতিক কার্যকারণ সক্রিয় থেকেছে আর পতনশীল জাতিগুলো যে ধরনের মারাত্মক ও শিক্ষণীয় অবস্থার মধ্য দিয়ে পতন ও ধ্বংসের দিকে এগিয়ে গেছে—এসব কিছুই এ অকাট্য সত্যের প্রতি সুস্পষ্ট ইংগিতবহ যে, মানুষ এ বিশ্ব–জাহানে এমন একটি রাষ্ট্রশক্তির অধীন যে নিছক অন্ধ প্রাকৃতিক আইনের ওপর রাজত্ব করছে না বরং তার নিজের এমন একটি ন্যায়সংগত নৈতিক বিধান আছে, যার পরিপ্রেক্ষিতে সে

وَمَا نُؤَخِّرُهٗۤ اِلَّا لِاَجَلٍ مَّعْدُوْدٍ ۝١٠٤ يَوْمَ يَاْتِ لَا تَكَلَّمُ نَفْسٌ اِلَّا بِاِذْنِهٖ ۚ فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَّسَعِيْدٌ ۝١٠٥

তাকে আনার ব্যাপারে আমি কিছু বেশী বিলম্ব করছি না, হাতে গোনা একটি সময়কাল মাত্র তার জন্য নির্দিষ্ট রয়েছে। সেদিন যখন আসবে তখন কারোর কথা বলার সামর্থ থাকবে না, তবে আল্লাহর অনুমতি সাপেক্ষে কেউ কথা বলতে পারবে।[১০৬] তারপর আবার সেদিন কিছু লোক হবে হতভাগ্য এবং কিছু লোক ভাগ্যবান।

নৈতিকতার একটি বিশেষ সীমানার ওপরে অবস্থানকারীদেরকে পুরস্কৃত করে, যারা এ সীমানার নীচে নেমে আসে তাদেরকে কিছুকালের জন্য ঢিল দিতে থাকে এবং যখন তারা এর অনেক নীচে নেমে যায় তখন তাদেরকে এমনভাবে ঠেলে ফেলে দেয় যে, তারা ভবিষ্যত বংশধরদের জন্য একটি শিক্ষণীয় ইতিহাস হয়ে যায়। একটি ধারাবাহিক বিন্যাস সহকারে সবসময় এ ঘটনাবলীর প্রকাশ হতে থাকার ফলে এ ব্যাপারে সামান্যতম সন্দেহেরও অবকাশ থাকে না যে, পুরস্কার ও শাস্তি এবং প্রতিদান ও প্রতিবিধান এ বিশ্ব–জাহানের রাষ্ট্র ব্যবস্থার একটি স্থায়ী আইন।

তারপর বিভিন্ন জাতির ওপর যেসব আযাব এসেছে সেগুলো গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করলে অনুমান করা যায় যে, আইনের দৃষ্টিতে পুরস্কার ও শাস্তির নৈতিক দাবী এ আযাবগুলোর মাধ্যমে কিছুটা অবশ্যি পূর্ণ হয়েছে কিন্তু এখনো এ দাবীর বিরাট অংশ অপূর্ণ রয়ে গেছে। কারণ দুনিয়ায় যে আযাব এসেছে তা কেবলমাত্র সমকালে দুনিয়ার বুকে যে প্রজন্ম বর্তমান ছিল তাদেরকেই পাকড়াও করেছে। কিন্তু যে প্রজন্ম অসৎকাজের বীজ বপন করে জুলুম–নির্যাতন ও অসৎকাজের ফসল তৈরী করে তা কাটার আগেই দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছিল এবং যাদের কৃতকর্মের ফল ভোগ করতে হলো পরবর্তী প্রজন্মকে, তারা যেন প্রতিদান ও প্রতিশোধের আইনের কার্যকারিতা থেকে পরিষ্কার গা বাঁচিয়ে চলে গেছে। এখন যদি আমরা ইতিহাস অধ্যয়নের মাধ্যমে বিশ্ব–জাহানের রাষ্ট্র ব্যবস্থার মেজাজ সঠিকভাবে বুঝতে পেরে থাকি। তাহলে আমাদের এ অধ্যয়নই একথার সাক্ষ দেবার জন্য যথেষ্ট যে, ইনসাফ ও বুদ্ধিবৃত্তির দৃষ্টিতে প্রতিদান ও প্রতিশোধের আইনের যে নৈতিক চাহিদাগুলো এখনো অপূর্ণ রয়ে গেছে সেগুলো পূর্ণ করার জন্য এ ভারসাম্যপূর্ণ ন্যায়নিষ্ঠ রাষ্ট্র ব্যবস্থা নিশ্চয়ই আবার একটি দ্বিতীয় বিশ্বের জন্ম দেবে এবং সেখানে দুনিয়ার সমস্ত জালেমকে তাদের কৃতকর্মের পুরোপুরি বদলা দেয়া হবে। সেই বদলা দুনিয়ার এ আযাবগুলো থেকে হবে অনেক বেশী কঠিন ও কঠোর। (দেখুন সূরা আ'রাফ ৩০ এবং সূরা ইউনূস ১০ টীকা।)

১০৬. অর্থাৎ এ নির্বোধরা নিজেদের মনে এ ধারণা নিয়ে বসে আছে যে, অমুক হুযুর আমাদের পক্ষে সুপারিশ করে আমাদের বাঁচিয়ে দেবেন, অমুক বুযর্গ জিদ ধরে বসে যাবেন এবং নিজের সাথে সম্পর্কিত প্রত্যেক ব্যক্তির গুনাহ মাফ করিয়ে না নিয়ে নিজের জায়গা থেকে উঠবেন না। অমুক হুযুর, যিনি আল্লাহর প্রিয়পাত্র, জান্নাতের পথে গোঁ ধরে বসে

فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ ﴿١٠٦﴾
خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ ۚ
إِنَّ رَبَّكَ فَعَّالٌ لِمَا يُرِيدُ ﴿١٠٧﴾ وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ
خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ ۖ
عَطَاءً غَيْرَ مَجْذُوذٍ ﴿١٠٨﴾ فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِمَّا يَعْبُدُ هَٰؤُلَاءِ ۚ
مَا يَعْبُدُونَ إِلَّا كَمَا يَعْبُدُ آبَاؤُهُمْ مِنْ قَبْلُ ۚ وَإِنَّا لَمُوَفُّوهُمْ
نَصِيبَهُمْ غَيْرَ مَنْقُوصٍ ﴿١٠٩﴾

হতভাগ্যরা জাহান্নামে যাবে (যেখানে অত্যধিক গরমে ও পিপাসায়) তারা হাঁপাতে ও আর্তচীৎকার করতে থাকবে। আর এ অবস্থায় তারা চিরকাল থাকবে যতদিন আকাশ ও পৃথিবী প্রতিষ্ঠিত থাকবে,[১০৭] তবে যদি তোমার রব অন্য কিছু করতে চান। অবশ্যি তোমার রব যা চান তা করার পূর্ণ ইখতিয়ার রাখেন।[১০৮] আর যারা ভাগ্যবান হবে, তারা জান্নাতে যাবে এবং সেখানে চিরকাল থাকবে, যতদিন পৃথিবী ও আকাশ প্রতিষ্ঠিত থাকবে, তবে যদি তোমার রব অন্য কিছু করতে চান।[১০৯] এমন পুরস্কার তারা পাবে যার ধারাবাহিকতা কখনো ছিন্ন হবে না।

কাজেই হে নবী! এরা যেসব মাবুদের ইবাদাত করছে তাদের ব্যাপারে তুমি কোন প্রকার সন্দেহের মধ্যে থেকো না। এরা তো (নিছক গড্ডালিকা প্রবাহে ভেসে চলেছে।) ঠিক তেমনিভাবে পূজা–অর্চনা করে যাচ্ছে যেমন পূর্বে এদের বাপ–দাদারা করতো।[১১০] আর আমি কিছু কাটছাঁট না করেই তাদের অংশ তাদেরকে পুরোপুরি দিয়ে দেবো।

পড়বেন এবং নিজের অনুসারীদের বখশিশের পরোয়ানা আদায় করিয়ে নিয়েই ছাড়বেন। অথচ জিদ করা ও গোঁ ধরাতো দূরের কথা সেদিনের সেই আড়ম্বরপূর্ণ মহিমান্বিত আদালতে অতি বড় কোন গৌরবান্বিত ব্যক্তি এবং মর্যাদাসম্পন্ন ফেরেশতাও টুঁ শব্দটি করতে পারবে না। আর যদি কেউ সেখানে কিছু বলতে পারে তাহলে একমাত্র বিশ্ব জাহানের সর্বময় ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের মহান অধিকারীর নিজের প্রদত্ত অনুমতি সাপেক্ষেই বলতে পারবে। কাজেই যারা একথা বুঝেই গায়রুল্লাহর বেদীমূলে নযরানা ও ভেট চড়ায় যে, এরা আল্লাহর দরবারে বড়ই প্রভাবশালী এবং তাদের সুপারিশের ভরসায় নিজেদের আমলনামা কালো করে যেতে থাকে, তাদের সেখানে চরম হতাশার সম্মুখীন হতে হবে।

وَلَقَدْ اٰتَيْنَا مُوْسَى الْكِتٰبَ فَاخْتُلِفَ فِيْهِ ۭ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَّبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ ۭ وَاِنَّهُمْ لَفِيْ شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيْبٍ ﴿١١٠﴾

১০ রুকূ'

আমি এর আগে মূসাকেও কিতাব দিয়েছি এবং সে সম্পর্কে মতভেদ করা হয়েছিল (যেমন আজ তোমাদের এই যে কিতাব দেয়া হয়েছে এ সম্পর্কে করা হচ্ছে[১১১])। যদি তোমার রবের পক্ষ থেকে একটি কথা প্রথমেই স্থির করে না দেয়া হতো তাহলে এ মতভেদকারীদের মধ্যে কবেই ফায়সালা করে দেয়া হয়ে যেতো।[১১২] একথা সত্যি যে, এরা তার ব্যাপারে সন্দেহ ও পেরেশানীর মধ্যে পড়ে রয়েছে।

১০৭. এ শব্দগুলোর অর্থ পরকালীন জগতের আকাশ ও পৃথিবী হতে পারে। অথবা এমনও হতে পারে যে, নিছক সাধারণ বাকধারা হিসেবে একে চিরকালীন স্থায়িত্ব অর্থে বর্ণনা করা হয়েছে। মোটকথা এর অর্থ বর্তমান পৃথিবী ও আকাশ তো কোনক্রমেই হতে পারে না। কারণ কুরআনের বর্ণনা অনুযায়ী কিয়ামতের দিন এগুলো বদলে দেয়া হবে এবং এখানে যেসব ঘটনার কথা বলা হচ্ছে সেগুলো কিয়ামতের পরে ঘটবে।

১০৮. অর্থাৎ তাদেরকে এ চিরন্তন আযাব থেকে বাঁচাবার মতো আর কোন শক্তিই তো নেই। তবে আল্লাহ নিজেই যদি কারোর পরিণতি বদলাতে চান অথবা কাউকে চিরন্তন আযাব দেবার পরিবর্তে একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত আযাব দিয়ে মাফ করে দেবার ফায়সালা করে নেন তাহলে এমনটি করার পূর্ণ ইখতিয়ার তাঁর আছে। কারণ তিনি নিজেই নিজের আইন রচয়িতা। তাঁর ইখতিয়ার ও ক্ষমতাকে সীমিত করে দেবার মতো কোন উচ্চতর আইন নেই।

১০৯. অর্থাৎ তাদের জান্নাতে অবস্থান করাও এমন কোন উচ্চতর আইনের ভিত্তিতে হবে না, যা আল্লাহকে এমনটি করতে বাধ্য করে রেখেছে। বরং আল্লাহ যে তাদেরকে সেখানে রাখবেন এটা হবে সরাসরি তাঁর অনুগ্রহ। যদি তিনি তাদের ভাগ্য বদলাতে চান, তা করার পূর্ণ ক্ষমতা তাঁর আছে।

১১০. এর অর্থ এ নয় যে, এ মাবুদদের ব্যাপারে সত্যিই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মনে কোন প্রকার সন্দেহ ছিল। বরং আসলে একথাগুলো নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সম্বোধন করে সাধারণ মানুষকে শুনানো হচ্ছে। এর অর্থ হচ্ছে, এরা যে এসব মাবুদের পূজা করছে এবং এদের কাছে প্রার্থনা করছে ও ভিক্ষা মাগছে, নিশ্চয়ই এরা কিছু দেখে থাকবে যে কারণে এরা এদের থেকে উপকৃত হবার আকাংখা পোষণ করে—কোন বিবেক বুদ্ধি সম্পন্ন ব্যক্তির মনে এ ধরনের কোন সংশয় থাকা উচিত নয়। সত্যি কথা হচ্ছে এই যে, এ পূজা-অর্চনা, নযরানা ও প্রার্থনা আসলে কোন অভিজ্ঞতা ও সত্যিকার পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে নয় বরং এসব কিছু করা হচ্ছে নিছক অন্ধ অনুসৃতির

وَاِنَّ كُلًّا لَّمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ اَعْمَالَهُمْ ۗ اِنَّهٗ بِمَا يَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ ﴿١١١﴾ فَاسْتَقِمْ كَمَآ اُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْا ۗ اِنَّهٗ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ﴿١١٢﴾ وَلَا تَرْكَنُوْٓا اِلَى الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ ۙ وَمَا لَكُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ مِنْ اَوْلِيَآءَ ثُمَّ لَا تُنْصَرُوْنَ ﴿١١٣﴾

আর একথাও সত্যি যে, তোমার রব তাদেরকে তাদের কৃতকর্মের পুরোপুরি বদলা দিয়েই তবে ক্ষান্ত হবেন। অবশ্যি তিনি তাদের সবার কার্যকলাপের খবর রাখেন। কাজেই হে মুহাম্মাদ! তুমিও তোমার সাথীরা যারা (কুফরী ও বিদ্রোহ থেকে ঈমান ও আনুগত্যের দিকে) ফিরে এসেছে সত্য সঠিক পথে অবিচল থাকো যেমন তোমাকে হুকুম দেয়া হয়েছে এবং বন্দেগীর সীমানা অতিক্রম করো না। তোমরা যা কিছু করছো তার ওপর তোমাদের রব দৃষ্টি রাখেন। এ জালেমদের দিকে মোটেই ঝুঁকবে না, অন্যথায় জাহান্নামের গ্রাসে পরিণত হবে এবং তোমরা এমন কোন পৃষ্ঠপোষক পাবে না যে আল্লাহর হাত থেকে তোমাদের রক্ষা করতে পারে আর কোথাও থেকে তোমাদের কাছে কোন সাহায্য পৌঁছুবে না।

ভিত্তিতে। এসব বেদী ও আস্তানা পূর্ববর্তী জাতিদেরও ছিল এবং তাদের এ ধরনের কেরামতি ও অলৌকিক কার্যকলাপ তাদের মধ্যেও লোকমুখে খুব বেশী শোনা যেতো। কিন্তু যখন আল্লাহর আযাব এলো তখন তারা ধ্বংস হয়ে গেলো এবং বেদী ও আস্তানাগুলো কোন কাজে লাগলো না।

১১১. অর্থাৎ এ কুরআন সম্পর্কে আজ বিভিন্ন লোক বিভিন্ন কথা বলছে, নানা রকম সন্দেহ–সংশয় পোষণ করছে, এটা কোন নতুন কথা নয়। বরং এর আগে মূসাকে যখন কিতাব দেয়া হয়েছিল তখন তার ব্যাপারেও এ ধরনের বিভিন্ন মতামত প্রকাশ করা হয়েছিল। কাজেই হে মুহাম্মাদ! এমন সোজা, সরল ও পরিষ্কার কথা কুরআনে বলা হচ্ছে এবং তারপরও লোকেরা তা গ্রহণ করছে না—এ অবস্থা দেখে তোমার মন খারাপ করা ও হতাশ হওয়া উচিত নয়।

১১২. এ বাক্যটিতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও ঈমানদারদেরকে নিশ্চিন্ত ও তাদের মনে স্থৈর্য সৃষ্টি করার জন্য বলা হয়েছে। এর অর্থ হচ্ছে, যারা এ কুরআনের ব্যাপারে মতবিরোধ সৃষ্টি করছে তাদের ফায়সালা শিগৃগির চুকিয়ে দেবার ব্যাপারটি নিয়ে তোমরা অস্থির হয়ো না। আল্লাহ প্রথমেই স্থির করে নিয়েছেন যে, ফায়সালা নির্দিষ্ট সময়ের আগে করা হবে না এবং দুনিয়ার লোকেরা ফায়সালা চাওয়ার ব্যাপারে যে তাড়াহুড়ো করে থাকে আল্লাহ ফায়সালা করে দেয়ার ব্যাপারে সে ধরনের তাড়াহুড়ো করবেন না।

وَأَقِمِ الصَّلٰوةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ الَّيْلِ ۚ إِنَّ الْحَسَنٰتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّاٰتِ ۚ ذٰلِكَ ذِكْرٰى لِلذّٰكِرِيْنَ ﴿١١٤﴾ وَاصْبِرْ فَإِنَّ اللّٰهَ لَا يُضِيْعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِيْنَ ﴿١١٥﴾ فَلَوْلَا كَانَ مِنَ الْقُرُوْنِ مِنْ قَبْلِكُمْ أُولُوْا بَقِيَّةٍ يَّنْهَوْنَ عَنِ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ إِلَّا قَلِيْلًا مِّمَّنْ أَنْجَيْنَا مِنْهُمْ ۚ وَاتَّبَعَ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا مَا أُتْرِفُوْا فِيْهِ وَكَانُوْا مُجْرِمِيْنَ ﴿١١٦﴾ وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرٰى بِظُلْمٍ وَّأَهْلُهَا مُصْلِحُوْنَ ﴿١١٧﴾

আর দেখো, নামায কায়েম করো দিনের দু' প্রান্তে এবং রাতের কিছু অংশ অতিবাহিত হবার পর।[১১৩] আসলে সৎকাজ অসৎকাজকে দূর করে দেয়। এটি একটি স্মারক তাদের জন্য যারা আল্লাহকে স্মরণ রাখে।[১১৪] আর সবর করো কারণ আল্লাহ সৎকর্মকারীদের কর্মফল কখনো নষ্ট করেন না।

তাহলে তোমাদের পূর্বে যেসব জাতি অতিক্রান্ত হয়েছে তাদের মধ্যে এমন সব লোক থাকলো না কেন যারা লোকদেরকে পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টিতে বাধা দিতো? এমন লোক থাকলেও অতি সামান্য সংখ্যক ছিল। তাদেরকে আমি ঐ জাতিদের থেকে বাঁচিয়ে নিয়েছি। নয়তো জালেমরা তো এমনি সব সুখৈশ্বর্যের পেছনে দৌড়াতে থেকেছে, যার সরঞ্জাম তাদেরকে প্রচুর পরিমাণে দেয়া হয়েছিল এবং তারা অপরাধী হয়েই গিয়েছিল। তোমার রব এমন নন যে, তিনি জনবসতিসমূহ অন্যায়ভাবে ধ্বংস করবেন, অথচ তার অধিবাসীরা সংশোধনকারী।[১১৫]

১১৩. দিনের দু' প্রান্ত বলতে ফজর ও মাগরিব এবং কিছু রাত অতিবাহিত হবার পর বলতে এশার সময় বুঝানো হয়েছে। এ থেকে বুঝা যায়, এ বক্তব্য এমন এক সময়ের যখন পাঁচ ওয়াক্তের নামায নির্ধারিত হয়নি। মি'রাজের ঘটনা এরপর সংঘটিত হয় এবং তাতে পাঁচ ওয়াক্ত নামায ফরয হওয়ার বিধান দেয়া হয়। (অধিক ব্যাখ্যার জন্য দেখুন বনী ইসরাঈল ৯৫, ত্বা-হা ১১১, রূম ১২৪ টীকা)

১১৪. অর্থাৎ যেসব অসৎকাজ দুনিয়ায় ছড়িয়ে আছে এবং সত্যের এ দাওয়াতের প্রতি শত্রুতার ব্যাপারে তোমাদের সাথে যেসব অসৎকাজ করা হচ্ছে এসবগুলো দূর করার আসল পদ্ধতি হচ্ছে এই যে, তোমরা নিজেরা অনেক বেশী সৎ হয়ে যাও এবং নিজেদের সৎকাজের সাহায্যে এ অসৎকাজকে পরাস্ত করো। আর তোমাদের সৎ বানাবার সর্বোত্তম

মাধ্যম হচ্ছে এ নামায। নামায আল্লাহর স্মরণকে তরতাজা করতে থাকবে এবং তার শক্তির জোরে তোমরা অসৎকাজের এ সংঘবদ্ধ তুফানী শক্তির কেবল মোকাবিলাই করতে পারবে তাই নয় বরং দুনিয়ায় কার্যত সৎকাজ ও কল্যাণের ব্যবস্থাও কায়েম করতে পারবে। (অধিক ব্যাখ্যার জন্য দেখুন আনকাবুত ৭৭–৭৯ টীকা)

১১৫. আগের ছ'টি রুকূ'তে যেসব জাতির ইতিহাস বর্ণনা করা হয়েছে এ আয়াতগুলোতে অত্যন্ত শিক্ষণীয় পদ্ধতিতে তাদের ধ্বংসের মূল কারণের ওপর আলোকপাত করা হয়েছে। এ ইতিহাসের ওপর মন্তব্য করে বলা হচ্ছে, শুধুমাত্র এ জাতিগুলোকেই নয় বরং মানব জাতির অতীত ইতিহাসে যতগুলো জাতিই ধ্বংস হয়েছে তাদের সবাইকে যে জিনিসটি অধপতিত করেছে তা হচ্ছে এই যে, যখন আল্লাহ নিজের নিয়ামতের দ্বারা তাদেরকে সমৃদ্ধ করেছেন তখন নিজেদের প্রাচুর্য ও সমৃদ্ধির নেশায় মত্ত হয়ে তারা পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টিতে তৎপর হয়েছে এবং তাদের সামষ্টিক প্রকৃতি এমন পর্যায়ে বিকৃত হয়ে গিয়েছিল যে, তাদেরকে অসৎকাজ থেকে বিরত রাখার মতো সৎ লোক তাদের মধ্যে ছিলই না অথবা যদি এমনি ধরনের কিছু লোক থেকেও থাকে তাহলে তাদের সংখ্যা এত কম ছিল এবং তাদের আওয়াজ এতই দুর্বল ছিল যে, অসৎকাজ থেকে তারা বিরত রাখার চেষ্টা করলেও বিপর্যয় ঠেকাতে পারেনি। এ কারণেই শেষ পর্যন্ত এ জাতিগুলো আল্লাহর গযবের শিকার হয়েছে। নয়তো নিজের বান্দাদের সাথে আল্লাহর কোন শত্রুতা নেই। তারা ভালো কাজ করে যেতে থাকলেও আল্লাহ অযথা তাদেরকে শাস্তি দেন না। আল্লাহর এ বক্তব্যের মূল উদ্দেশ্য এখানে তিনটি কথা মনের মধ্যে গেঁথে দেয়া।

এক ঃ প্রত্যেক সমাজ ব্যবস্থায় ভালো কাজের দিকে আহবানকারী ও মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখার মতো সৎলোকের উপস্থিতি অপরিহার্য। কারণ সৎবৃত্তিই আল্লাহর কাছে কাংখিত। আর মানুষের অসৎকাজ যদি আল্লাহ বরদাশত করে থাকেন তাহলে তা শুধুমাত্র তাদের মধ্যকার এ সৎবৃত্তির কারণেই করে থাকেন এবং ততক্ষণ পর্যন্ত করে থাকেন যতক্ষণ তাদের মধ্যে সৎ প্রবণতার কিঁছুটা সম্ভাবনা থাকে। কিন্তু কোন মানব গোষ্ঠী যখন একেবারেই সৎলোক শূন্য হয়ে পড়ে এবং তাদের মধ্যে শুধু অসৎলোকই বর্তমান থাকে অথবা সৎলোক বর্তমান থাকলেও তাদের কথা কেউ শোনে না এবং সমগ্র জাতিই একসাথে নৈতিক বিপর্যয়ের দিকে এগিয়ে যেতে থাকে তখন আল্লাহর আযাব তাদের মাথার ওপর এমনভাবে ঘুরতে থাকে যেমন পূর্ণ গর্ভবতী নারী, যার গর্ভকাল একেবারে টায় টায় পূর্ণ হয়ে গেছে, কেউ বলতে পারে না কোন্ মুহূর্তে সে সন্তান প্রসব করে বসবে।

দুই ঃ যে জাতি নিজের মধ্যে সবকিছু বরদাশ্‌ত করতে পারে কিন্তু শুধুমাত্র এমন গুটিকয় হাতে গোনা লোককে বরদাশত করতে পারে না যারা তাকে অসৎকাজ থেকে বিরত রাখার ও সৎকাজ করার দাওয়াত দেয়, সে জাতির ব্যাপারে একথা জেনে নাও যে, তার দুর্দিন কাছে এসে গেছে। কারণ এখন সে নিজেই নিজের প্রাণের শত্রু হয়ে গেছে। যেসব জিনিস তার ধ্বংসের কারণ সেগুলো তার অতি প্রিয় এবং শুধুমাত্র একটি জিনিসই সে একদম বরদাশত করতে প্রস্তুত নয় যা তার জীবনের ধারক ও বাহক।

وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ ﴿١١٨﴾ إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ ۚ وَلِذَٰلِكَ خَلَقَهُمْ ۗ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ﴿١١٩﴾

অবশ্যি তোমার রব চাইলে সমগ্র মানব জাতিকে একই গোষ্ঠীভুক্ত করতে পারতেন, কিন্তু এখন তারা বিভিন্ন পথেই চলতে থাকবে এবং বিপথে যাওয়া থেকে একমাত্র তারাই বাঁচবে যাদের ওপর তোমার রব অনুগ্রহ করেন। এ (নির্বাচন ও ইখতিয়ারের স্বাধীনতার) জন্যই তো তিনি তাদের পয়দা করেছিলেন।[১১৬] *আর তোমার রবের একথা পূর্ণ হয়ে গেছে যা তিনি বলেছিলেন—"আমি জাহান্নামকে জিন ও মানুষ উভয়কে দিয়ে ভরে দেবো।"*

তিন ঃ একটি জাতির মধ্যে সৎকাজ করার আহবানে সাড়া দেবার মতো লোক কি পরিমাণ আছে তার ওপর নির্ভর করে তার আযাবে লিপ্ত হওয়ার ও না হওয়ার ব্যাপারটির শেষ ফায়সালা। যদি তার মধ্যে বিপর্যয় খতম করে কল্যাণ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করার লোকের সংখ্যা এমন পর্যায়ে থাকে যা এ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য যথেষ্ট হয়ে থাকে তাহলে তার ওপর সাধারণ আযাব পাঠানো হয় না। বরং ঐ সৎলোকদেরকেই অবস্থার সংশোধনের সুযোগ দেয়া হয়। কিন্তু লাগাতার প্রচেষ্টা ও সাধনা করার পরও যদি তার মধ্যে সংস্কার সাধনের জন্য যথেষ্ট পরিমাণ লোক না পাওয়া যায় এবং এ জাতি তার অংগন থেকে কয়েকটা হীরে বাইরে ছুঁড়ে ফেলার পর নিজের কার্যধারা থেকে একথা প্রমাণ করে দেয় যে, এখন তার কাছে শুধু কয়লা ছাড়া আর কিছুই নেই, তাহলে এরপর আর বেশী সময় হাতে থাকে না। এরপর শুধুমাত্র কুণ্ডে আগুন জ্বালিয়ে দেয়া হয়, যা কয়লাগুলোকে পুড়িয়ে ছাই করে দেয়। (অধিক ব্যাখ্যার জন্য দেখুন যারিয়াত ৩৪ টীকা)

১১৬. সাধারণত এ ধরনের অবস্থায় তকদীরের নামে যে সন্দেহের অবতারণা করা হয়ে থাকে এটি তার জবাব। ওপরে অতীতের জাতিদের ধ্বংসের যে কারণ বর্ণনা করা হয়েছে তার বিরুদ্ধে আপত্তি উত্থাপন করা যেতে পারতো যে, তাদের মধ্যে সৎলোক না থাকা বা অতি অল্প সংখ্যক থাকাও আল্লাহর ইচ্ছার মধ্যে শামিল ছিল, এ অবস্থায় সংশ্লিষ্ট জাতিদেরকে এ জন্য দায়ী করা হচ্ছে কেন? তাদের মধ্যে আল্লাহ বিপুল সংখ্যক সৎলোক সৃষ্টি করে দিলেন না কেন? এর জবাবে মানুষের ব্যাপারে আল্লাহর ইচ্ছা সম্পর্কিত বাস্তব সত্যটি পরিষ্কারভাবে বর্ণনা করে দেয়া হয়েছে। পশু, উদ্ভিদ ও অন্যান্য সৃষ্টির মতো মানুষকেও প্রকৃতিগতভাবে একটি নির্দিষ্ট ও গতানুগতিক পথে পাড়ি জমাতে বাধ্য করা হবে এবং এ পথ থেকে সরে গিয়ে অন্য কোন পথে সে চলতে পারবে না, মানুষের ব্যাপারে আল্লাহ এটা কখনোই চান না। যদি এটাই তাঁর ইচ্ছা হতো তাহলে ঈমানের দাওয়াত, নবী প্রেরণ ও কিতাব নাযিলের কি প্রয়োজন ছিল? সমস্ত মানুষ মুমিন ও

وَكُلًّا نَّقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ ۚ وَجَاءَكَ فِي هَٰذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿١٢٠﴾ وَقُلْ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ اعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنَّا عَامِلُونَ ﴿١٢١﴾ وَانْتَظِرُوا إِنَّا مُنْتَظِرُونَ ﴿١٢٢﴾ وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ ۚ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿١٢٣﴾

আর হে মুহাম্মাদ! এ রসূলদের বৃত্তান্ত, যা আমি তোমাকে শোনাচ্ছি, এসব এমন জিনিস যার মাধ্যমে আমি তোমার হৃদয়কে মজবুত করি। এসবের মধ্যে তুমি পেয়েছো সত্যের জ্ঞান এবং মুমিনরা পেয়েছে উপদেশ ও জাগরণবাণী। তবে যারা ঈমান আনে না তাদেরকে বলে দাও তোমরা তোমাদের পদ্ধতিতে কাজ করতে থাকো এবং আমরা আমাদের পদ্ধতিতে কাজ করে যাই। কাজের পরিণামের জন্য তোমরা অপেক্ষা করো এবং আমরাও অপেক্ষায় আছি। আকাশে ও পৃথিবীতে যাকিছু লুকিয়ে আছে সবই আল্লাহর কুদরাতের নিয়ন্ত্রণাধীন এবং সমস্ত বিষয়ে তাঁরই দিকে রুজু করা হয়। কাজেই হে নবী! তুমি তাঁর বন্দেগী করো এবং তাঁরই ওপর ভরসা রাখো। যাকিছু তোমরা করছো তা থেকে তোমার রব গাফেল নন।[১১৭]

মুসলমান হিসেবে পয়দা হতো এবং কুফরী ও গুণাহগারীর কোন সম্ভাবনাই থাকতো না। কিন্তু মানুষের ব্যাপারে আল্লাহ তাঁর যে ইচ্ছা ব্যক্ত করেছেন তা আসলে হচ্ছে এই যে, তাকে নির্বাচন ও গ্রহণ করার স্বাধীনতা দেয়া হবে। তাকে নিজের পছন্দ মাফিক বিভিন্ন পথে চলার ক্ষমতা দেয়া হবে। তার সামনে জান্নাত ও জাহান্নাম উভয়ের পথ খুলে দেয়া হবে। তারপর প্রত্যেকটি মানুষকে ও মানুষের প্রত্যেকটি দলকে এর মধ্য থেকে যে কোন একটি পথ নিজের জন্য পছন্দ করে নিয়ে তার ওপর চলার সুযোগ দেয়া হবে। এর ফলে প্রত্যেকে নিজের প্রচেষ্টা ও উপার্জনের ফল হিসেবেই সবকিছু লাভ করবে। কাজেই যে পরিকল্পনার ভিত্তিতে মানুষকে পয়দা করা হয়েছে তা যখন নির্বাচনের স্বাধীনতা এবং কুফরী ও ঈমানের নীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত তখন যে জাতি নিজে অসৎ পথে এগিয়ে যেতে চায়, আল্লাহ তাকে জোর করে সৎ পথে নিয়ে যাবেন এটা কেমন করে হতে পারে? কোন জাতি যখন নিজের নির্বাচনের ভিত্তিতে মানুষ তৈরীর এমন এক কারখানা বানিয়েছে যার ছাঁচ থেকে সবচেয়ে বড় অসৎ, ব্যভিচারী, জালেম ও ফাসেক লোক তৈরী হয়ে বেরিয়ে আসবে, তখন আল্লাহ কেন সরাসরি হস্তক্ষেপ করে সেখানে এমন সব জন্মগত সৎলোক

সরবরাহ করবেন যারা তার বিকৃত ছাঁচগুলোকে ঠিক করে দেবে? এ ধরনের হস্তক্ষেপ আল্লাহর রীতি বিরোধী। সৎ ও অসৎ উভয় ধরনের লোক প্রত্যেক জাতি নিজেই সরবরাহ করবে। যে জাতি সমষ্টিগতভাবে অসৎ পথ পছন্দ করবে, যার মধ্য থেকে সততার ঝাণ্ডা বুলন্দ করার জন্য যথেষ্ট পরিমাণ লোক এগিয়ে আসবে না এবং যে তার সমাজ ব্যবস্থায় সংস্কার প্রচেষ্টার বিকশিত হওয়া ও সমৃদ্ধি লাভ করার কোন অবকাশই রাখবে না, আল্লাহ তাকে জোর করে সৎ বানাতে যাবেন কেন? তিনি তো তাকে সেই পরিণতির দিকে এগিয়ে দেবেন যা সে নিজের জন্য নির্বাচন করে নিয়েছে। তবে আল্লাহর রহমতের অধিকারী যদি কোন জাতি হতে পারে তাহলে সে হবে একমাত্র সেই জাতি যার মধ্যে এমন বহু লোকের জন্ম হবে যারা নিজেরা সৎকর্মশীলতা, কল্যাণ ও ন্যায়ের দাওয়াতে সাড়া দেবে এবং এ সংগে নিজেদের সমাজ ব্যবস্থার মধ্যে সংস্কার সাধনকারীদের কাজ করতে পারার মতো পরিবেশ ও যোগ্যতা টিকিয়ে রাখবে। (আরো বেশী ব্যাখ্যার জন্য দেখুন আনআম ২৪ টীকা)

১১৭. অর্থাৎ কুফর ও ইসলামের এ সংঘাতের সাথে জড়িত উভয় পক্ষ যা কিছু করছে আল্লাহ তা দেখছেন। আল্লাহর রাজত্বে কোন অন্যায় ও দুঃশাসনের স্থান নেই। রাজ্যে যাচ্ছেতাই হতে থাকবে কিন্তু শাসক রাজার তার কোন খবরই থাকবে না এবং তিনি এসবের সাথে কোন সম্পর্কই রাখবেন না, এ ধরনের কোন পরিস্থিতি এখানে নেই। এখানে বিজ্ঞতা, কৌশল ও সহিষ্ণুতার ভিত্তিতে বিলম্ব অবশ্যি হয় কিন্তু অরাজকতা ও অন্যায়ের কোন স্থান নেই। যারা সংশোধনের প্রচেষ্টা চালাচ্ছেন তারা বিশ্বাস করুন তাদের পরিশ্রম মাঠে মারা যাবে না। আর যারা বিপর্যয় সৃষ্টি ও তা সম্প্রসারণে লিপ্ত আছে, যারা সংশোধন প্রচেষ্টাকারীদের ওপর জুলুম ও নির্যাতন চালাচ্ছে এবং সংশোধনের এ কাজকে যেনতেন প্রকারে অগ্রসর হতে না দেয়ার জন্য নিজেদের সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে তাদেরও জেনে রাখা উচিত যে, তাদের এসব কার্যকলাপ আল্লাহর জানা আছে এবং এর পরিণাম তাদের অবশ্যি ভোগ রকতে হবে।

ইউসুফ

১২

নাযিল হওয়ার সময়-কাল ও এর কারণসমূহ

এ সূরার বিষয়বস্তু থেকে একথা বুঝা যাচ্ছে যে, এটিও নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মক্কায় অবস্থানের শেষ যুগে নাযিল হয়ে থাকবে। তখন কুরাইশের লোকেরা নবীকে (সা) হত্যা বা দেশান্তর করবে, না বন্দী করবে, এ নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছিল। এ সময় মক্কার কাফের সমাজের কোন কোন লোক (সম্ভবত ইহুদীদের ইংগিতে) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে পরীক্ষা করার জন্য তাঁকে প্রশ্ন করে, বনী ইসরাঈলরা কি কারণে মিসরে চলে গিয়েছিল? যেহেতু আরববাসীরা এ ঘটনা সম্পর্কে কিছুই জানতো না, তাদের কথা–কাহিনী ও পৌরানিক বৃত্তান্তসমূহে কোথাও এর কোন উল্লেখই পাওয়া যেতো না এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিজের মুখেও ইতিপূর্বে এ সম্পর্কিত কোন কথা শোনা যায়নি, তাই তারা আশা করছিল, তিনি এর কোন বিস্তারিত জবাব দিতে পারবেন না অথবা এ সময় টালবাহানা করে কোন ইহুদীকে জিজ্ঞেস করার চেষ্টা করবেন এবং এভাবে তাঁর বুজরুকি ধরা পড়ে যাবে। কিন্তু এ পরীক্ষায় উলটো তারাই মার খেয়ে গেলো। আল্লাহ কেবল সংগে সংগেই ইউসুফ আলাইহিস সালামের এ ঘটনা সম্পূর্ণ তাঁর মুখ দিয়ে শুনিয়েই ক্ষান্ত হলেন না বরং এ ঘটনাকে কুরাইশরা ইউসুফের ভাইদের মতো নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে যে ব্যবহার করছিল ঠিক তার সদৃশ ঘটনা হিসেবে উপস্থাপিত করলেন।

নাযিলের উদ্দেশ্য

এক ঃ এর মাধ্যমে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইতি ওয়া সাল্লামের নবুওয়াতের প্রমাণ এবং তাও আবার বিরোধিদের চাহিদা অনুযায়ী সরবরাহ করা। এ সংগে তাদের স্থিরীকৃত পরীক্ষায় একথা প্রমাণ করে দেয়া যে, নবী শোনা কথা বলেন না বরং অহীর মাধ্যমে যথার্থ জ্ঞান লাভ করেন। ৩ ও ৭ আয়াতে এ উদ্দেশ্যটি সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত করা হয়েছে এবং ১০২ ও ১০৩ আয়াতে পূর্ণ শক্তিতে এর ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

দুই ঃ কুরাইশ সরদারদের ও মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মধ্যে এ সময় যে দ্বন্দ্ব চলছিল তার ওপর ইউসুফ আলাইহিস সালামের ভাইদের ঘটনা প্রয়োগ করে কুরাইশদেরকে একথা জানিয়ে দেয়া যে, আজ তোমরা নিজেদের ভাইয়ের সাথে ঠিক তেমনি আচরণ করছো যেমন ইউসুফের ভাইয়েরা তাঁর সাথে করেছিলেন। কিন্তু যেমন তারা আল্লাহর ইচ্ছার বিরুদ্ধে লড়াই করে সফল হয়নি এবং শেষ পর্যন্ত যাকে চরম নির্দয়ভাবে কূয়ার মধ্যে ফেলে দিয়েছিলো সেই ভাইয়ের পদতলেই নিজেদের সঁপে দিতে

হয়েছিল। ঠিক তেমনিভাবে আল্লাহর কৌশল ও ব্যবস্থাপনার বিরুদ্ধে তোমাদের শক্তি প্রয়োগ সফল হতে পারবে না। একদিন তোমাদেরও নিজেদের এ ভাইয়ের কাছে দয়া ও অনুগ্রহ ভিক্ষা করতে হবে, যাকে আজ তোমরা খতম করে দেবার জন্য উঠেপড়ে লেগেছো। সূরার শুরুতে এ উদ্দেশ্যটিও পরিষ্কারভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে :

لَقَدْ كَانَ فِىْ يُوْسُفَ وَاِخْوَتِهٖٓ اٰيٰتٌ لِّلسَّآئِلِيْنَ

"ইউসুফ ও তার ভাইদের ঘটনার মধ্যে এ প্রশ্নকারীদের জন্য অনেক নিদর্শন রয়েছে।"

আসলে ইউসুফ আলাইহিস সালামের ঘটনাকে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও কুরাইশদের দ্বন্দ্বের ওপর প্রয়োগ করে কুরআন মজীদ যেন একটি স্পষ্ট ভবিষ্যদ্বাণী করেছিল। পরবর্তীকালের ঘটনাবলী তাকে অক্ষরে অক্ষরে সত্য প্রমাণ করেছে। এ সূরাটি নাযিল হওয়ার দেড় দু'বছর পরই কুরাইশরা ইউসুফের ভাইদের মতো মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে হত্যার ষড়যন্ত্র করে। তাদের হাত থেকে প্রাণ বাঁচাবার জন্য তাঁকে বাধ্য হয়ে মক্কা থেকে বের হতে হয়। তারপর তাদের প্রত্যাশার সম্পূর্ণ বিরুদ্ধেই দেশান্তরী অবস্থায়ই তিনি ঠিক তেমনি উন্নতি ও কর্তৃত্ব লাভ করেন যেমন ইউসুফ আলাইহিস সালাম করেছিলেন । তারপর মক্কা বিজয়ের সময় ঠিক সেই একই ঘটনা ঘটেছিল যা মিসরের রাজধানীতে ইউসুফ আলাইহিস সালামের সামনে তাঁর ভাইদের শেষ উপস্থিতির সময় ঘটেছিল। সেখানে যখন ইউসুফের ভাইয়েরা চরম অসহায় ও দীন হীন অবস্থায় তাঁর সামনে হাত জোড় করে দাঁড়িয়ে বলছিলেন :

تَصَدَّقْ عَلَيْنَا اِنَّ اللّٰهَ يَجْزِى الْمُتَصَدِّقِيْنَ

"আমাদের প্রতি সাদ্কা করুন। আল্লাহ সাদকাকারীদেরকে উত্তম পুরস্কার দিয়ে থাকেন।"

তখন ইউসুফ আলাইহিস সালাম প্রতিশোধ নেবার শক্তি রাখা সত্ত্বেও তাদেরকে মাফ করে দিলেন এবং বললেন :

لَا تَثْرِيْبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ يَغْفِرُ اللّٰهُ لَكُمْ وَهُوَ اَرْحَمُ الرّٰحِمِيْنَ

"আজ তোমাদের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ নেই। আল্লাহ তোমাদের মাফ করে দিন। তিনি সকল অনুগ্রহকারীর চাইতে বড় অনুগ্রহকারী।"

অনুরূপভাবে এখানে যখন মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সামনে পরাজিত বিধ্বস্ত কুরাইশরা মাথা নত করে দাঁড়িয়েছিল এবং তিনি তাদের প্রত্যেকটি জুলুমের বদলা নেবার ক্ষমতা রাখতেন তখন তিনি তাদেরকে জিজ্ঞেস করলেন : "তোমারা কি মনে করো, আমি তোমাদের সাথে কেমন ব্যবহার করবো?" তারা জবাব দিল : اخ كريم وابن اخ كريم "আপনি একজন উদারচেতা ভাই এবং একজন উদারচেতা ভাইয়ের সন্তান।" একথায় তিনি বললেন :

فانی اقول لکم کما قال یوسف لاخوته ، لا تثریب علیکم الیوم اذ هبوا فانتم الطلقاء –

"আমি তোমাদের সেই একই জবাব দিচ্ছি যে জবাব ইউসুফ তার ভাইদেরকে দিয়েছিলেন। অর্থাৎ আজ তোমাদের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ নেই। যাও তোমাদের মাফ করে দিলাম।"

বিষয়বস্তু ও আলোচ্য বিষয়

এ দু'টি বিষয় তো এ সূরার উদ্দেশ্যের পর্যায়ভুক্ত। কিন্তু এ কাহিনীটিকেও কুরআন মজীদ নিছক গল্প বলার ও ইতিহাস লেখার ঢংয়ে বর্ণনা করছে না বরং নিজের রীতি অনুসারে তাকে মূল দাওয়াত প্রচারে ব্যবহার করছে।

এ পুরো ঘটনাটিতে সে একথা সুস্পষ্ট করে তুলে ধরছে যে, হযরত ইবরাহীম (আ), হযরত ইসহাক (আ), হযরত ইয়াকুব (আ) ও হযরত ইউসুফ (আ) সেই একই দীনের অনুসারী ছিলেন যে দীনের অনুসারী ছিলেন হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং যে দাওয়াত তিনি দিচ্ছেন সেই একই দাওয়াত তাঁরাও দিতেন।

তাছাড়া সে একদিকে হযরত ইয়াকুব ও হযরত ইউসুফের কর্মকাণ্ড ও চরিত্র এবং অন্যদিকে ইউসুফের ভ্রাতৃবৃন্দ, বণিক দল, আযীযে মিসর, তার স্ত্রী, মিসরের অভিজাত পরিবারের নারী সমাজ ও শাসকদের কর্মকাণ্ড ও চরিত্র পরস্পরের মোকাবিলায় তুলে ধরছে এবং নিছক নিজের বর্ণনাভংগীর মাধ্যমে শ্রোতা ও পাঠকদের সামনে এ নীরব প্রশ্ন উপস্থাপন করছে যে, দেখো, একদিকে ইসলাম একটি আদর্শ চরিত্র পেশ করছে। আল্লাহর বন্দেগী ও আখেরাতে জবাবদিহির প্রতি বিশ্বাসের ভিত্তিতেই এ চরিত্র গড়ে ওঠে। আবার অন্যদিকে রয়েছে আর একটি চরিত্র। কুফরী, জাহেলিয়াত, বৈষয়িক স্বার্থপূজা ও আখেরাতের সাথে সম্পর্কহীনতার ছাঁচে ঢালাই হয়ে এ চরিত্র তৈরী হয়। এখন তোমরা নিজেদের বিবেককে জিজ্ঞেস করো, সে এর মধ্য থেকে কোন্ চারিত্রিক আদর্শটি পছন্দ করে?

তারপর এ ঘটনা থেকে কুরআন মজীদ আরো একটি গভীর তত্ত্বও মানুষের হৃদয়পটে অংকন করে দেয়। সেটি হচ্ছে, আল্লাহ যে কাজ করতে চান তা যে কোন অবস্থায় সম্পাদিত হয়েই যায়। মানুষ নিজের বুদ্ধিমত্তা ও কলাকৌশলের মাধ্যমে তাঁর পরিকল্পনা প্রতিহত করার বা বদলাবার ব্যাপারে কখনো সফল হতে পারে না। বরং অনেক সময় মানুষ নিজের পরিকল্পনার লক্ষে একটি কাজ করে এবং মনে করতে থাকে যে, সে তীরটি ঠিক নিশানায় মেরে দিয়েছে কিন্তু শেষে প্রমাণ হয় যে, আল্লাহ তারই হাত দিয়ে এমন কাজ করিয়ে নিয়েছেন যা ছিল তার নিজের পরিকল্পনার বিরোধী এবং আল্লাহর পরিকল্পনার পুরোপুরি বাস্তবায়ন। ইউসুফ আলাইহিস সালামের ভাইয়েরা যখন তাঁকে কূয়ায় ফেলে দিচ্ছিলো তখন তারা মনে করছিলো আমরা নিজেদের পথের কাঁটা চিরতরে দূর করে দিচ্ছি। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তারা ইউসুফকে নিজেদের হাতে এমন এক উন্নতির প্রথম ধাপে চড়িয়ে দিয়েছিলো যার ওপর আল্লাহ তাঁকে চড়াতে চাচ্ছিলেন এবং এ কাজ

করে তারা নিজেরা যে ফল লাভ করেছে তা এ ছাড়া আর কিছুই নয় যে, ইউসুফের উন্নতির উচ্চ শিখরে পৌঁছে যাবার পর তারা নিজের ভাইয়ের সাথে সসম্মানে সাক্ষাত করতে যাওয়ার পরিবর্তে লজ্জা ও অনুতাপের অনুভূতি সহকারে মাথা নত করে তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে থাকে। আযীযে মিসরের স্ত্রী ইউসুফকে কারাগারে পাঠিয়ে মনে করছিল সে প্রতিশোধ নিচ্ছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সে তার জন্য রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় পৌঁছার পথ পরিষ্কার করেছিল। আর নিজের এ কৌশলের মাধ্যমে সে নিজের জন্য এর চেয়ে বেশী কিছু অর্জন করতে পারেনি যে, যথার্থ কাজের সময়ে দেশের শাসকের স্ত্রী হিসেবে 'মুরব্বী'র সম্মান লাভ করার পরিবর্তে তাকে নিজের বিশ্বাসঘাতকতার জন্য লজ্জায় অধোবদন হতে হয়। এসব নিছক দু'চারটে বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। বরং ইতিহাসের পাতা এমনি ধরনের অসংখ্য ঘটনায় ভরা। এগুলো এ সত্যটিরই সাক্ষ প্রদান করে যে, আল্লাহ যাকে ওপরে উঠাতে চান সারা দুনিয়ার লোকেরা মিলেও তাকে নিচে ফেলে দিতে পারে না। বরং দুনিয়ার লোকেরা তাকে নিচে ফেলে দেয়ার জন্য যে কৌশলটি অত্যন্ত কার্যকর ও নিশ্চিত মনে করে অবলম্বন করে সেই কৌশলের মধ্য দিয়েই আল্লাহ তার ওপরে ওঠার পথ বের করে দেন এবং যারা তাকে নামাতে চেয়েছিল তাদের জন্য লাঞ্ছনা ও অপমান ছাড়া আর কিছুই থাকে না। অনুরূপভাবে এর ঠিক বিপরীতে আল্লাহ যাকে ভূপাতিত করতে চান কোন কৌশলই তাকে দাঁড় করিয়ে রাখতে পারে না। বরং দাঁড় করিয়ে রাখার যাবতীয় কার্যক্রম ও কৌশল উলটে যায় এবং এ ধরনের কৌশল অবলম্বনকারীকে ব্যর্থ মনোরথ হতে হয়।

যে ব্যক্তি এ সত্যটি উপলব্ধি করবে সে প্রথমে এ শিক্ষা লাভ করবে যে, মানুষকে নিজের উদ্দেশ্য ও কলাকৌশল উভয় ক্ষেত্রে এমন সব সীমারেখা অতিক্রম করা উচিত নয় যা আল্লাহর আইনে তার জন্য নির্ধারিত করে দেয়া হয়েছে। সাফল্য ও ব্যর্থতা অবশ্যি আল্লাহর হাতে। কিন্তু যে ব্যক্তি পবিত্র উদ্দেশ্যে সরল সোজা ও বৈধ কলাকৌশল অবলম্বন করবে সে ব্যর্থ হয়ে গেলেও তাকে লাঞ্ছনা ও অপমানের সম্মুখীন হতে হবে না। আর যে ব্যক্তি অপবিত্র উদ্দেশ্যে বাঁকা কলাকৌশল অবলম্বন করবে সে আখেরাতে তো অবশ্যি অপমানিত ও লাঞ্ছিত হবেই, দুনিয়াতেও তার জন্য অপমান ও লাঞ্ছনার ভয় কিছু কম নেই। দ্বিতীয়ত সে এ থেকে লাভ করবে আল্লাহর ওপর তাওয়াক্কুল এবং তাঁর প্রতি আত্মসমর্পিত হবার গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা। যারা সত্য ও সততার জন্য প্রচেষ্টা চালাচ্ছে এবং দুনিয়াবাসীরা তাদের নিশ্চিহ্ন করার জন্য উঠে পড়ে লেগেছে তারা যদি এ সত্যটি সামনে রাখে তাহলে এ থেকে তারা দুর্লভ মানসিক প্রশান্তি লাভ করবে এবং বিরোধী শক্তিবর্গের বাহ্যত অত্যন্ত ভয়াবহ কলাকৌশলসমূহ দেখে তারা মোটেই ভীত হবে না। বরং ফলাফল আল্লাহর ওপর ছেড়ে দিয়ে নিজেদের নৈতিক দায়িত্ব পালন করে যেতে থাকবে।

কিন্তু এ ঘটনাটি থেকে সবচেয়ে বড় যে শিক্ষাটি পাওয়া যায় সেটি হচ্ছে এই যে, একজন মরদে মুমিন যদি সত্যিকার ইসলামী চরিত্রের অধিকারী হয় এবং সে বিজ্ঞতা ও বিচক্ষণতার গুণেও গুণান্বিত হয় তাহলে নিছক নিজের চরিত্র বলে সে সারা দেশ জয় করতে পারে। ইউসুফ আলাইহিস সালামের ব্যাপারটি দেখুন। ১৭ বছর বয়সে একাকী সহায় সম্বলহীন অবস্থায় বিদেশ বিভূঁইয়ে তিনি একেবারেই অপরিচিত পরিবেশে, অধিকন্তু চরম দুর্বল অবস্থায় নিপতিত। কারণ তাঁকে গোলাম বানিয়ে বিক্রি করা হয়। ইতিহাসের

সেই অধ্যায়ে গোলামদের যে অবস্থা ছিল তা কারো অজানা নেই। এর ওপর মরার ওপর খাঁড়ার ঘা স্বরূপ একটি মারাত্মক নৈতিক অপরাধে অভিযুক্ত করে তাঁকে কারাগারে পাঠানো হয়। এখানে শাস্তির কোন মেয়াদ নির্ধারিত হয়নি। এভাবে তাঁকে একেবারে চরম পর্যায়ে নামিয়ে দেবার পরও তিনি নিছক নিজের ঈমান ও চরিত্র বলে উঠে দাঁড়ান এবং শেষ পর্যন্ত সারা দেশের ওপর বিজয়ী হন।

ঐতিহাসিক ও ভৌগোলিক অবস্থা

এ ঘটনাটি সঠিকভাবে বুঝতে হলে এ সম্পর্কে কিছু সংক্ষিপ্ত ঐতিহাসিক ও ভৌগোলিক তথ্যও পাঠকদের সামনে থাকা উচিত।

হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালাম ছিলেন হযরত ইয়াকূবের (আ) পুত্র, হযরত ইসহাকের পৌত্র এবং হযরত ইবরাহীমের প্রপৌত্র। বাইবেলের বর্ণনা অনুযায়ী (কুরআনের ইংগিত থেকে এর সমর্থন পাওয়া যায়) হযরত ইয়াকূবের চার স্ত্রী থেকে ছিল বারটি ছেলে। হযরত ইউসুফ (আ) ও বিন ইয়ামীন ছিলেন এক স্ত্রীর গর্ভজাত এবং বাকি দশজন অন্য স্ত্রীদের গর্ভজাত।

ফিলিস্তিনে হযরত ইয়াকূবের আবাস ছিল হিবরূন (বর্তমান আল খাইল) উপত্যকায়। এখানে হযরত ইসহাক (আ) এবং তাঁর পূর্বে হযরত ইবরাহীমও (আ) থাকতেন। এ ছাড়া সিক্‌কিমে (বর্তমান নাবলুস) হযরত ইয়াকূবের (আ) কিছু জমি ছিল।

বাইবেল বিশারদগণের গবেষণাকে সঠিক বলে ধরে নিলে হযরত ইউসুফের জন্ম খৃষ্টপূর্ব ১৯০৬ সালের কাছাকাছি সময়ে হয় বলে ধরা যায়। এ হিসেবে খৃষ্টপূর্ব ১৮৯০ সালের কাছাকাছি সময়ে যে ঘটনাটি ঘটে অর্থাৎ স্বপ্ন দেখা এবং কূয়ায় নিক্ষিপ্ত হওয়া, এ থেকে এ ঘটনাটির সূত্রপাত হয়। এ সময় হযরত ইউসুফের বয়স ছিল ১৭ বছর। যে কূয়ায় তাঁকে ফেলে দেয়া হয় সেটি বাইবেল ও তালমূদের ভাষ্যমতে সিক্‌কিমের উত্তর দিকে দূতান (বর্তমানে দূসান) নামক স্থানের কাছাকাছি অবস্থিত ছিল। আর যে কাফেলাটি তাঁকে কূয়া থেকে উদ্ধার করে তারা জাল'আদ (পূর্ব জর্দান) থেকে আসছিল এবং মিসরের দিকে যাচ্ছিল। (জাল'আদের ধ্বংসাবশেষ আজো জর্দান নদীর পূর্ব দিকে ইলিয়াবিস উপত্যকার কিনারে পাওয়া যায়।)

এ সময় মিসরে পঞ্চদশতম রাজ পরিবারের শাসন চলছিল। মিসরের ইতিহাসে এ পরিবারটি রাখাল রাজন্যবর্গ (HYKSOS KINGS) নামে পরিচিত। এরা ছিল আরবীয় বংশজাত। খৃষ্টপূর্ব দু'হাজার বছরের কাছাকাছি সময়ে এরা ফিলিস্তিন ও সিরিয়া থেকে মিসরে গিয়ে দেশের শাসন কর্তৃত্ব দখল করেছিল। আরব ঐতিহাসিক ও কুরআনের তাফসীরকারগণ তাদের জন্য "আমালীক" নাম ব্যবহার করেছেন। মিসর সম্পর্কীয় আধুনিক অনুসন্ধান ও গবেষণার সাথে এটি পূর্ণ সামঞ্জস্যশীল। মিসরে এরা বিদেশী হানাদারের পর্যায়ভুক্ত ছিল এবং দেশে গৃহবিবাদের কারণে তারা সেখানে নিজেদের রাজত্ব কায়েম করার সুযোগ পেয়ে গিয়েছিল। এ কারণে তাদের রাজত্বে হযরত ইউসুফের (আ) উত্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছিল এবং তারা বনী ইসরাঈলকে সাদরে গ্রহণ করেছিল। দেশের

হযরত ইউসুফ (আঃ)-এর কাহিনী সংক্রান্ত মানচিত্র
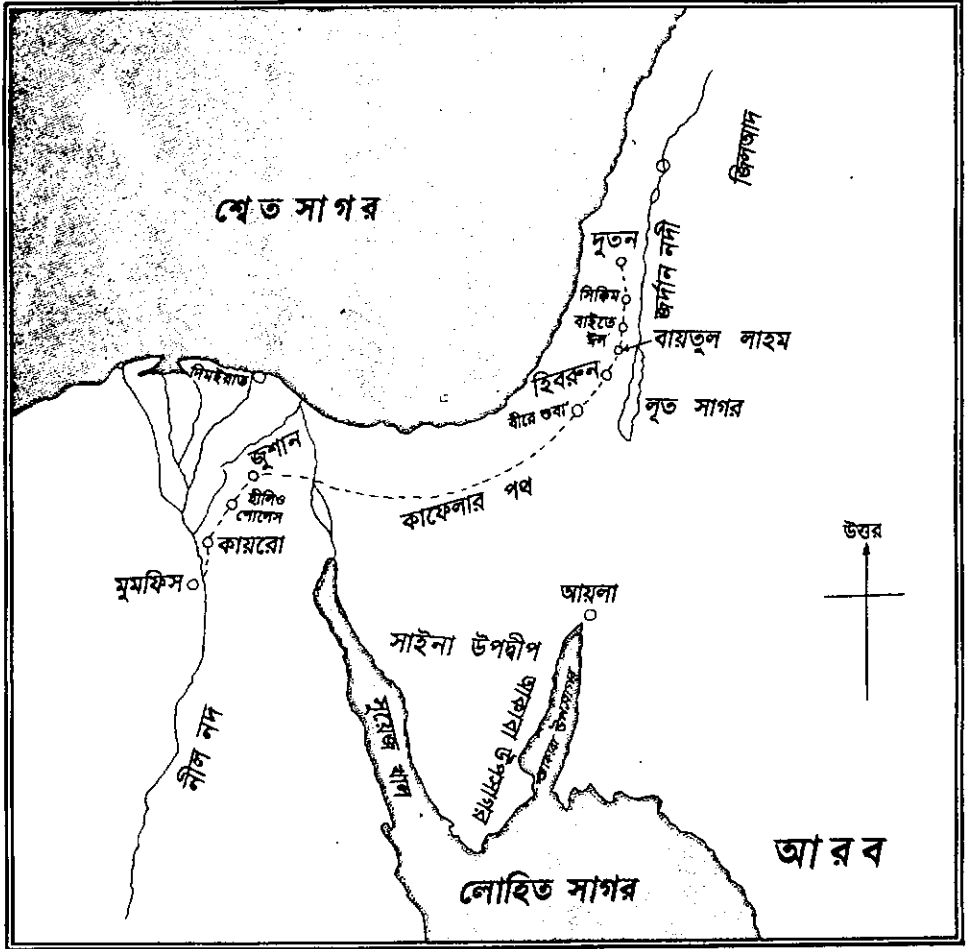
দুতন ঃ বাইবেলের মতে এ স্থানেই হযরত ইউসুফ কূপে নিক্ষিপ্ত হয়েছিল।

সিক্কিম ঃ এখানে হযরত ইয়াকূবের পৈতৃক সম্পত্তি ছিল। বর্তমানে এর নাম নাবলূস।

হিবরুন ঃ এখানে হযরত ইয়াকূব বসবাস করতেন। এর আর এক নাম 'আল-খলীল।'

জুশান ঃ হযরত ইউসুফ এখানে বনী ইসরাঈলদেরকে পূনর্বাসিত করেন।

সবচেয়ে উর্বর এলাকা তাদের বসতি স্থাপন করার জন্য দেয়া হয়েছিল। সেখানে তারা বিপুল প্রভাব প্রতিপত্তির অধিকারী হয়েছিল। কারণ তারা ছিল বিদেশী শাসকদের সগোত্রীয়। খৃষ্টপূর্ব পঞ্চদশ শতকের শেষ অবধি তারা মিসর শাসন করতে থাকে। তাদের আমলে কার্যত দেশের যাবতীয় কর্তৃত্ব ও ক্ষমতা বনী ইসরাঈলদের হাতে ন্যস্ত থাকে। সূরা মায়েদার ২০ আয়াতে এ যুগের প্রতি ইংগিত করে বলা হয়েছে ঃ

اِذْ جَعَلَ فِيْكُمْ اَنْبِيَآءَ وَجَعَلَكُمْ مُّلُوْكًا এরপর দেশে একটি প্রবল জাতীয়তাবাদী আন্দোলন সৃষ্টি হয়। এর ফলে হিক্সুস (HYKSOS) শাসনের অবসান ঘটে। আড়াই লাখের মতো আমালিকাকে দেশ থেকে বের করে দেয়া হয়। একটি চরম বিদ্বেষী কিবৃতী বংশোদ্ভূত পরিবার দেশের শাসন কর্তৃত্ব দখল করে। তারা আমালিকাদের আমলের প্রত্যেকটি স্মৃতি চিহ্ন খুঁজে খুঁজে বের করে এনে ধ্বংস করে দেয় এবং হযরত মূসার (আ) ঘটনা প্রসংগে বনী ইসরাঈলদের প্রতি যেসব অত্যাচারের কাহিনী উল্লেখিত হয়েছে তার ধারাবাহিকতার সূত্রপাত করে।

মিসরের ইতিহাস থেকে একথাও জানা যায় যে, এ রাখাল বাদশাহরা মিসরীয় দেবতাদেরকে স্বীকৃতি দেয়নি। তারা সিরিয়া থেকে নিজেদের দেবতা সংগে করে এনেছিল। মিসরে নিজেদের ধর্মের প্রসারে তারা প্রচেষ্টা চালিয়েছিল। এ কারণে কুরআন মজীদ হযরত ইউসুফের সমকালীন মিসর সম্রাটকে "ফেরাউন" নামে উল্লেখ করছে না। কারণ ফেরাউন ছিল মিসরের ধর্মীয় পরিভাষা এবং এরা মিসরীয় ধর্মের প্রবক্তা ছিল না। কিন্তু বাইবেলে ভুলক্রমে তাকেও "ফেরাউন" বলা হয়েছে। সম্ভবত বাইবেল সংকলকগণ মনে করতেন যে, মিসরের সব বাদশাহই "ফেরাউন" ছিল।

বর্তমান যুগের অনুসন্ধানী ও গবেষকগণ বাইবেল ও মিসরীয় ইতিহাসের তুলনামূলক বিশ্লেষণ করেছেন। তারা সাধারণভাবে এ অভিমত পোষণ করেন যে, মিসরের ইতিহাসে রাখাল বাদশাহদের মধ্যে আপোফিস (APOPHIS) নামক বাদশাহই ছিলেন হযরত ইউসুফের সমসাময়িক।

এ সময় মমফিস (মনফ) ছিল মিসরের রাজধানী। কায়রোর দক্ষিণে ১৪ মাইল দূরে এর ধ্বংসাবশেষ পাওয়া যায়। হযরত ইউসুফ (আ) ১৭/১৮ বছর বয়সে সেখানে পৌছেন। দুতিন বছর আযীযে মিসরের বাড়িতে থাকেন। আট নয় বছর কারাগারে বাস করেন। ৩০ বছর বয়সে দেশের শাসক নিযুক্ত হন। ৮০ বছর বয়স পর্যন্ত একচ্ছত্রভাবে সমগ্র মিসর শাসন করতে থাকেন। তাঁর শাসনকালের নবম বা দশম বছরে তিনি হযরত ইয়াকূবকে (আ) তাঁর সমগ্র পরিবার পরিজনসহ ফিলিস্তিন থেকে মিসরে নিয়ে আসেন। তাদেরকে দিমীয়াত ও কায়রোর মাঝামাঝি এলাকায় আবাদ করেন। বাইবেলে এ এলাকার নাম জুশান বা গুশান বলা হয়েছে। হযরত মূসার (আ) আমল পর্যন্ত তারা সেখানেই বসবাস করতো। বাইবেলের বর্ণনামতে হযরত ইউসুফ একশো দশ বছর বয়সে ইন্তিকাল করেন। মৃত্যুকালে তিনি বনী ইসরাঈলকে অসিয়াত করে যান, তোমরা যখন এ দেশ ত্যাগ করবে তখন আমার হাড়গুলো সংগে করে নিয়ে যাবে।

বাইবেলে ও তালমূদে ইউসূফ আলাইহিস সালামের ঘটনার যে বিস্তারিত বিবরণ দেয়া হয়েছে কুরআনের বর্ণনা তা থেকে অনেকটা ভিন্নতর। কিন্তু ঘটনার গুরুত্বপূর্ণ অংশে তিনটি বর্ণনাই একাত্ম। আমার ব্যাখ্যা ও টীকাগুলোতে আমি প্রয়োজনমতো এ পার্থক্য সুস্পষ্ট করে যেতে থাকবো।

পরম করুণাময় মেহেরবান আল্লাহর নামে

الٓرٰ تِلْكَ اٰيٰتُ الْكِتٰبِ الْمُبِيْنِ ① اِنَّآ اَنْزَلْنٰهُ قُرْءٰنًا عَرَبِيًّا لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ ② نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ اَحْسَنَ الْقَصَصِ بِمَآ اَوْحَيْنَآ اِلَيْكَ هٰذَا الْقُرْاٰنَ ۖ وَاِنْ كُنْتَ مِنْ قَبْلِهٖ لَمِنَ الْغٰفِلِيْنَ ③ اِذْ قَالَ يُوْسُفُ لِاَبِيْهِ يٰٓاَبَتِ اِنِّيْ رَاَيْتُ اَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا وَّالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَاَيْتُهُمْ لِيْ سٰجِدِيْنَ ④

আলিফ–লাম–র। এগুলো এমন কিতাবের আয়াত যা নিজের বক্তব্য পরিষ্কারভাবে বর্ণনা করে। আমি একে আরবী ভাষায় কুরআন বানিয়ে নাযিল করেছি,[১] যাতে তোমরা (আরববাসীরা) একে ভালোভাবে বুঝতে পারো।[২] হে মুহাম্মাদ! আমি এ কুরআনকে তোমার কাছে অহীর মাধ্যমে পাঠিয়ে উত্তম পদ্ধতিতে ঘটনাবলী ও তত্ত্বকথা তোমার কাছে বর্ণনা করছি। নয়তো ইতিপূর্বে তুমি (এসব জিনিস থেকে) একেবারেই বেখবর ছিলে।[৩]

এটা সেই সময়ের কথা, যখন ইউসুফ তার বাপকে বললো ঃ "আব্বাজান! আমি স্বপ্ন দেখেছি, এগারটি তারকা এবং সূর্য ও চাঁদ আমাকে সিজদা করছে।"

১. قران হচ্ছে قَرَاء ক্রিয়াপদের শব্দমূল। এর আসল মানে হচ্ছে 'পড়া', শব্দমূলকে যখন কোন জিনিসের জন্য নাম হিসেবে ব্যবহার করা হয় তখন তার অর্থ হয় সংশ্লিষ্ট জিনিসটির মধ্যে তার শব্দমূলের অর্থ পুরোপুরি পাওয়া যায়। যেমন যখন কোন ব্যক্তিকে বীর বলার পরিবর্তে 'বীরত্ব' বলা হবে তখন তার মানে হবে, তার মধ্যে সাহসিকতা ও বীর্যবত্তা এমন পূর্ণাংগ পর্যায়ে পাওয়া যায় যেন সে এবং বীরত্ব একই জিনিস হয়ে গেছে। কাজেই এ কিতাবের নাম 'কুরআন' (পড়া) রাখার অর্থ হচ্ছে এই যে, এ কিতাব সাধারণ ও অসাধারণ নির্বিশেষে সকলের পড়ার জন্য এবং খুব বেশী বেশী করে পঠিত হবার জিনিস।

قَالَ يٰبُنَيَّ لَا تَقْصُصْ رُءْيَاكَ عَلٰٓى اِخْوَتِكَ فَيَكِيْدُوْا لَكَ كَيْدًا ؕ اِنَّ الشَّيْطٰنَ لِلْاِنْسَانِ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ ۝٥ وَكَذٰلِكَ يَجْتَبِيْكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِنْ تَاْوِيْلِ الْاَحَادِيْثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهٗ عَلَيْكَ وَعَلٰٓى اٰلِ يَعْقُوْبَ كَمَآ اَتَمَّهَا عَلٰٓى اَبَوَيْكَ مِنْ قَبْلُ اِبْرٰهِيْمَ وَاِسْحٰقَ ؕ اِنَّ رَبَّكَ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ۝٦

জবাবে তার বাপ বললো ঃ "হে পুত্র! তোমার এ স্বপ্ন তোমার ভাইদেরকে শুনাবে না; শুনালে তারা তোমার ক্ষতি করার জন্য পেছনে লাগবে।[৪] আসলে শয়তান মানুষের প্রকাশ্য শত্রু এবং ঠিক এমনটিই হবে (যেমনটি তুমি স্বপ্নে দেখেছো যে,) তোমার রব তোমাকে (তাঁর কাজের জন্য) নির্বাচিত[৫] করবেন এবং তোমাকে কথার মর্মমূলে পৌঁছানো শেখাবেন[৬] আর তোমার প্রতি ও ইয়াকূবের পরিবারের প্রতি তাঁর নিয়ামত ঠিক তেমনিভাবে পূর্ণ করবেন যেমন এর আগে তিনি তোমার পিতৃপুরুষ ইবরাহীম ও ইসহাকের প্রতি করেছেন। নিসন্দেহে তোমার রব সর্বজ্ঞ ও বিজ্ঞানময়।"[৭]

২. এর মানে এ নয় যে, এ কিতাবটি বিশেষভাবে আরববাসীদের জন্য নাযিল করা হয়েছে। বরং এ বাক্যাংশটির আসল বক্তব্য হচ্ছে, "হে আরববাসীরা! এসব কথা তোমাদের ইরানী ও গ্রীক ভাষায় শুনানো হচ্ছে না, তোমাদের নিজেদেরই ভাষায় শুনানো হচ্ছে। কাজেই তোমরা এ ওজর পেশ করতে পারো না যে, এসব কথা তো আমরা বুঝতে পারছি না। আর এ কিতাবে অলৌকিকতার যে দিকগুলো রয়েছে, যা এর আল্লাহর বাণী হওয়ার সাক্ষ দিচ্ছে, সেগুলোও যে তোমাদের দৃষ্টির আগোচরে থেকে যাবে, এটাও সম্ভব নয়।"

কেউ কেউ কুরআন মজীদে এ ধরনের বাক্য দেখে আপত্তি করে থাকেন যে, এ কিতাব তো আরববাসীদের জন্য নাযিল হয়েছে, অনারবদের জন্য নয়। এ ক্ষেত্রে একে সমগ্র মানব জাতির জন্য হেদায়াত কেমন করে বলা যেতে পারে? কিন্তু এটি নিছক একটি হালকা ও ফাঁকা আপত্তি ছাড়া আর কিছুই নয়। আসল সত্য উপলব্ধি করার চেষ্টা না করেই এ আপত্তি উত্থাপন করা হয়। মানব জাতির ব্যাপক ও সার্বজনীন হেদায়াতের জন্য যে জিনিসই পেশ করা হবে তা অবশ্যি মানব সমাজে প্রচলিত ভাষাগুলোর যে কোন একটিতেই পেশ করা হবে। এ হেদায়াত পেশকারী এটিকে যে জাতির ভাষায় পেশ করছেন প্রথমে তাকে এর শিক্ষাবলী দ্বারা পুরোপুরি প্রভাবিত করার চেষ্টা করবেন। তারপর এ জাতিই অন্যান্য জাতির কাছে এর শিক্ষা পৌঁছাবার মাধ্যমে পরিণত হবে। কোন দাওয়াত ও আন্দোলনকে আন্তরজাতিক পর্যায়ে সম্প্রসারিত করার জন্য এটিই একটি বাস্তব ও স্বাভাবিক পদ্ধতি।

৩. সূরার ভূমিকায় আমি একথা বর্ণনা করে এসেছি যে, মক্কার কাফেরদের কোন কোন লোক নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে পরীক্ষা করার বরং তাদের মতে তাঁর

মুখোশ খুলে দেবার জন্য সম্ভবত ইহুদীদের ইংগিতে তাঁকে হঠাৎ এ প্রশ্ন করে বসেছিল যে, বনী ইসরাঈলদের মিসরে চলে যাওয়ার কারণ কি ছিল? এ কারণে তাদের প্রশ্নের জবাবে বনী ইসরাঈলদের ইতিহাসের এ অধ্যায় বর্ণনা করার আগে ভূমিকা স্বরূপ একথা বলে দেয়া হলো। হে মুহাম্মাদ! তুমি এসব ঘটনা জানতে না, আমি অহির মাধ্যমে তোমাকে তাদের কথা জানাচ্ছি। আপাতদৃষ্টে এ বাক্যে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সম্বোধন করা হয়েছে কিন্তু আসলে এখানে এমন সব বিরোধীদের উদ্দেশ্যে বক্তব্য রাখা হয়েছে যারা অহীর মাধ্যমে নবী (সা) যে সঠিক জ্ঞান লাভ করেন একথা বিশ্বাস করতো না।

৪. এখানে হযরত ইউসুফের (আ) দশজন বৈমাত্রেয় ভাইয়ের কথা বলা হয়েছে। হযরত ইয়াকূব (আ) জানতেন এ বৈমাত্রেয় ভাইয়েরা ইউসুফকে (আ) হিংসা করে। নৈতিক দিক দিয়েও তারা এমন পর্যায়ের সচ্চরিত্র ছিল না যে, নিজেদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ করার জন্য কোন অবৈধ কাজ করতে কুন্ঠিত হবে। তাই তিনি নিজের সদাচারী পুত্রকে বলে দিলেন, তাদের থেকে সাবধান থেকো। স্বপ্নের পরিষ্কার অর্থ ছিল এই ঃ সূর্য মানে হযরত ইয়াকূব (আ), চাঁদ মানে তাঁর স্ত্রী (হযরত ইউসুফের বিমাতা) এবং এগারটি তারকা মানে এগারটি ভাই।

৫. অর্থাৎ নবুওয়াত দান করবেন।

৬. تاويل الاحاديث মানে নিছক স্বপ্নের তাবীরের জ্ঞান নয়, যেমন মনে করা হয়ে থাকে। বরং এর অর্থ হচ্ছে, আল্লাহ তোমাকে সমস্যা ও পরিস্থিতি অনুধাবন করার এবং সত্য পর্যন্ত পৌঁছুবার জ্ঞান দান করবেন। আর এ সংগে এমন গভীর অন্তরদৃষ্টি দান করবেন যার মাধ্যমে তুমি প্রত্যেকটি বিষয়ের গভীরে নামার এবং তার তলদেশে পৌঁছে যাবার যোগ্যতা অর্জন করবে।

৭. বাইবেল ও তালমূদের বর্ণনা কুরআনের এ বর্ণনা থেকে ভিন্নতর। তাদের বর্ণনা হচ্ছে, হযরত ইয়াকূব স্বপ্নের বর্ণনা শুনে ছেলেকে খুব ধমক দেন এবং তাকে বলেন ঃ "আচ্ছা, এখন তাহলে এ স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছো যে, আমি, তোমার মা ও তোমার সব ভাইয়েরা তোমাকে সিজদা করবো।" কিন্তু একটু চিন্তা করলে সহজেই একথা উপলব্ধি করা যেতে পারে যে, বাইবেল ও তালমূদের বর্ণনা নয় বরং কুরআনের বর্ণনাটিই হযরত ইয়াকূবের নবীসুলভ চরিত্রের সাথে অধিক সামঞ্জস্যশীল। হযরত ইউসুফ নিজের স্বপ্ন বর্ণনা করেছিলেন, নিজের আকাংখা ও অভিলাষ ব্যক্ত করেননি। স্বপ্ন যদি সত্য হয়ে থাকে এবং বলা বাহুল্য যে, হযরত ইয়াকূব তার যে তাবীর করেছিলেন তা সত্য স্বপ্ন মনে করেই করেছিলেন, তাহলে এর পরিষ্কার অর্থ ছিল, এটা ইউসুফ আলাইহিস সালামের আকাংখা ছিল না বরং আল্লাহর তকদীরের ফায়সালা ছিল যে, এক সময় তিনি উন্নতির এহেন উচ্চ শিখরে আরোহণ করবেন। এ ক্ষেত্রে একজন নবী তো দূরের কথা একজন বিবেকবুদ্ধি সম্পন্ন ব্যক্তিও কি এরূপ আচরণ করতে পারেন? এ ধরনের কথায় কি তিনি অসন্তুষ্ট হতে এবং যে স্বপ্ন দেখেছে উলটো তাকে ধমক দিতে পারেন? কোন ভদ্র পিতাও কি এমন হতে পারেন যে, নিজের পুত্রের ভবিষ্যত উন্নতির সুখবর শুনে খুশী হবার পরিবর্তে তিনি উলটো বিরক্ত ও অসন্তুষ্ট হবেন?

لَقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ آيَاتٌ لِلسَّائِلِينَ ﴿৭﴾ إِذْ قَالُوا لَيُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُّ إِلَىٰ أَبِينَا مِنَّا وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّ أَبَانَا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ﴿৮﴾ اقْتُلُوا يُوسُفَ أَوِ اطْرَحُوهُ أَرْضًا يَخْلُ لَكُمْ وَجْهُ أَبِيكُمْ وَتَكُونُوا مِنْ بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ ﴿৯﴾

২ রুকূ'

আসলে ইউসুফ ও তার ভাইদের ঘটনার মধ্যে এ প্রশ্নকারীদের জন্য বড় বড় নিদর্শন রয়েছে। এ ঘটনা এভাবে শুরু হয় ঃ তার ভাইয়েরা পরস্পর বলাবলি করলো, "এ ইউসুফ ও তার ভাই,[৮] এরা দু'জন আমাদের বাপের কাছে আমাদের সবার চাইতে বেশী প্রিয়, অথচ আমরা একটি পূর্ণ সংঘবদ্ধ দল। সত্যি বলতে কি আমাদের পিতা একেবারেই বিভ্রান্ত হয়ে গেছেন।[৯] চলো আমরা ইউসুফকে মেরে ফেলি অথবা তাকে কোথাও ফেলে দেই, যাতে আমাদের পিতার দৃষ্টি কেবল আমাদের দিকেই ফিরে আসে। এ কাজটি শেষ করে তারপর তোমরা ভালো লোক হয়ে যাবে।"[১০]

৮. এখানে হযরত ইউসুফের সহোদর ভাই বিন ইয়ামীনের কথা বলা হয়েছে। এ ভাইটি তাঁর থেকে কয়েক বছরের ছোট ছিল। তার জন্মের সময় তার মায়ের ইন্তিকাল হয়। এ কারণে হযরত ইয়াকূব এ দু'টি মাতৃহীন সন্তানের প্রতি একটু বেশী নজর দিতেন। এ ছাড়াও এ স্নেহের আর একটি কারণ ছিল এই যে, তাঁর সব ছেলের মধ্যে একমাত্র হযরত ইউসুফই এমন ছিলেন যার মধ্যে তিনি সৌভাগ্য ও সত্য সঠিক পথের সন্ধান লাভের লক্ষণ দেখেছিলেন। হযরত ইউসুফের স্বপ্নের কথা শুনে তিনি যাকিছু বলেছিলেন ওপরে তার যে বর্ণনা এসেছে তা থেকে সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হচ্ছে যে, তিনি নিজের এ ছেলেটির অসাধারণ যোগ্যতা সম্পর্কে খুব ভালোভাবেই জানতেন। অন্যদিকে সামনের দিকে যেসব ঘটনার প্রকাশ ঘটেছে তা থেকে তাঁর বাকি দশ ছেলের চারিত্রিক মান সুস্পষ্ট হয়ে যায়। এ ক্ষেত্রে কোন সৎব্যক্তি এ ধরনের সন্তানদের প্রতি সন্তুষ্ট থাকবেন একথা কেমন করে আশা করা যেতে পারে? কিন্তু বাইবেলের বর্ণনায় অবাক হতে হয়। সেখানে ইউসুফের প্রতি তাঁর ভাইদের হিংসার এমন একটি কারণ বর্ণনা করা হয়েছে যার ফলে উল্টো হযরত ইউসুফই দোষী সাব্যস্ত হন। বাইবেলের বর্ণনা মতে হযরত ইউসুফ তাঁর পিতার কাছে ভাইদের বিরুদ্ধে চুগলখোরী করতেন। এ কারণে তাঁর ভাইয়েরা তাঁর প্রতি অসন্তুষ্ট ছিল।

৯. এ বাক্যটির মর্ম উপলব্ধি করার জন্য বেদুইনদের গোত্রীয় জীবনের অবস্থার প্রতি দৃষ্টিপাত করতে হবে। সেখানে কোন রাষ্ট্রীয় শাসন ব্যবস্থা থাকে না। স্বাধীন উপজাতিরা

قَالَ قَآئِلٌ مِّنْهُمْ لَا تَقْتُلُوْا يُوْسُفَ وَاَلْقُوْهُ فِىْ غَيٰبَتِ الْجُبِّ يَلْتَقِطْهُ بَعْضُ السَّيَّارَةِ اِنْ كُنْتُمْ فٰعِلِيْنَ ﴿١٠﴾ قَالُوْا يٰٓاَبَانَا مَا لَكَ لَا تَاْمَنَّا عَلٰى يُوْسُفَ وَاِنَّا لَهٗ لَنٰصِحُوْنَ ﴿١١﴾ اَرْسِلْهُ مَعَنَا غَدًا يَّرْتَعْ وَيَلْعَبْ وَاِنَّا لَهٗ لَحٰفِظُوْنَ ﴿١٢﴾

এ কথায় তাদের একজন বললো, "ইউসুফকে মেরে ফেলো না। যদি কিছু করতেই হয় তাহলে তাকে কোন অন্ধ কূপে ফেলে দাও, আসা–যাওয়ার পথে কোন কাফেলা তাকে তুলে নিয়ে যাবে।" (এ প্রস্তাবের ভিত্তিতে) তারা তাদের বাপকে গিয়ে বললো, " আব্বাজান! কি ব্যাপার, আপনি ইউসুফের ব্যাপারে আমাদের ওপর ভরসা করেন না? অথচ আমরা তার সত্যিকার শুভাকাংখী। আগামীকাল তাকে আমাদের সাথে পাঠিয়ে দিন, সে কিছু ফলমূল খাবে এবং দৌড়ঝাঁপ করে মন চাংগা করবে। আমরা তার হেফাজত করবো।"[১১]

পরস্পর পাশাপাশি বসবাস করে। সেখানে কোন ব্যক্তির বিপুল সংখ্যক ছেলে, নাতি–পুতি, ভাই, ভাতিজা ইত্যাদির ওপর তার ক্ষমতা নির্ভর করে। তার ধন–প্রাণ, ইজ্জত–আবরু রক্ষার প্রয়োজনে তারা তাকে সাহায্য করে। এ ধরনের অবস্থায় মেয়েদের ও শিশুদের তুলনায় স্বাভাবিকভাবে জোয়ান ছেলেরাই মানুষের কাছে বেশী প্রিয় হয়। কারণ দুশমনের সাথে মোকাবিলায় তারা সাহায্য করতে পারে। এ কারণে ইউসুফের ভাইয়েরা বললো, বুড়ো বয়সে আমাদের বাপ দিশেহারা হয়েছে। আমাদের মতো দলবদ্ধ এ যুবক ছেলেরা, যারা খারাপ সময়ে তাঁর কাজে লাগতে পারে, তাঁর কাছে ততটা প্রিয় নয় যতোটা এ ছোট ছোট ছেলে দু'টি যারা তাঁর কোন কাজে লাগতে পারে না বরং উলটো তাদেরকেই হেফাজত করতে হবে।

১০. যারা নিজেদেরকে প্রবৃত্তির কামনা বাসনার হাতে সোপর্দ করে দেবার সাথে সাথে ঈমানদারী ও সততার সাথেও কিছুটা সম্পর্ক রেখে চলে এ বাক্যটির মধ্যে তাদের মানসিকতার একটি চমৎকার অভিব্যক্তি ঘটেছে। এ ধরনের লোকদের রীতি হচ্ছে, যখনই প্রবৃত্তি তাদের কাছে কোন খারাপ কাজ করার তাগিদ দেয় তখনই ঈমানের তাগিদ মুলতবি রেখে তারা প্রথমে প্রবৃত্তির তাগিদ পূর্ণ করার জন্য উঠে পড়ে লাগে। এ সময় বিবেক ভেতর থেকে দংশন করতে থাকলে তাকে এ বলে সান্তনা দেবার চেষ্টা করে যে, একটুখানি সবর করো, এ অনিবার্য গুনাহটি না করলে আমার কাজ আটকে থাকে, কাজেই এটা করে নিতে দাও, তারপর ইনশাআল্লাহ তাওবা করে আমি তেমনি সৎ হয়ে যাবো যেমনটি তুমি আমাকে দেখতে চাও।

১১. এ বর্ণনাটিও বাইবেল ও তালমূদের বর্ণনা থেকে ভিন্ন ধরনের। তাদের বর্ণনা হচ্ছে, ইউসুফের ভাইয়েরা তাদের পশু চরাতে সিক্‌কিমের দিকে গিয়েছিল। হযরত ইয়াকুব

قَالَ إِنِّي لَيَحْزُنُنِي أَنْ تَذْهَبُوا بِهِ وَأَخَافُ أَنْ يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ وَأَنْتُمْ عَنْهُ غَفِلُونَ ﴿١٣﴾ قَالُوا لَئِنْ أَكَلَهُ الذِّئْبُ وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّا إِذًا لَّخَسِرُونَ ﴿١٤﴾ فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ وَأَجْمَعُوا أَنْ يَجْعَلُوهُ فِي غَيَبَتِ الْجُبِّ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿١٥﴾

*বাপ বললো, "তোমরা তাকে নিয়ে যাবে, এটা আমাকে কষ্ট দেবে এবং আমার আশংকা হয়, তোমরা তার প্রতি অমনোযোগী থাকবে এবং নেকড়ে তাকে খেয়ে ফেলবে।" তারা জবাব দিল, "যদি আমাদের সংঘবদ্ধ দল থাকতে তাকে নেকড়ে খেয়ে ফেলে তাহলে তো আমরা হবো বড়ই অকর্মন্য।" এভাবে চাপ দিয়ে যখন তারা তাকে নিয়ে গেলো এবং সিদ্ধান্ত করলো তাকে একটি অন্ধ কূপে ফেলে দেবে তখন আমি ইউসুফকে অহীর মাধ্যমে জানিয়ে দিলাম, "এক সময় আসবে যখন তুমি তাদেরকে তাদের এ কৃতকর্মের কথা স্মরণ করিয়ে দেবে। তাদের কাজের ফলাফল সম্পর্কে তারা জানে না"*১২

নিজেই তাদের সন্ধানে হযরত ইউসুফকে তাদের পেছনে পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু একথা কল্পনাই করা যায় না যে, হযরত ইয়াকূব (আ) হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালামের সাথে তার ভাইদের হিংসার কথা জানা সত্ত্বেও তাঁকে নিজের হাতে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দেবেন। তাই কুরআনের বর্ণনাই অধিকতর বাস্তবসম্মত বলে মনে হয়।

১২. মূল ইবারতে وهم لا يشعرون বাক্য এমনভাবে এসেছে যার ফলে তার তিনটি অর্থ হয় এবং তিনটি অর্থই এখানে মানানসই বলে মনে হয়। একটি অর্থ হচ্ছে, আমি ইউসুফকে এ সান্ত্বনা দিচ্ছিলাম এবং তার ভাইয়েরা এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ বেখবর ছিল যে, তাকে অহীর মাধ্যমে সবকিছু জানানো হচ্ছে। দ্বিতীয়টি হচ্ছে, তুমি এমন অবস্থায় তাদের এ কর্ম সম্পর্কে তাদেরকে স্মরণ করিয়ে দেবে যেখানে তোমার অবস্থানের ব্যাপারটি তারা কল্পনাও করতে পারবে না। তৃতীয় অর্থটি হচ্ছে, আজ এরা না জেনে বুঝে একটি কাজ করছে এবং ভবিষ্যতে এর ফলাফল কি হবে তা এরা জানে না।

এ সময় আল্লাহর পক্ষ থেকে ইউসুফ আলাইহিস সালামকে যে কি সান্ত্বনা দেয়া হয়েছিল বাইবেল ও তালমূদে এর কোন উল্লেখ নেই। বিপরীত পক্ষে তালমূদে যে বর্ণনা এসেছে তা হচ্ছে এই যে, ইউসুফকে যখন কূপে ফেলে দেয়া হলো তখন তিনি জোরে জোরে কাঁদতে থাকলেন এবং চিৎকার করে ভাইদের কাছে ফরিয়াদ করলেন। কুরআনের বর্ণনা পড়লে মনে হবে এমন এক যুবকের কথা বলা হচ্ছে যিনি আগামীতে ইতিহাসের মহান ব্যক্তিদের অন্তরভুক্ত হবেন। অন্যদিকে তালমূদ পড়লে যে ছবিটা চোখের সামনে ভেসে উঠবে তা হচ্ছে এই যে, জনমানবশূন্য বিয়াবনে কয়েকজন বদ্দু একটি বালককে কূপের মধ্যে ফেলে দিচ্ছে এবং এ সময় একজন সাধারণ বালক যা করে সে–ও তাই করছে।

وَجَآءُوٓ أَبَاهُمْ عِشَآءً يَبْكُونَ ﴿١٦﴾ قَالُوا۟ يَٰٓأَبَانَآ إِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِندَ مَتَٰعِنَا فَأَكَلَهُ ٱلذِّئْبُ ۖ وَمَآ أَنتَ بِمُؤْمِنٍ لَّنَا وَلَوْ كُنَّا صَٰدِقِينَ ﴿١٧﴾ وَجَآءُو عَلَىٰ قَمِيصِهِۦ بِدَمٍ كَذِبٍ ۚ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا ۖ فَصَبْرٌ جَمِيلٌ ۖ وَٱللَّهُ ٱلْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ ﴿١٨﴾

রাতে তারা কাঁদতে কাঁদতে তাদের বাপের কাছে এসে বললো, "আব্বাজান! আমরা দৌড় প্রতিযোগিতা করছিলাম এবং ইউসুফকে আমাদের জিনিসপত্রের কাছে রেখে গিয়েছিলাম, ইতিমধ্যে নেকড়েবাঘ এসে তাকে খেয়ে ফেলেছে। আপনি তো আমাদের কথা বিশ্বাস করবেন না, যদিও আমরা সত্যবাদী।" তারা ইউসুফের জামায় মিথ্যা রক্ত লাগিয়ে নিয়ে এসেছিল। একথা শুনে তাদের বাপ বললো, "বরং তোমাদের মন তোমাদের জন্য একটি বড় কাজকে সহজ করে দিয়েছে। ঠিক আছে, আমি সবর করবো এবং খুব ভালো করেই সবর করবো।[১৩] তোমরা যে কথা সাজাচ্ছো তার ওপর একমাত্র আল্লাহর কাছেই সাহায্য চাওয়া যেতে পারে।"[১৪]

১৩. কুরআনের ইবারতে صَبْر جَمِيل শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। এর শাব্দিক অনুবাদ "ভালো সবর" হতে পারে। এর অর্থ হয় এমন সবর যার মধ্যে অভিযোগ, ফরিয়াদ, ভয়-ভীতি ও কান্নাকাটি নেই। একজন উচ্চ ও প্রশস্ত হৃদয়বত্তার অধিকারী মানুষের ওপর যে বিপদ আসে তাকে ধীর স্থির চিত্তে বরদাশত করে যাওয়াই এ সবরের প্রকৃতি।

১৪. বাইবেল ও তালমূদ এখানে হযরত ইয়াকূবের প্রতিক্রিয়ার এমন ছবি এঁকেছে যা যে কোন সাধারণ বাপের প্রতিক্রিয়া থেকে কোন অংশেই ভিন্নতর নয়। বাইবেলের বর্ণনা হচ্ছে, "তখন ইয়াকূব নিজের জামা ফেড়ে ফেলেন, নিজের কোমরের সাথে চট জড়িয়ে নেন এবং বহুদিন পর্যন্ত ছেলের জন্য মাতম করতে থাকেন।" তালমূদে বলা হয়েছে, "ইয়াকূব ছেলের জামা চিনতে পেরেই উপুড় হয়ে মাটিতে পড়ে যান এবং দীর্ঘক্ষণ নিথর-নিস্পন্দ হয়ে পড়ে থাকেন। তারপর উঠে বিকট জোরে চিৎকার দিয়ে বলেন, হাঁ এ আমার ছেলের জামা। এরপর তিনি বছরের পর বছর ধরে ইউসুফের জন্য মাতম করতে থাকেন।"

এ বর্ণনায় হযরত ইয়াকূবকে ঠিক তেমনটি করতে দেখা যাচ্ছে যেমনটি এ অবস্থায় প্রত্যেক বাপ করে থাকে। কিন্তু কুরআন এর যে বর্ণনা দিয়েছে তা আমাদের সামনে একটি অসাধারণ ব্যক্তিত্বের ছবি তুলে ধরেছে। এ ব্যক্তি আপাদমস্তক ধৈর্য ও সহিষ্ণুতার প্রতিমূর্তি। এতবড় শোকাবহ ও হৃদয়বিদারক খবর শুনেও তিনি নিজের মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে

وَجَاءَتْ سَيَّارَةٌ فَأَرْسَلُوا وَارِدَهُمْ فَأَدْلَىٰ دَلْوَهُ ۖ قَالَ يَا بُشْرَىٰ هَٰذَا غُلَامٌ ۚ وَأَسَرُّوهُ بِضَاعَةً ۚ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَعْمَلُونَ ⑲ وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ ⑳

ওদিকে একটি কাফেলা এলো। তারা তাদের পানি সংগ্রাহককে পানি নেবার জন্য পাঠালো। সে কূয়ার মধ্যে পানির ডোল নামিয়ে দিল। সে (ইউসুফকে দেখে) বলে উঠলো, "কী সুখবর! এখানে তো দেখছি একটি বালক।" তারা তাকে পণ্য দ্রব্য হিসেবে লুকিয়ে ফেললো। অথচ তারা যা কিছু করছিল সে সম্পর্কে আল্লাহ অবহিত ছিলেন। শেষে তারা তাকে সামান্য দামে কয়েক দিরহামের বিনিময়ে বিক্রি করে দিল।[১৫] আর তার দামের ব্যাপারে তারা বেশী আশা করছিল না।

হারিয়ে ফেলছেন না। প্রখর বুদ্ধিমত্তার সাহায্যে পরিস্থিতির সঠিক চেহারা অনুমান করতে পারছেন। তিনি বুঝতে পারেন এটা একটা বানোয়াট কথা। তাঁর হিংসুটে ছেলেরা ঘটনাটা সাজিয়ে তাঁর সামনে পেশ করেছে। তারপর বিশাল হৃদয় ব্যক্তিদের মতো তিনি সবর করেন এবং আল্লাহর ওপর ভরসা করেন।

১৫. ঘটনাটা সহজভাবে বলতে গেলে এরূপ বলা যায় যে, ইউসুফের ভাইয়েরা হযরত ইউসুফকে কূপের মধ্যে ফেলে দিয়ে চলে যায়। পরে কাফেলার লোকজন এসে তাকে সেখান থেকে বের করে আনে। তারা তাকে মিসরে নিয়ে গিয়ে বিক্রি করে। কিন্তু বাইবেলের বর্ণনা হচ্ছে, ইউসুফের ভাইয়েরা পরে ইসমাঈলীদের একটি কাফেলা দেখে ইউসুফকে কূয়া থেকে বের করে তাদের হাতে বিক্রি করে দিতে চায়। কিন্তু তার আগেই মাদয়ানের সওদাগর তাকে কূয়া থেকে বের করে ফেলে। এ সওদাগরেরা বিশ দিরহামে ইউসুফকে ইসমাঈলীদের হাতে বিক্রি করে দেয়। সামনের দিকে গিয়ে বাইবেল লেখকরা একথা ভুলে যান যে, ইতিপূর্বে তারা ইউসুফকে ইসমাঈলীদের হাতে বিক্রি করে দিয়ে এসেছেন। তাই তারা ইসমাঈলীদের পরিবর্তে আবার মাদয়ানের সওদাগরদের দ্বারা তাঁকে মিসরীয়দের হাতে বিক্রি করাচ্ছেন। (দেখুন, আদি পুস্তক ৩৭ঃ২৫–২৮ এবং ৩৬) অন্যদিকে তালমূদের বর্ণনা হচ্ছে, মাদয়ানের সওদাগরেরা ইউসুফকে কূয়া থেকে বের করে এনে নিজেদের গোলামে পরিণত করে। তারপর ইউসুফের ভাইয়েরা ইউসুফকে তাদের হাতে দেখে তাদের সাথে ঝগড়া করতে থাকে। অবশেষে তারা বিশ দিরহাম মূল্য পরিশোধ করে ইউসুফের ভাইদেরকে রাজি করে। তারপর তারা বিশ দিরহামের বিনিময়েই ইউসুফকে ইসমাঈলীদের হাতে বিক্রি করে। আর ইসমাঈলীরা মিসরে গিয়ে তাকে বিক্রি করে। এখান থেকেই মুসলমানদের মধ্যে এ বর্ণনার প্রচলন হয়েছে যে, ইউুফের ভাইয়েরা ইউসুফকে বিক্রি করে। কিন্তু জানা উচিত, কুরআন এ সমস্ত বর্ণনা সমর্থন করেনি।

وَقَالَ الَّذِى اشْتَرٰىهُ مِنْ مِّصْرَ لِامْرَاَتِهٖٓ اَكْرِمِىْ مَثْوٰىهُ عَسٰٓى اَنْ يَّنْفَعَنَآ اَوْ نَتَّخِذَهٗ وَلَدًا ؕ وَكَذٰلِكَ مَكَّنَّا لِيُوْسُفَ فِى الْاَرْضِ ز وَلِنُعَلِّمَهٗ مِنْ تَاْوِيْلِ الْاَحَادِيْثِ ؕ وَاللّٰهُ غَالِبٌ عَلٰٓى اَمْرِهٖ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿۲۱﴾ وَلَمَّا بَلَغَ اَشُدَّهٗٓ اٰتَيْنٰهُ حُكْمًا وَّعِلْمًا ؕ وَكَذٰلِكَ نَجْزِى الْمُحْسِنِيْنَ ﴿۲۲﴾

৩ রুকূ'

মিসরে যে ব্যক্তি তাকে কিনেছিল[১৬] সে তার স্ত্রীকে[১৭] বললো, "একে ভালোভাবে রাখো, বিচিত্র নয় সে আমাদের জন্য উপকারী প্রমাণিত হবে অথবা আমরা তাকে পুত্র বানিয়ে নেবো।[১৮] এভাবে আমি ইউসুফের জন্য সে দেশে প্রতিষ্ঠালাভের পথ বের করে দিলাম এবং তাকে সমস্যা ও বিষয়াবলী অনুধাবন করার জন্য যথোপযোগী শিক্ষা দানের ব্যবস্থা করলাম।[১৯] আল্লাহ তাঁর কাজ সম্পন্ন করেই থাকেন, কিন্তু অধিকাংশ লোক তা জানে না। আর যখন সে তার পূর্ণ যৌবনে উপনীত হলো, আমি তাকে ফায়সালা করার শক্তি ও জ্ঞান দান করলাম।[২০] এভাবে আমি নেক লোকদেরকে প্রতিদান দিয়ে থাকি।

১৬. বাইবেলে এ ব্যক্তির নাম লেখা হয়েছে "পোটীফর"। সামনের দিকে গিয়ে কুরআন মজীদ একে "আযীয" নামে উল্লেখ করেছে। তারপর আবার এক জায়গায় হযরত ইউসুফের জন্যও এ উপাধি ব্যবহার করা হয়েছে। এ থেকে জানা যায়, তিনি ছিলেন মিসরের কোন বড় অফিসার অথবা পদমর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তি। কারণ "আযীয" মানে হচ্ছে এমন কর্তৃত্ব সম্পন্ন ব্যক্তি যার ক্ষমতাকে প্রতিহত করা যেতে পারে না। বাইবেল ও তালমূদের বর্ণনা হচ্ছে, তিনি ছিলেন বাদশাহর রক্ষক সেনাপতি (দেহরক্ষী বাহিনীর প্রধান)। ইবনে জারীর হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে রেওয়ায়াত করেছেন যে, তিনি ছিলেন রাজকীয় অর্থ বিভাগের প্রধান।

১৭. তালমূদে এ মহিলাটিকে যালীখা (Zelicha) নামে উল্লেখ করা হয়েছে। এখান থেকেই এ নামটি মুসলমানদের বর্ণনায় প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। কিন্তু আমাদের এখানে সাধারণভাবে প্রচলিত হয়ে গেছে যে, পরবর্তীকালে হযরত ইউসুফের সাথে মহিলাটির বিয়ে হয়ে যায়। একথাটির আসলে কুরআনে বা ইসরাঈলী ইতিহাসে কোন ভিত্তি নেই। একজন নবী এমন একটি মহিলাকে বিয়ে করবেন যার অসতিপনা তাঁর নিজের অভিজ্ঞতায়ই ধরা পড়েছে—এটা আসলে তাঁর নবী সুলভ মর্যাদার তুলনায় অনেক

নিম্নমানের। কুরআন মজীদে এ ব্যাপারে যে সাধারণ নিয়ম বর্ণনা করা হয়েছে তা হচ্ছে এই যে ঃ

اَلْخَبِيْثٰتُ لِلْخَبِيْثِيْنَ وَالْخَبِيْثُوْنَ لِلْخَبِيْثٰتِ وَالطَّيِّبٰتُ لِلطَّيِّبِيْنَ وَالطَّيِّبُوْنَ لِلطَّيِّبٰتِ –

"অসৎ মেয়েরা অসৎ পুরুষদের জন্য এবং অসৎ পুরুষরা অসৎ মেয়েদের জন্য আর পবিত্র মেয়েরা পবিত্র পুরুষদের জন্য এবং পবিত্র পুরুষরা পবিত্র মেয়েদের জন্য।"

১৮. তালমূদের বর্ণনামতে এ সময় হযরত ইউসুফের বয়স ছিল ১৮ বছর। পোটীফর তাঁর গাম্ভীর্যপূর্ণ ব্যক্তিত্ব দেখে বুঝতে পেরেছিলেন যে, এ যুবক গোলাম নয় বরং কোন অভিজাত পরিবারের আদরের দুলাল এবং অবস্থার আবর্তন তাকে এখানে টেনে এনেছে। তাকে কেনার সময়ই তিনি সওদাগরদের বলেন ঃ এ ছেলে তো কোন গোলাম বলে মনে হচ্ছে না, আমার সন্দেহ হচ্ছে তোমরা একে কোথাও থেকে চুরি করে এনেছো এ কারণে পোটীফর তাঁর সাথে দাস সুলভ ব্যবহার করেননি। বরং তাঁর ওপর নিজের গৃহের এবং নিজের যাবতীয় সম্পদ–সম্পত্তি পরিচালনার একচ্ছত্র দায়িত্ব অর্পণ করেন। বাইবেলের বর্ণনা মতে "তিনি নিজের সবকিছু ইউসুফের হাতে ছেড়ে দেন এবং শুধুমাত্র খাবার রুটি টুকু ছাড়া নিজের আর কোন জিনিসেরই তাঁর খবর ছিল না।" (আদি পুস্তক ৩৯ঃ৬)

১৯. এ পর্যন্ত হযরত ইউসুফের জীবন গড়ে উঠেছিল বিজন মরু প্রান্তরে আধা যাযাবর ও পশুপালকদের পরিবেশে। কেনান ও উত্তর আরব এলাকায় সে সময় কোন সংগঠিত রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা ছিল না এবং সেখানকার সমাজ–সংস্কৃতিও তেমন কোন বড় ধরনের উন্নতি লাভ করেনি। সেখানে ছিল কিছুসংখ্যক স্বাধীন উপজাতির বাস। তারা মাঝে মাঝে এক এলাকা ছেড়ে অন্য এলাকায় গিয়ে বসবাস করতো। আবার কোন কোন উপজাতি বিভিন্ন এলাকায় স্থায়ী বসতি গড়ে তুলে নিজেদের ছোট ছোট রাষ্ট্রও গঠন করে নিয়েছিল। মিসরের পার্শ্ববর্তী এলাকায় বসবাসকারী এসব লোকের অবস্থা ছিল প্রায় উপমহাদেশের উত্তর–পশ্চিম সীমান্ত এলাকায় বসবাসরত স্বাধীন পাঠান উপজাতিদের মতো। এখানে হযরত ইউসুফ যে শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ লাভ করেছিলেন তাতে অবশ্যই অন্তরভুক্ত ছিল বেদুইন জীবনের সৎগুণাবলী এবং ইবরাহিমী পরিবারের আল্লাহমুখী জীবন চিন্তা ও ধর্মচর্চা। কিন্তু মহান আল্লাহ সমসাময়িক বিশ্বের সবচেয়ে সুসভ্য ও উন্নত দেশ অর্থাৎ মিসরে তাঁর মাধ্যমে যে কাজ নিতে চাচ্ছিলেন এবং এ জন্য যে পর্যায়ের জানাশোনা, অভিজ্ঞতা ও গভীর অন্তরদৃষ্টির প্রয়োজন ছিল তার বিকাশ সাধনের কোন সুযোগ বেদুইন জীবনে ছিল না। তাই আল্লাহ তাঁর সর্বময় ক্ষমতাবলে তাঁকে মিসর রাজের একজন বড় সরকারী কর্মচারীর কাছে পৌঁছিয়ে দিলেন। আর তিনি তাঁর অসাধারণ যোগ্যতা দেখে তাঁকে নিজের গৃহ ও ভূসম্পত্তির দেখাশোনা ও পরিচালনার একচ্ছত্র কর্তৃত্ব দান করলেন। এভাবে ইতিপূর্বে তাঁর যেসব যোগ্যতাকে কোন কাজে লাগানো হয়নি তা পূর্ণ বিকাশ লাভ করার সুযোগ পেয়ে গেলো। ছোট্ট একটি জমিদারী পরিচালনার মাধ্যমে তিনি যে অভিজ্ঞতা লাভ করলেন তা আগামীতে একটি বড় রাষ্ট্রের আইন শৃংখলা ব্যবস্থা পরিচালনার জন্য প্রয়োজন ছিল। এ আয়াতে এ বিষয়টির দিকে ইংগিত করা হয়েছে।

وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَنْ نَّفْسِهِ وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ ۚ قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوَايَ ۖ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ ﴿٢٣﴾ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ ۖ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَّأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ ۚ كَذَٰلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ ۚ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ ﴿٢٤﴾

যে মহিলাটির ঘরে সে ছিল সে তাকে নিজের দিকে আকর্ষণ করতে থাকলো এবং একদিন সে দরজা বন্ধ করে দিয়ে বললো, "চলে এসো"। ইউসুফ বললো, "আমি আল্লাহর আশ্রয় নিচ্ছি, আমার রব তো আমাকে ভালই মর্যাদা দিয়েছেন (আর আমি এ কাজ করবো!)। এ ধরনের জালেমরা কখনো কল্যাণ লাভ করতে পারে না।"[২১] মহিলাটি তার দিকে এগিয়ে এলো এবং ইউসুফও তার দিকে এগিয়ে যেতো যদি না তার রবের জ্বলন্ত প্রমাণ প্রত্যক্ষ করতো।[২২] এমনটিই হলো, যাতে আমি তার থেকে অসৎবৃত্তি ও অশ্লীলতা দূর করে দিতে পারি।[২৩] আসলে সে ছিল আমার নির্বাচিত বান্দাদের অন্তরভুক্ত।

২০. কুরআনের ভাষায় সাধারণভাবে এমন শব্দের মানে হয় "নবুওয়াত দান করা।" ফায়সালা করার শক্তিকে কুরআনের মূল ভাষ্যে বলা হয়েছে "হুকুম"। এ হুকুম অর্থ কর্তৃত্বও হয়। কাজেই আল্লাহর পক্ষ থেকে কোন বান্দাকে হুকুম দান করার মানে হলো আল্লাহ তাঁকে মানব জীবনের বিভিন্ন বিষয়ে ফায়সালা দান করার যোগ্যতা দান করেছেন আবার এ জন্য ক্ষমতাও অর্পণ করেছেন। আর "জ্ঞান" বলতে এমন বিশেষ সত্যজ্ঞান বুঝানো হয়েছে যা নবীদেরকে অহীর মাধ্যমে সরাসরি দেয়া হয়।

২১. সাধারণভাবে মুফাস্সির ও অনুবাদকগণ মনে করে থাকেন, এখানে "আমার রব" তথা আমার প্রভু শব্দটি বলে হযরত ইউসুফ সেসময় যার অধীনে চাকরি করতেন তার কথা বলতে চেয়েছেন। তারা মনে করেন, তাঁর এ জবাবের অর্থ ছিল এই যে, আমার মনিব তো আমাকে খুব যত্নের সাথেই রেখেছেন, এ অবস্থায় আমি তার স্ত্রীর সাথে ব্যভিচার করার মতো নিমকহারামী কেমন করে করতে পারি? কিন্তু এ অনুবাদ ও ব্যাখ্যার আমি কঠোর বিরোধিতা করছি। যদিও আরবী ভাষার দিক দিয়ে এ অর্থ গ্রহণ করারও অবকাশ আছে, কারণ আরবীতে "রব" শব্দটি প্রভু অর্থে ব্যবহৃত হয়। কিন্তু একজন নবী একটি গুনাহ থেকে বিরত থাকার ব্যাপারে আল্লাহর পরিবর্তে কোন বান্দার প্রতি নজর দেবেন এটা তাঁর মর্যাদার তুলনায় অনেক নিম্নমানের। তাছাড়া কোন নবী আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে নিজের রব বলেছেন, কুরআনে এর কোন নজীরও নেই। সামনের দিকে ৪১, ৪২ ও ৫০ আয়াতে আমরা দেখছি হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালাম বারবার তাঁর নিজের ও মিসরীয়দের মতবাদের মধ্যে এ পার্থক্যটি সুস্পষ্ট করে তুলে ধরছেন যে, তাঁর রব হচ্ছেন

আল্লাহ এবং মিসরীয়রা বান্দাকে নিজেদের রব বানিয়ে রেখেছে। কাজেই এখানে আয়াতের শব্দের মধ্যে যখন এ অর্থ গ্রহণ করার অবকাশ রয়েছে যে, হযরত ইউসুফ "রব্বী" বলে আল্লাহর সত্তা বুঝাতে চেয়েছেন তখন কি কারণে আমরা এমন একটি অর্থ গ্রহণ করবো যার মধ্যে দোষের দিকটি সুস্পষ্টভাবে ফুটে ওঠে?

২২. মূল আয়াতে আছে "বুরহান।" বুরহান মানে দলীল বা প্রমাণ। রবের প্রমাণ মানে রবের দেখিয়ে দেয়া বা বুঝিয়ে দেয়া এমন প্রমাণ যার ভিত্তিতে হযরত ইউসুফের (আ) বিবেক তার ব্যক্তিসত্তার কাছ থেকে একথার স্বীকৃতি আদায় করেছে যে, এ নারীর ভোগের আহবানে সাড়া দেয়া তার পক্ষে শোভনীয় নয়। এ প্রমাণটি কি ছিল? ইতিপূর্বে পিছনের বাক্যেই তা বলে দেয়া হয়েছে। অর্থাৎ সেখানে বলা হয়েছে ঃ "আমার রব তো আমাকে ভালই মর্যাদা দিয়েছেন আর আমি এমন খারাপ কাজ করবো। এ ধরনের জালেমরা কখনো কল্যাণ লাভ করতে পারে না।" এ অকাট্য যুক্তিই হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালামকে সদ্যোন্মিত যৌবনকালের এ সংকট সন্ধিক্ষণে পাপ কাজ থেকে বিরত রেখেছিল। তারপর বলা হলো, "ইউসুফও তার দিকে এগিয়ে যেতো যদি না তার রবের জ্বলন্ত প্রমাণ প্রত্যক্ষ করতো।" এ থেকে নবীগণের নিষ্পাপ হবার (ইস্‌মতে আম্বিয়া) তত্বের অন্তরনিহিত সত্য পুরোপুরি সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। নবীর নিষ্পাপ হবার মানে এ নয় যে, তাঁর গুনাহ, ভুল ও ত্রুটি করার ক্ষমতা ও সামর্থ ছিনিয়ে নেয়া হয়েছে, ফলে তাঁর দ্বারা গুনাহর কাজ সংঘটিত হতেই পারে না। বরং এর মানে হচ্ছে, নবী যদিও গুনাহ করার শক্তি রাখেন কিন্তু সমস্ত মানবিক গুণাবলী সম্পন্ন হওয়া এবং যাবতীয় মানবিক আবেগ, অনুভূতি, ইচ্ছা–প্রবণতা থাকা সত্ত্বেও তিনি এমন সদাচারী ও আল্লাহভীরু হয়ে থাকেন যে, জেনেবুঝে কখনো গুনাহ করার ইচ্ছা করেন না। তাঁর বিবেকের অভ্যন্তরে আল্লাহর এমন সব শক্তিশালী দলীল প্রমাণ তিনি রাখেন যেগুলোর মোকাবিলায় প্রবৃত্তির কামনা বাসনা কখনো সফলকাম হবার সুযোগ পায় না। আর যদি সজ্ঞানে তিনি কোন ত্রুটি করেই বসেন তাহলে মহান আল্লাহ তখনই সুস্পষ্ট অহীর মাধ্যমে তা সংশোধন করে দেন। কারণ তাঁর পদস্খলন শুধুমাত্র এক ব্যক্তির পদস্খলন নয় বরং সমগ্র উম্মতের পদস্খলনের রূপ নেয়। তিনি সঠিক পথ থেকে এক চুল পরিমাণ সরে গেলে সারা দুনিয়া গোমরাহীর পথে মাইলের পর মাইল চলে যায়।

২৩. এ উক্তির দু'টি অর্থ হতে পারে। এক, তার রবের প্রমাণ দেখা ও গুনাহ থেকে রক্ষা পাওয়া আমার দেয়া সুযোগ ও পথপ্রদর্শনের মাধ্যমেই সম্ভব হয়েছে। কেননা, আমি নিজের এ নির্বাচিত বান্দাটি থেকে অসৎবৃত্তি ও অশ্লীলতা দূর করতে চাচ্ছিলাম। এর দ্বিতীয় অর্থ এও হতে পারে এবং এটি অত্যন্ত গভীর অর্থবোধক যে, ইউসুফের সাথে এই যে ব্যাপারটি ঘটে গেলো এটি আসলে তার প্রশিক্ষণ পর্বের একটি প্রয়োজনীয় পর্যায় ছিল। তাঁকে অসৎ প্রবণতা ও অশ্লীলতা মুক্ত করার এবং তাঁর আত্মিক পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতাকে পূর্ণতার পর্যায়ে পৌঁছিয়ে দেবার জন্য আল্লাহর নিয়ম অনুযায়ী অপরিহার্য ছিল যে, তাঁর সামনে গুনাহের এমনি একটি সংকটময় পরিস্থিতি আসুক এবং সেই পরীক্ষার সময় তিনি নিজের সমগ্র ইচ্ছাশক্তিকে তাকওয়া ও আল্লাহভীতির পাল্লায় রেখে দিয়ে নিজের নফ্‌সের অসৎ প্রবণতাগুলোকে চিরকালের জন্য চূড়ান্তভাবে পরাজিত করুন। বিশেষ করে তদানীন্তন মিসরীয় সমাজে যে নৈতিক পরিবেশ বিরাজিত ছিল তা দৃষ্টি সমক্ষে রাখলে এ

وَاسْتَبَقَا الْبَابَ وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِن دُبُرٍ وَأَلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ ۚ قَالَتْ مَا جَزَاءُ مَنْ أَرَادَ بِأَهْلِكَ سُوءًا إِلَّا أَن يُسْجَنَ أَوْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٢٥﴾ قَالَ هِيَ رَاوَدَتْنِي عَن نَّفْسِي ۚ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا إِن كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن قُبُلٍ فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ الْكَاذِبِينَ ﴿٢٦﴾ وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ ﴿٢٧﴾

শেষ পর্যন্ত ইউসুফ ও সে আগেপিছে দরজার দিকে দৌড়ে গেলো এবং সে পেছন থেকে ইউসুফের জামা (টেনে ধরে) ছিঁড়ে ফেললো। উভয়েই দরজার ওপর তার স্বামীকে উপস্থিত পেলো। তাকে দেখতেই মহিলাটি বলতে লাগলো, "তোমার পরিবারের প্রতি যে অসৎ কামনা পোষণ করে তার কি শাস্তি হতে পারে? তাকে কারাগারে প্রেরণ করা অথবা কঠোর শাস্তি দেয়া ছাড়া আর কি শাস্তি দেয়া যেতে পারে?" ইউসুফ বললো, "সে-ই আমাকে ফাঁসাবার চেষ্টা করছিল।" "মহিলাটির নিজের পরিবারের একজন (পদ্ধতিগত) সাক্ষ দিল,[২৪] "যদি ইউসুফের জামা সামনের দিক থেকে ছেঁড়া থাকে তাহলে মহিলাটি সত্য কথা বলেছে এবং সে মিথ্যুক আর যদি তার জামা পেছনের দিক থেকে ছেঁড়া থাকে তাহলে মহিলাটি মিথ্যা কথা বলেছে এবং সে সত্যবাদী।"[২৫]

বিশেষ প্রশিক্ষণ পদ্ধতি অবলম্বন করার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা সহজেই উপলব্ধি করা যাবে। সামনের দিকে চতুর্থ রুকূতে এ পরিবেশের একটি সামান্যতম নমুনা দেখানো হয়েছে। এ থেকে অনুমান করা যাবে, তৎকালীন 'সুসভ্য মিসরে' সাধারণভাবে এবং বিশেষ করে সে দেশের উচ্চ শ্রেণীতে স্বাধীন যৌনাচারিতা প্রায় বর্তমান যুগে পাশ্চাত্য দেশসমূহে এবং আমাদের দেশের ফিরিংগী প্রভাবিত সমাজের সমমানে অবস্থান করছিল। এ ধরনের বিকৃত রুচিসম্পন্ন লোকদের মধ্যে হযরত ইউসুফকে কাজ করতে হবে। এ কাজ করতে হবে একজন সাধারণ লোক হিসেবে নয় বরং দেশের শাসনকর্তা হিসেবে। এখন একথা সুস্পষ্ট যে, একজন সুন্দর ও সুশ্রী গোলামের জন্য যেসব ভদ্র মহিলা নিজেদেরকে এভাবে বিলীন করে দিচ্ছিল তারা একজন যুবক বয়সের সুদর্শন শাসনকর্তাকে পথভ্রষ্ট করার ও ফাঁদে ফেলার জন্য কত কী–ইনা করতে পারতো। আল্লাহ এরি পথ বন্ধ করার জন্য এ পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন যে, প্রথমেই এ পরীক্ষার মধ্য দিয়ে অগ্রসর করিয়ে হযরত ইউসুফকে পাকাপোক্ত করে দিয়েছেন তারপর অন্যদিকে মিসরীয় মহিলাদেরকেও তাঁর ব্যাপারে হতাশ করে দিয়ে তাদের সমস্ত ছলনা ও কারসাজির দরজা বন্ধ করে দিয়েছেন।

فَلَمَّا رَاٰ قَمِيْصَهٗ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ قَالَ اِنَّهٗ مِنْ كَيْدِكُنَّ ۭ اِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيْمٌ ۝٢٨ يُوْسُفُ اَعْرِضْ عَنْ هٰذَا ٚ وَاسْتَغْفِرِيْ لِذَنْۢبِكِ ښ اِنَّكِ كُنْتِ مِنَ الْخٰطِــِٕيْنَ ۝٢٩

স্বামী যখন দেখলো ইউসুফের জামা পেছনের দিক থেকে ছেঁড়া তখন সে বললো, "এসব তোমাদের মেয়েলোকদের ছলনা। সত্যিই বড়ই ভয়ানক তোমাদের ছলনা! হে ইউসুফ! এ ব্যাপারটি উপেক্ষা করো। আর হে নারী! তুমি নিজের অপরাধের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করো, তুমিই আসল অপরাধী।"২৫ (ক)

২৪. এ ব্যাপারটি মনে হয় এভাবে ঘটে থাকবে যে, গৃহকর্তার সাথে সংশ্লিষ্ট মহিলার আত্মীয়দের মধ্য থেকে কোন ব্যক্তিও আসছিল। সে এ ঝগড়া শুনে হয়তো বলেছে ঃ এরা দু'জনেই যখন পরস্পরের প্রতি দোষারোপ করছে এবং উপস্থিত ঘটনার কোন সাক্ষীও নেই তখন পরিবেশগত সাক্ষের সূত্র ধরে বিষয়টি সম্পর্কে এভাবে অনুসন্ধান চালানো যেতে পারে। কোন কোন বর্ণনায় বলা হয়েছে, একটি দুগ্ধপোষ্য শিশু এ সাক্ষ পেশ করেছিল। শিশুটি ঐ ঘরে দোলনায় শায়িত ছিল। আল্লাহ তাকে বাকশক্তি দান করে তার মুখ দিয়ে এ সাক্ষের কথা উচ্চারণ করিয়েছিলেন। কিন্তু এ বর্ণনাটি কোন নির্ভুল সনদের মাধ্যমে প্রমাণিত নয়। আর তাছাড়া এ ব্যাপারে অযথা মু'জিযার সাহায্য নেয়ার কোন প্রয়োজন অনুভূত হয় না। সাক্ষদাতা যে পরিবেশগত সাক্ষের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে তা ছিল যথার্থই যুক্তিসংগত ব্যাপার। এ সাক্ষের প্রতি দৃষ্টি দিলে এক মুহূর্তেই বুঝা যায় যে, এ ব্যক্তি অতীব বিচক্ষণ, সূক্ষ্মদর্শী ও ব্যাপকতর অভিজ্ঞতার অধিকারী ছিল। ঘটনার চিত্র তার সামনে এসে যেতেই সে তার গভীরে পৌঁছে গেছে। বিচিত্র নয় যে, উল্লেখিত ব্যক্তি কোন বিচারপতি বা ম্যাজিস্ট্রেট হতে পারে। (উল্লেখ থাকে, মুফাস্সিরগণ দুগ্ধপোষ্য শিশুর সাক্ষদানের যে বর্ণনা উপস্থাপন করেছেন তা ইহুদী বর্ণনা থেকে গৃহীত হয়েছে। দেখুন, তালমূদের নির্বাচিত অংশ, পল ইসহাক হিরশূন, লণ্ডন ১৮৮০, ২৫৬ পৃষ্ঠা)

২৫. এর মানে হচ্ছে, ইউসুফের কাপড় যদি সামনের দিক থেকে ছেঁড়া থাকে তাহলে ইউসুফের পক্ষ থেকে উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছিল এবং মহিলাটি নিজেকে বাঁচাবার জন্য ধস্তাধস্তিতে লিপ্ত হয়েছিল, এটা হবে তার স্পষ্ট আলামত। কিন্তু যদি ইউসুফের কাপড় পেছনের দিক থেকে ছেঁড়া থাকে তাহলে স্পষ্ট বুঝতে হবে, মহিলাটি তার পেছনে লেগেছিল এবং ইউসুফ তার হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্য প্রচেষ্টা চালাচ্ছিল। এ ছাড়াও আর একটি বাস্তব সাক্ষও এ সাক্ষের মধ্যে লুকিয়েছিল। সেটি হচ্ছে, এ সাক্ষী শুধুমাত্র ইউসুফ আলাইহিস সালামের কাপড়ের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়েছে। এ থেকে একথা

পরিষ্কার হয়ে গেছে যে, মহিলাটির শরীরে বা পোশাকে আদতে বল প্রয়োগের কোন আলামতই ছিল না। অথচ যদি এটা বলাৎকারজনিত মামলা হতো তাহলে মহিলাটির শরীরে ও পোশাকে এর পরিষ্কার আলামত দেখা যেতো।

২৫(ক). বাইবেলে এ কাহিনীকে যে কদাকাররূপে চিত্রিত করা হয়েছে নিচের বর্ণনায় তা দেখা যেতে পারে ঃ

"তখন সে যোসেফের বস্ত্র ধরিয়া বলিল, আমার সহিত শয়ন কর ; কিন্তু যোসেফ তাহার হস্তে আপন বস্ত্র ফেলিয়া রাখিয়া বাহিরে পলাইয়া গেলেন। তখন যোসেফ তাহার হস্তে বস্ত্র ফেলিয়া রাখিয়া বাহিরে পলাইলেন দেখিয়া, সে নিজ ঘরের লোকদিগকে ডাকিয়া কহিল, দেখ তিনি আমাদের সাথে ঠাট্টা করিতে একজন ইব্রীয় পুরুষকে আনিয়াছেন, সে আমার সংগে শয়ন করিবার জন্য আমার নিকটে আসিয়াছিল, তাহাতে আমি চীৎকার করিয়া উঠিলাম, আমার চীৎকার শুনিয়া সে আমার নিকটে নিজ বস্ত্রখানি ফেলিয়া বাহিরে পলাইয়া গেল। আর যে পর্যন্ত তাহার কর্তা ঘরে না আসিলেন, সে পর্যন্ত সেই স্ত্রীলোক তাঁহার বস্ত্র আপনার কাছে রাখিয়া দিল।....... তাঁহার প্রভু যখন আপন স্ত্রীর একথা শুনিলেন যে, " তোমার দাস আমার প্রতি এরূপ ব্যবহার করিয়াছে", তখন ক্রোধে প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিলেন। অতএব যোসেফের প্রভু তাঁহাকে লইয়া কারাগারে রাখিলেন, যে স্থানে রাজার বন্দিগণ বদ্ধ থাকিত।" (আদি পুস্তক ৩৯ঃ১২-২০)

এ অদ্ভুত বর্ণনার সংক্ষিপ্তসার হচ্ছে এই যে, হযরত ইউসুফ এমন ধরনের পোশাক পরেছিলেন যে, যুলাইখা তাতে হাত লাগাতেই সমস্ত পোশাকটাই খুলে তার হাতে এসে পড়লো! তারপর আরো মজার ব্যাপার হচ্ছে, হযরত ইউসুফ নিজে পোশাক তার কাছে রেখে দিয়ে একেবারে দিগম্বর হয়ে ভাগলেন এবং তাঁর পোশাক (অর্থাৎ তাঁর অপরাধের অনস্বীকার্য প্রমাণ) ঐ মহিলার কাছে রয়ে গেলো। এরপরে হযরত ইউসুফের অপরাধী হবার ব্যাপারে কোন সন্দেহের অবকাশ থাকতে পারে কি?

এতো গেলো বাইবেলের বর্ণনা। অন্যদিকে তালমূদের বর্ণনা হচ্ছে, পোটিফর যখন তার স্ত্রীর মুখ থেকে এ অভিযোগ শুনলেন তখন তিনি ইউসুফকে খুব মারধর করালেন। তারপর তার বিরুদ্ধে আদালতে মামলা দায়ের করলেন। আদালতে কর্মকর্তারা হযরত ইউসুফের পোশাক পরীক্ষা করে রায় দিল, "দোষ মহিলাটির, কারণ কাপড় সামনের দিক থেকে নয় বরং পেছনের দিক থেকে ছেঁড়া।" কিন্তু যে কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তি সামান্য চিন্তা করলেই একথাটি বুঝতে পারে যে, কুরআনের বর্ণনা তালমূদের বর্ণনা থেকে অনেক বেশী যুক্তিসংগত। একথা কেমন করে মেনে নেয়া যায় যে, এত বড় একজন মর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তি নিজের স্ত্রীর ওপর নিজের দাসের তথাকথিত চড়াও হবার মামলাটি নিজেই আদালতে নিয়ে গেছেন? এটি কুরআন ও ইসরাঈলী বর্ণনার মধ্যে পার্থক্যের একটি সুস্পষ্ট দৃষ্টান্ত। এ থেকে মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এ কাহিনীটি বনী ইসরাঈলদের থেকে শুনে বর্ণনা করেছেন বলে পশ্চিমী প্রাচ্যবিদরা যে অভিযোগ আনেন তার অন্তসারশূন্যতা সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। সত্যি কথা হচ্ছে, কুরআন তাদের বর্ণনা সংশোধন করেছে এবং সঠিক সত্য ঘটনাটিই দুনিয়াবাসীর সামনে তুলে ধরেছে।

وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي الْمَدِيْنَةِ امْرَاَتُ الْعَزِيْزِ تُرَاوِدُ فَتٰىهَا عَنْ نَّفْسِهٖ ۚ قَدْ شَغَفَهَا حُبًّا ۭ اِنَّا لَنَرٰىهَا فِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ۝ فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ اَرْسَلَتْ اِلَيْهِنَّ وَاَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَاً وَّاٰتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِّيْنًا وَّقَالَتِ اخْرُجْ عَلَيْهِنَّ ۚ فَلَمَّا رَاَيْنَهٗٓ اَكْبَرْنَهٗ وَقَطَّعْنَ اَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَاشَ لِلّٰهِ مَا هٰذَا بَشَرًا ۭ اِنْ هٰذَآ اِلَّا مَلَكٌ كَرِيْمٌ ۝ قَالَتْ فَذٰلِكُنَّ الَّذِيْ لُمْتُنَّنِيْ فِيْهِ ۭ وَلَقَدْ رَاوَدْتُّهٗ عَنْ نَّفْسِهٖ فَاسْتَعْصَمَ ۭ وَلَىِٕنْ لَّمْ يَفْعَلْ مَآ اٰمُرُهٗ لَيُسْجَنَنَّ وَلَيَكُوْنًا مِّنَ الصّٰغِرِيْنَ ۝

৪ রুকূ'

শহরের মেয়েরা পরস্পর বলাবলি করতে লাগলো।, "আযীযের স্ত্রী তার যুবক গোলামের পেছনে পড়ে আছে, প্রেম তাকে উন্মাদ করে দিয়েছে। আমাদের মতে সে পরিষ্কার ভুল করে যাচ্ছে।" সে যখন তাদের এ শঠতাপূর্ণ কথা শুনলো তখন তাদেরকে ডেকে পাঠালো। তাদের জন্য হেলান দিয়ে বসার মজলিসের আয়োজন করলো।[২৬] খাওয়ার বৈঠকে তাদের সবার সামনে একটি করে ছুরি রাখলো। (তারপর ঠিক সেই মুহূর্তে যখন তারা ফল কেটে কেটে খাচ্ছিল) সে ইউসুফকে তাদের সামনে বের হয়ে আসার ইশারা করলো। যখন ঐ মেয়েদের দৃষ্টি তার ওপর পড়লো, তারা বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে গেলো। এবং নিজেদের হাত কেটে ফেললো। তারা বললো, "আল্লাহর কী অপার মহিমা! এতো মানুষ নয়, এতো এক মহিমান্বিত ফেরেশ্‌তা।" আযীযের স্ত্রী বললো, " দেখলে তো! এ হলো সেই ব্যক্তি যার ব্যাপারে তোমরা আমার বিরুদ্ধে নিন্দাবাদ করতে। অবশ্যই আমি তাকে প্ররোচিত করার চেষ্টা করেছিলাম কিন্তু সে নিজেকে রক্ষা করেছে। যদি সে আমার কথা না মেনে নেয় তাহলে কারারুদ্ধ হবে এবং নিদারুণভাবে লাঞ্ছিত ও অপমানিত হবে।"[২৭]

২৬. অর্থাৎ এমন মজলিস যে মজলিসে মেহমানদের হেলান দিয়ে বসার জন্য বালিশ সাজানো ছিল। মিসরের প্রাচীন ধ্বংসাবশেষ ও প্রত্নতাত্ত্বিক আবিষ্কার থেকেও এর সত্যতার

قَالَ رَبِّ السِّجْنُ أَحَبُّ إِلَىَّ مِمَّا يَدْعُونَنِىٓ إِلَيْهِ ۖ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّى كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُن مِّنَ الْجَٰهِلِينَ ﴿٣٣﴾ فَاسْتَجَابَ لَهُۥ رَبُّهُۥ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ ۚ إِنَّهُۥ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿٣٤﴾

ইউসুফ বললো, "হে আমার রব! এরা আমাকে দিয়ে যে কাজ করাতে চাচ্ছে তার চাইতে কারাগারই আমার কাছে প্রিয়! আর যদি তুমি এদের চক্রান্ত থেকে আমাকে না বাঁচাও তাহলে আমি এদের ফাঁদে আটকে যাবো এবং অজ্ঞদের অন্তরভুক্ত হবো।[২৮] *—তার রব তার দোয়া কবুল করলেন এবং তাদের অপকৌশল থেকে তাকে রক্ষা করলেন।*[২৯] *অবশ্যি তিনি সবার কথা শোনেন এবং সবকিছু জানেন।*

প্রমাণ পাওয়া গেছে। দেখা গেছে তাদের মজলিসে মহফিলে বালিশের ব্যাপক ব্যবহার ছিল।

বাইবেলে এ ভোজসভার কোন উল্লেখ নেই। তবে তালমূদে এ ঘটনাটি বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু তার বর্ণনাধারা কুরআন থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। কুরআনের বর্ণনায় যে জীবন জোয়ার, যে প্রাণশক্তি, স্বাভাবিকতা ও উন্নত নৈতিকতার প্রমাণ পাওয়া যায় তালমূদে তার সামান্যতম স্পর্শও নেই।

২৭. এ থেকে তদানীন্তন মিসরের উচ্চ ও অভিজাত সমাজে নৈতিকতার অবস্থা কোথায় গিয়ে ঠেকেছিল তা অনুমান করা যায়। একথা সুস্পষ্ট, আযীযের স্ত্রী যেসব মহিলাকে দাওয়াত দিয়েছিল তারা নিশ্চয়ই নগরের আমীর–উমরাহ ও বড় বড় সরকারী কর্মকর্তাদের বেগমরাই ছিল। এসব উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন ভদ্র মহিলার সামনে সে নিজের প্রিয় যুবককে পেশ করলো। তার সুদর্শন যৌবনোদ্ভিন্ন দেহ সুষমা দেখিয়ে সে তাদের কাছ থেকে এ স্বীকৃতি আদায় করতে চাইলো যে, এমন সুন্দর যুবকের জন্য যদি আমি পাগল না হয়ে যাই তাহলে আর কী হবো। তারপর এসব পদস্থ ব্যক্তিবর্গের স্ত্রী–কন্যারা নিজেদের কাজের মাধ্যমে যেন একথার সত্যতা প্রমাণ করলো যে, সত্যিই এ ধরনের অবস্থায় তাদের প্রত্যেকেই ঠিক তাই করতো যা আযীযের স্ত্রী করেছে। আবার অভিজাত মহিলাদের এ ভরা মজলিসে মেজবান সাহেবা প্রকাশ্যে এ সংকল্প ঘোষণা করতে একটুও লজ্জা অনুভব করলো না যে, যদি এ সুন্দর যুবক তার কামনার ক্রীড়নক হতে রাযি না হয় তাহলে সে তাকে কারাগারে পাঠিয়ে দেবে। এ সবকিছুই একথা প্রমাণ করে যে, ইউরোপ ও আমেরিকা এবং তাদের প্রাচ্যদেশীয় অন্ধ অনুসারীরা আজ যে নারী স্বাধীনতা এবং নারীদের অবাধ বিচরণ ও মেলামেশাকে বিংশ শতাব্দীর প্রগতিশীলতার অবদান মনে করে থাকে তা আসলে কোন নতুন জিনিস নয়, অনেক পুরাতন, প্রাচীন জিনিস। অতি প্রাচীনকালে দাকিয়ানুসের শাসনেরও বহুশত বছর আগে মিসরে ঠিক একই রকম শানশওকতের সাথে এর প্রচলন ছিল যেমন আজকের এ "প্রগতিশীলতার" যুগে আছে।

২৮. সে সময় হযরত ইউসুফ যেসব অবস্থার সম্মুখীন হয়েছিলেন এ আয়াতগুলো আমাদের সামনে তার একটি অদ্ভুত চিত্র তুলে ধরেছে। উনিশ বিশ বছরের একটি সুন্দর যুবক। বেদুইন জীবনের উদ্দামতায় লালিত বলিষ্ঠ ও সুঠাম দেহী। আত্মীয়–স্বজন থেকে বিচ্ছিন্ন প্রবাস জীবন, দেশান্তর ও বলপূর্বক দাসত্বের পর্যায় অতিক্রম করার পর ভাগ্য তাকে দুনিয়ার বৃহত্তম সুসভ্য রাষ্ট্রের রাজধানীতে একজন উচ্চ রাষ্ট্রীয় পদমর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তির বাড়িতে টেনে এনেছে। এখানে এ বাড়ির যে বেগম সাহেবার সাথে সকাল বিকাল তাকে ওঠাবসা করতে হয় সে–ই প্রথমে তার পেছনে লাগে। তারপর তার সৌন্দর্যের আলোচনা ছড়িয়ে পড়ে সমগ্র রাষ্ট্রে। সারা শহরের অভিজাত পরিবারের মেয়েরা তার প্রেমে হাবুডুবু খেতে থাকে। এখন তার চতুর্দিকে সর্বত্র সবসময় শত শত সুন্দর জাল বিছানো থাকে তাকে আটকাবার জন্য। তার ভাবাবেগকে উসকিয়ে দেবার এবং তার ধার্মিকতাকে ভেঙ্গে টুকরো টুকরো করার জন্য সব ধরনের কৌশল ও ফন্দি আঁটা হতে থাকে। তিনি যেদিকে যান সেদিকেই দেখতে পান পাপ তার সমস্ত চাকচিক্য ও মোহনীয়তা নিয়ে দরজা উন্মুক্ত করে তাঁর অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে আছে। অনেকে অসৎ ও অশালীন কার্যকলাপ করার জন্য সুযোগ খুঁজতে থাকে। কিন্তু এখানে সুযোগই তাকে খুঁজে ফিরছে এবং সবসময় ওঁৎ পেতে আছে যখনই তার মনে অসৎকাজের প্রতি সামান্যতম ঝোঁকপ্রবণতা দেখা দেবে তখনই সে তার সামনে নিজেকে পেশ করে দেবে। দিনরাত চব্বিশ ঘন্টা তিনি এক মহা আতংকের মধ্যে জীবন যাপন করছেন। কখনো মাত্র এক লহমার জন্য যদি তাঁর ইচ্ছা ও সংকল্পের বাঁধন সামান্যতম ঢিলে হয়ে যায় তাহলে পাপের যে অসংখ্য দরজা তার অপেক্ষায় হরহামেশা খোলা আছে তার যে কোন একটির মধ্য দিয়ে তিনি ভেতরে পবেশ করে যেতে পারেন। এ অবস্থায় এ আল্লাহ বিশ্বাসী যুবক যে সাফল্যের সাথে এসব শয়তানী প্ররোচনার মোকাবিলা করেছেন তা এমনিতেই কম প্রশংসনীয় নয়। কিন্তু এ সর্বোচ্চ মানের আত্মসংযমের পরিচয় দেয়ার পর আত্মোপলব্ধি ও চিন্তার বিশুদ্ধতারও তিনি চরম পরাকাষ্ঠা দেখিয়েছেন। এমন নজীরবিহীন পরহেজগারীর দৃষ্টান্ত স্থাপনের পরও তাঁর মনে কখনো এ মর্মে অহমিকা জাগেনি যে, "বাহ, কত মজবুত আমার চরিত্র! এতো সুন্দরী ও যুবতী মেয়েরা আমার প্রেমে পাগলপারা কিন্তু এরপরও আমার পদস্খলন হয়নি।" বরং এর পরিবর্তে তিনি নিজের মানবিক দুর্বলতার কথা চিন্তা করে ভয়ে কেঁপে উঠেছেন এবং অত্যন্ত দীনতার সাথে আল্লাহর কাছে সাহায্যের জন্য আবেদন জানিয়ে বলেছেন, হে আমার রব! আমি একজন দুর্বল মানুষ। এ অসংখ্য অগণিত প্ররোচণার মোকাবিলা করার শক্তি আমার কোথায়! তুমি আমাকে সহায়তা দান করো এবং আমাকে বাঁচাও। আমি ভয় করছি আমার পা পিছলে না যায়—আসলে এটি হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালামের নৈতিক প্রশিক্ষণের একটি গুরুত্বপূর্ণ ও সংকটময় অধ্যায় ছিল। বিশ্বস্ততা, আমানতদারী, চারিত্রিক নিষ্কলুষতা, সত্যনিষ্ঠা, অকপটতা, সংযম ও চিন্তার ভারসাম্যের অসাধারণ গুণাবলী এ পর্যন্ত তাঁর মধ্যে সুপ্ত ছিল এবং এ সম্পর্কে তিনি নিজেও বেখবর ছিলেন। এ কঠোর পরীক্ষার যুগে এ গুণগুলো সবই তাঁর মধ্যে বিকশিত হয়ে উঠলো। এগুলো পূর্ণ শক্তিতে কাজ করতে থাকলো। তিনি নিজেও জানতে পারলেন তাঁর মধ্যে কোন্ কোন্ শক্তি আছে এবং তাদেরকে তিনি কোন্ কোন্ কাজে লাগাতে পারেন।

ثُمَّ بَدَا لَهُمْ مِّنْ بَعْدِ مَا رَاَوُا الْاٰيٰتِ لَيَسْجُنُنَّهٗ حَتّٰى حِيْنٍ ﴿٣٥﴾

তারপর তারা মনে করলো একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য তাকে কারারুদ্ধ করতে হবে, অথচ তারা (তার নিষ্কলুষতা এবং নিজেদের স্ত্রীদের অসতিপনার) সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলী দেখে নিয়েছিল।[৩০]

২৯. রক্ষা করা এ অর্থে যে, ইউসুফ আলাইহিস সালামের সৎচরিত্রকে এমন শক্তিমত্তা ও দৃঢ়তা দান করা হয় যার ফলে তার মোকাবিলায় সংশ্লিষ্ট নারী সমাজের সমস্ত অপকৌশলই ব্যর্থ হয়ে গেছে। তাছাড়া এ অর্থেও রক্ষা করা যে, আল্লাহর ইচ্ছায় কারাগারের দরজা তাঁর জন্য খুলে দেয়া হয়।

৩০. এভাবে হযরত ইউসুফকে কারাগারে নিক্ষেপ করা আসলে তাঁর নৈতিক বিজয় এবং মিসরের সমগ্র অভিজাত ও শাসক সমাজের চূড়ান্ত নৈতিক পরাজয়ের ঘোষণা ছিল। হযরত ইউসুফ তখন কোন অজ্ঞাতনামা ও অপরিচিত লোক ছিলেন না। সারাদেশে এবং কমপক্ষে তো রাজধানী নগরীতে বিশেষ ও সাধারণ সব মহলেই তিনি পরিচিতি লাভ করেছিলেন। যে ব্যক্তির আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্বের প্রতি দু'–একটি নয়, অধিকাংশ অভিজাত পরিবারের মহিলারা প্রণয়াসক্ত এবং যার মনমাতানো ও চোখ ধাঁধানো সৌন্দর্যের তীব্র আকর্ষণে নিজেদের দাম্পত্য জীবন ধ্বংস হতে দেখে মিসরের শাসকরা তাকে কারাগারে নিক্ষেপ করেই নিজেদের ঘর–দোর সামলাবার ব্যবস্থা করেছিল। এহেন ব্যক্তিত্ব কখনো লোকচক্ষুর অন্তরালে লুকিয়ে থাকতে পারে না, একথা সহজেই অনুমান করা যায়। নিশ্চয়ই প্রতি ঘরে তাঁর কথা আলোচিত হতো। সাধারণভাবেও লোকেরা নিশ্চয়ই তাঁর অসাধারণ উন্নত, শক্তিশালী ও পবিত্র চরিত্রের কথা জেনে গিয়েছিল। তারা জেনেছিল, এ ব্যক্তিকে তার কোন অপরাধের কারণে কারাগারে পাঠানো হয়নি বরং মিসরের অভিজাত লোকেদের জন্য নিজেদের স্ত্রী–কন্যাদেরকে নিয়ন্ত্রণের মধ্যে রাখার পরিবর্তে এ নিরপরাধকে কারগারে পাঠানো সহজ ছিল বলেই তাকে কারাগারে পাঠানো হয়েছে।

এ থেকে একথাও জানা গেলো, কোন ব্যক্তিকে ইনসাফের শর্ত অনুযায়ী আদালতে অপরাধী প্রমাণ না করেই খেয়ালখুশীমত গ্রেফতার করে কারাগারে পাঠিয়ে দেয়া বেঈমান শাসকদের পুরাতন রীতি। এ ব্যাপারেও আজকের শয়তানরা চার হাজার বছর আগের শয়তানদের থেকে খুব বেশী ভিন্নতর নয়। ফারাক কেবল এতটুকুই, তারা "গণতন্ত্রের" নাম নিত না আর এরা নিজেদের কার্যকলাপের সাথে গণতন্ত্রের নাম নেয়। তারা কোন আইন ছাড়াই বেআইনী কার্যকলাপ করতো। আর এরা প্রত্যেকটি অবৈধ অন্যায় কাজের জন্য প্রথমে একটি "আইন" তৈরী করে নেয়। তারা পরিষ্কারভাবে নিজেদের স্বার্থ উদ্ধারের জন্য মানুষের ওপর জুলুম অত্যাচার করতো আর এরা যার ওপর জুলুম নির্যাতন চালায় তার সম্পর্কে দুনিয়াবাসীকে বুঝাবার চেষ্টা করে যে, তার কারণে তার নিজের নয় বরং দেশ ও জাতির জন্য আশংকা দেখা দিয়েছিল। মোটকথা, তারা শুধু জালেম ছিল কিন্তু এরা সেই সাথে মিথ্যুক এবং নির্লজ্জও।

وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيٰنِ ۚ قَالَ اَحَدُهُمَآ اِنِّيْٓ اَرٰىنِيْٓ اَعْصِرُ خَمْرًا ۚ
وَقَالَ الْاٰخَرُ اِنِّيْٓ اَرٰىنِيْٓ اَحْمِلُ فَوْقَ رَاْسِيْ خُبْزًا تَاْكُلُ الطَّيْرُ مِنْهُ ۚ
نَبِّئْنَا بِتَاْوِيْلِهٖ ۚ اِنَّا نَرٰىكَ مِنَ الْمُحْسِنِيْنَ ﴿٣٦﴾ قَالَ لَا يَاْتِيْكُمَا طَعَامٌ
تُرْزَقٰنِهٖٓ اِلَّا نَبَّاْتُكُمَا بِتَاْوِيْلِهٖ قَبْلَ اَنْ يَّاْتِيَكُمَا ۚ ذٰلِكُمَا مِمَّا عَلَّمَنِيْ
رَبِّيْ ۚ اِنِّيْ تَرَكْتُ مِلَّةَ قَوْمٍ لَّا يُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَهُمْ بِالْاٰخِرَةِ هُمْ
كٰفِرُوْنَ ﴿٣٧﴾ وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ اٰبَآءِيْٓ اِبْرٰهِيْمَ وَاِسْحٰقَ وَيَعْقُوْبَ ۚ
مَا كَانَ لَنَآ اَنْ نُّشْرِكَ بِاللّٰهِ مِنْ شَيْءٍ ۚ ذٰلِكَ مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ عَلَيْنَا
وَعَلَى النَّاسِ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُوْنَ ﴿٣٨﴾

৫ রুকৃ'

কারাগারে[৩১] তার সাথে আরো দু'টি ভৃত্যও প্রবেশ করলো।[৩২] একদিন তাদের একজন তাকে বললো, "আমি স্বপ্নে দেখেছি আমি মদ তৈরী করছি।" অন্যজন বললো, "আমি দেখলাম আমার মাথায় রুটি রাখা আছে এবং পাখিরা তা খাচ্ছে।" তারা উভয়ে বললো, "আমাদের এর তা'বীর বলে দিন। আমরা আপনাকে সৎকর্মশীল হিসেবে পেয়েছি।"[৩৩] ইউসুফ বললো ঃ

"এখানে তোমরা যে খাবার পাও তা আসার আগেই আমি তোমাদের এ স্বপ্নগুলোর অর্থ বলে দেবো। আমার রব আমাকে যা দান করেছেন এ জ্ঞান তারই অন্তরভুক্ত। আসল ব্যাপার হচ্ছে, যারা আল্লাহর প্রতি ঈমান আনে না এবং আখেরাত অস্বীকার করে তাদের পথ পরিহার করে আমি আমার পিতৃপুরুষ ইবরাহীম, ইসহাক ও ইয়াকূবের পথ অবলম্বন করেছি। আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করা আমাদের কাজ নয়। আসলে এটা আমাদের এবং সমগ্র মানব জাতির প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ (যে, তিনি আমাদের তাঁর ছাড়া আর কারোর বান্দা হিসেবে তৈরী করেননি) কিন্তু অধিকাংশ লোক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না।

৩১. হযরত ইউসুফকে যখন কারাগারে পাঠানো হয়েছিল তখন সম্ভবত তাঁর বয়স বিশ একুশ বছরের বেশী ছিল না। তালমূদে বলা হয়েছে, কারাগার থেকে মুক্তি পেয়ে যখন

يٰصَاحِبَيِ السِّجْنِ ءَاَرْبَابٌ مُّتَفَرِّقُوْنَ خَيْرٌ اَمِ اللّٰهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ ﴿٣٩﴾ مَا تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِهٖٓ اِلَّآ اَسْمَآءً سَمَّيْتُمُوْهَآ اَنْتُمْ وَاٰبَآؤُكُمْ مَّآ اَنْزَلَ اللّٰهُ بِهَا مِنْ سُلْطٰنٍ ۭ اِنِ الْحُكْمُ اِلَّا لِلّٰهِ ۭ اَمَرَ اَلَّا تَعْبُدُوْٓا اِلَّآ اِيَّاهُ ۭ ذٰلِكَ الدِّيْنُ الْقَيِّمُ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿٤٠﴾

হে জেলখানার সাথীরা! তোমরা নিজেরাই ভেবে দেখো, ভিন্ন ভিন্ন বহু সংখ্যক রব ভালো, না এক আল্লাহ, যিনি সবার ওপর বিজয়ী।"

তাঁকে বাদ দিয়ে তোমরা যাদের বন্দেগী করছো তারা শুধুমাত্র কতকগুলো নাম ছাড়া আর কিছুই নয়, যে নামগুলো তোমরা ও তোমাদের পিতৃ-পুরুষরা রেখেছো, আল্লাহ এগুলোর পক্ষে কোন প্রমাণ পাঠাননি। শাসন কর্তৃত্ব আল্লাহ ছাড়া আর কারোর নেই। তাঁর হুকুম—তোমরা তাঁর ছাড়া আর কারোর বন্দেগী করবে না। এটিই সরল সঠিক জীবন পদ্ধতি, কিন্তু অধিকাংশ লোক জানে না।

তিনি মিসরের শাসনকর্তা হন তখন তাঁর বয়স ছিল তিরিশ বছর। এদিকে কুরআন বলছে, কারাগারে তিনি بضع سنين অর্থাৎ কয়েক বছর কাটান। بضع শব্দটি আরবী ভাষায় ১০ পর্যন্ত সংখ্যার জন্য বলা হয়ে থাকে।

৩২. হযরত ইউসুফের সাথে এই যে দু'জন গোলাম কারাগারে প্রবেশ করেছিল তাদের সম্পর্কে বাইবেলের বর্ণনা হচ্ছে, তাদের একজন ছিল মিসরের বাদশাহর মদ পরিবেশকদের সরদার এবং দ্বিতীয়জন রাজকীয় রুটি প্রস্তুতকারকদের অফিসার। তালমূদের বর্ণনা মতে, মিসরের বাদশাহ তাদের এ অপরাধে কারাগারে পাঠিয়েছিলেন যে, একবার এক দাওয়াতের মজলিসে পরিবেশিত রুটি একটু বিস্বাদ লেগেছিল এবং একটি মদের পাত্রে পাওয়া গিয়েছিল মাছি।

৩৩. কারাগারে হযরত ইউসুফকে কোন্ দৃষ্টিতে দেখা হতো এ থেকে তা আন্দাজ করা যেতে পারে। ওপরে যেসব ঘটনার কথা আলোচনা করা হয়েছে সেগুলো সামনে রাখলে ব্যাপারটা আর মোটেই বিস্ময়কর মনে হয় না যে, এ কয়েদী দুজন হযরত ইউসুফের কাছেই-বা এসে স্বপ্নের ব্যাখ্যা জিজ্ঞেস করলো কেন এবং তাঁকে "আমরা আপনাকে সদাচারী হিসেবে পেয়েছি" বলে শ্রদ্ধার্ঘ পেশ করলো কেন। জেলখানার ভেতরে বাইরে সবাই জানতো, এ ব্যক্তি কোন অপরাধী নয়, বরং একজন অত্যন্ত সদাচারী পুরুষ। কঠিনতম পরীক্ষায় তিনি নিজের আল্লাহভীতি ও আল্লাহর হুকুম মেনে চলার প্রমাণ পেশ করেছেন। আজ সারাদেশে তাঁর চেয়ে বেশী সৎব্যক্তি আর কেউ নেই। এমনকি দেশের ধর্মীয় নেতাদের মধ্যেও তাঁর মতো লোক একজনও নেই। এ কারণে শুধু কয়েদীরাই

يَصَاحِبَيِ السِّجْنِ اَمَّآ اَحَدُكُمَا فَيَسْقِىْ رَبَّهٗ خَمْرًاۚ وَاَمَّا الْاٰخَرُ فَيُصْلَبُ فَتَاْكُلُ الطَّيْرُ مِنْ رَّاْسِهٖؕ قُضِىَ الْاَمْرُ الَّذِىْ فِيْهِ تَسْتَفْتِيٰنِ ﴿٤١﴾ وَقَالَ لِلَّذِىْ ظَنَّ اَنَّهٗ نَاجٍ مِّنْهُمَا اذْكُرْنِىْ عِنْدَ رَبِّكَ٘ فَاَنْسٰىهُ الشَّيْطٰنُ ذِكْرَ رَبِّهٖ فَلَبِثَ فِى السِّجْنِ بِضْعَ سِنِيْنَ ﴿٤٢﴾

হে জেলখানার সাথীরা! তোমাদের স্বপ্নের তা'বীর হচ্ছে, তোমাদের একজন তার নিজের প্রভুকে (মিসর রাজ) মদ পান করাবে আর দ্বিতীয় জনকে শূলবিদ্ধ করা হবে এবং পাখি তার মাথা ছিঁড়ে ছিঁড়ে খাবে। তোমরা যে কথা জিজ্ঞেস করছিলে তার ফায়সালা হয়ে গেছে।[৩৪]

আবার তাদের মধ্য থেকে যার সম্পর্কে ধারণা ছিল যে, সে মুক্তি পাবে ইউসুফ তাকে বললো ঃ " তোমার প্রভুকে (মিসরের বাদশাহ) আমার কথা বলো।" কিন্তু শয়তান তাকে এমন গাফেল করে দিল যে, সে তার প্রভুকে (মিসরের বাদশাহ) তার কথা বলতে ভুলে গেলো। ফলে ইউসুফ কয়েক বছর কারাগারে পড়ে রইলো।[৩৫]

তাঁকে ভক্তি ও শ্রদ্ধার চোখে দেখতো না বরং কয়েদখানার পরিচালকবৃন্দ এবং কর্মচারীরাও তাঁর ভক্তদলে শামিল হয়ে গিয়েছিল। বাইবেলে বলা হয়েছে ঃ "কারারক্ষক কারাস্থিত সমস্ত বন্দির ভার যোসেফের হস্তে সমর্পণ করিলেন এবং তথাকার লোকদের সমস্ত কর্ম যোসেফের আজ্ঞা অনুসারে চলিতে লাগিল। কারারক্ষক তাঁহার হস্তগত কোন বিষয়ে দৃষ্টিপাত করিতেন না।" (আদি পুস্তক ৩৯ঃ ২২, ২৩)

৩৪. এখানে যে কাহিনীটি বর্ণনা করা হয়েছে এ ভাষণটি হচ্ছে তার প্রাণ। এটি কুরআনেরও তাওহীদ সম্পর্কিত সর্বোত্তম ভাষণগুলোর অন্যতম। কিন্তু বাইবেল ও তালমূদে কোথাও এ সম্পর্কে সামান্য ইংগিতও নেই। সেখানে হযরত ইউসুফকে নিছক একজন জ্ঞানী ও আল্লাহভীরু লোক হিসেবেই পেশ করা হয়েছে। কিন্তু কুরআন কেবল তাঁর চরিত্রের এ দিকগুলোকে বাইবেল ও তালমূদের চাইতে বেশী উজ্জ্বল করে পেশ করেছে তাই নয় বরং এ ছাড়াও আমাদেরও একথা জানায় যে, হযরত ইউসুফের নিজের একটি নবুওয়াত মিশন ছিল এবং তাঁর দাওয়াত ও তাবলীগের কাজ তিনি কারাগারেই শুরু করে দিয়েছিলেন।

এ ভাষণটির ওপর শুধুমাত্র সাদামাটাভাবে চোখ বুলিয়ে চলে যাওয়া যাবে, এমন পর্যায়ের ভাষণ এটি নয়। এর এমন অনেকগুলো দিক আছে যেগুলোর প্রতি দৃষ্টি দেয়া এবং যেগুলো সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করার প্রয়োজন আছে ঃ

এক ঃ এ প্রথম আমরা দেখছি হযরত ইউসুফ (আ) আল্লাহর সত্য দীনের প্রচার করছেন। এর আগে তাঁর জীবন কাহিনীর যে অংশ কুরআন পেশ করেছে তাতে কেবলমাত্র

তাঁর উন্নত নৈতিক চরিত্রের বিভিন্ন বৈশিষ্ট বিভিন্ন পর্যায়ে বিকশিত হয়েছে। কিন্তু তাবলীগ বা প্রচারের কোন আভাস সেখানে পাওয়া যায় না। এ থেকে প্রমাণ হয়, প্রথম পর্যায়গুলো ছিল নিছক প্রস্তুতি ও প্রশিক্ষণমূলক। নবুওয়াতের কাজ কার্যত এ কারাগার পর্যায়ে তাঁকে সোপর্দ করা হয় এবং নবী হিসেবে এটি তাঁর প্রথম দাওয়াতী ভাষণ।

দুই ঃ এ প্রথম তিনি লোকদের সামনে নিজের আসল পরিচয় প্রকাশ করেন। এর আগে আমরা দেখেছি তিনি যেসব অবস্থার সম্মুখীন হয়েছেন অত্যন্ত ধৈর্য ও কৃতজ্ঞতার সাথে সেগুলো গ্রহণ করতে থেকেছেন। যখন কাফেলার লোকেরা তাঁকে ধরে গোলাম বানালো, যখন তিনি মিসরে আনীত হলেন, যখন তাঁকে মিসরের আযীযের হাতে বিক্রি করা হলো, যখন তাঁকে কারাগারে পাঠানো হলো, এর মধ্যে কোন এক সময়েও তিনি একথা বলেননি যে, তিনি ইবরাহীম ও ইসহাক আলাইহিমাস সালামের পৌত্র এবং ইয়াকুব আলাইহিস সালামের ছেলে। তাঁর বাপ ও দাদা কেউ অপরিচিত ছিলেন না। কাফেলার লোকেরা, মাদয়ানবাসী হোক বা ইসমাঈলী উভয়েরই তাদের পরিবারের সাথে নিকট সম্পর্ক ছিল। মিসরবাসীরাও তো কমপক্ষে হযরত ইবরাহীম সম্পর্কে বেখবর ছিল না। (বরং হযরত ইউসুফ যেভাবে তাঁদের এবং হযরত ইয়াকূব ও ইসহাকের কথা বলেছেন তাতে অনুমান করা যায় এ তিনজন মনীষীর খ্যাতি মিসরে পৌঁছে গিয়েছিল।) কিন্তু হযরত ইউসুফ (আ) বিগত চার পাঁচ বছর ধরে যেসব অবস্থার সম্মুখীন হতে থেকেছেন তা থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য কখনো নিজের বাপ–দাদাদের নাম নেননি। সম্ভবত তিনি নিজেও জানতেন, আল্লাহ তাঁকে যা কিছু বানাতে চান সে জন্য তাঁকে এসব অবস্থার মধ্য দিয়ে এগিয়ে যেতে হবে। কিন্তু এখন শুধুমাত্র নিজের দাওয়াত ও তাবলীগের খাতিরে তিনি এ সত্যটি সামনে তুলে ধরলেন যে, তিনি কোন নতুন ও অভিনব দীন পেশ করছেন না বরং তাওহীদ প্রচারের এমন একটি বিশ্বজনীন আন্দোলনের সাথে তাঁর সম্পর্ক রয়েছে যার নেতা হচ্ছেন ইবরাহীম, ইসহাক ও ইয়াকূব আলাইহিমুস সালাম। তাঁর এমনটি করা এ জন্য জরুরী ছিল যে, সত্য দীনের আহবায়ক কখনো "আমি একটি নতুন কথা বলছি যা এর আগে কেউ বলেনি" এ ধরনের দাবীর মাধ্যমে তাঁর দাওয়াতের কাজ শুরু করেন না। বরং প্রথম পদক্ষেপেই তিনি একথা পরিষ্কার করে বলে দেন যে, তিনি একটি চিরন্তন ও চিরস্থায়ী সত্যের দিকে আহবান জানাচ্ছেন, যা ইতিপূর্বে সবসময়ই সকল সত্যপন্থী পেশ করে এসেছেন।

তিন ঃ তারপর ইউসুফ আলাইহিস সালাম নিজের বক্তব্য পেশ করার জন্য যেভাবে সুযোগ সৃষ্টি করেছেন তা থেকে আমরা প্রচার কৌশলের ব্যাপারে একটা গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা লাভ করি। দু'জন লোক তাদের স্বপ্ন বর্ণনা করছে। তারা নিজেদের ভক্তি ও শ্রদ্ধার কথা প্রকাশ করে তার তা'বীর জিজ্ঞেস করছে। জবাবে তিনি বলছেন, তা'বীর তো আমি অবশ্যি বলবো কিন্তু তার আগে শুনে রাখো, যে জ্ঞানের মাধ্যমে আমি তোমাদের স্বপ্নের ব্যাখ্যা দেবো তার উৎস কি? এভাবে তাদের কথার মধ্য থেকে নিজের কথা বলার সুযোগ সৃষ্টি করে তিনি তাদের সামনে নিজের দীন পেশ করতে থাকেন। এ থেকে এ শিক্ষা পাওয়া যায় যে, কোন ব্যক্তি যদি সত্য প্রচারের ফিকিরে লেগে যায় এবং সে সূক্ষ্ম বুদ্ধিবৃত্তিরও অধিকারী হয় তাহলে কেমন চমৎকারভাবে আলোচনার মোড় নিজের দিকে ফিরিয়ে নিতে পারে। যে ব্যক্তি দাওয়াত দেবার ধান্দায় থাকে না তার সামনে সুযোগের পর সুযোগ

আসতে থাকে কিন্তু কোন সুযোগেই সে নিজের কথা পেশ করার প্রয়োজন অনুভব করে না। কিন্তু যার এ ধান্দা থাকে, সে সুযোগের জন্য ওঁৎ পেতে বসে থাকে এবং সুযোগ পাওয়ার সাথে সাথেই নিজের কাজ শুরু করে দেয়। তবে বিচক্ষণ ও জ্ঞানী প্রচারকের সুযোগ সন্ধান এবং নির্বোধ ও অবিবেচক প্রচারকের সুযোগ সন্ধানের মধ্যে অনেক পার্থক্য রয়েছে। নির্বোধ প্রচারক পরিবেশ–পরিস্থিতির প্রতি দৃষ্টি না রেখে লোকদের কানে জোরপূর্বক নিজের দাওয়াত ঠেসে দেবার চেষ্টা করে তারপর অনর্থক তর্কবিতর্ক ও বাক-বিতণ্ডায় জড়িয়ে পড়ে তাদের মনে নিজের দাওয়াতের প্রতি উল্‌টো বিরক্তির সৃষ্টি করে।

চার ঃ লোকদের সামনে দীনের দাওয়াত পেশ করার সঠিক পদ্ধতি কি, একথাও এখান থেকে জানা যেতে পারে। হযরত ইউসুফ (আ) সুযোগ পেতেই ইসলামের বিস্তারিত বিধান ও নীতিগুলো পেশ করতে শুরু করেননি। বরং শ্রোতাদের সামনে দীনের এমন একটি সূচনা বিন্দু তুলে ধরেন যেখান থেকে সত্যপন্থী ও মিথ্যাপন্থীদের পথ পরস্পর থেকে আলাদা হয়ে গেছে। অর্থাৎ তাওহীদ ও শিরকের পার্থক্য তুলে ধরেছেন। আবার এ পার্থক্যকে এমন যুক্তিসংগত পদ্ধতিতে সুস্পষ্ট করেছেন যার ফলে সাধারণ বিবেক বুদ্ধি সম্পন্ন যে কোন ব্যক্তিই তা অনুভব না করে পারেন না। বিশেষ করে সে সময় যাদেরকে সম্বোধন করে তিনি একথা বলছিলেন তাদের মন–মস্তিষ্কে তীরের মতো একথা গেঁথে গিয়ে থাকবে। কারণ তারা ছিল কর্মজীবী গোলাম। নিজেদের মনের গভীরে তারা একথা ভালোভাবে অনুভব করতো যে, একজন প্রভুর গোলাম হওয়া ভালো, না একাধিক প্রভুর গোলাম হওয়া আর সারা দুনিয়ার একক প্রভু যিনি, তার বন্দেগী করা ভালো, না তার বান্দাদের বন্দেগী করা? তারপর তিনি একথাও বলেন না যে, তোমাদের ধর্ম ত্যাগ করো এবং আমার দীন গ্রহণ করো। বরং এক বিচিত্র ভংগীতে বলছেন, আল্লাহর কতবড় মেহেরবানী, তিনি আমাদের তাঁর ছাড়া আর কারো বান্দা হিসেবে পয়দা করেননি, অথচ অধিকাংশ লোক তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না বরং অনর্থক নিজেরাই মনগড়া রব তৈরী করে তাদের পূজা ও বন্দেগী করছে। তারপর তিনি শ্রোতাদের অনুসৃত ধর্মের সমালোচনাও করছেন কিন্তু অত্যন্ত যুক্তিসংগতভাবে এবং কোন প্রকার মনোকষ্ট না দিয়ে। তিনি এতটুকু বলেই ক্ষান্ত হয়েছেন যে, এই যেসব মাবুদ–যাদের কাউকে তোমরা অন্নদাতা, কাউকে অনুগ্রহদাতা ও করুণানিধান, কাউকে ভূমির অধিপতি এবং কাউকে ধন–সম্পদের মালিক অথবা স্বাস্থ্য ও রোগের একচ্ছত্র অধিপতি ও পরিচালক ইত্যাদি বলে থাকো—এরা নিছক কিছু অন্তসারশূন্য নাম ছাড়া আর কিছুই নয়। এ নামগুলোর পিছনে কোন সত্যিকার অন্নদাতা, অনুগ্রহকারী, মালিক ও প্রভুর অস্তিত্ব নেই। আসল মালিক ও প্রভু হচ্ছেন মহান আল্লাহ, যাকে তোমরাও বিশ্ব–জাহানের স্রষ্টা ও প্রতিপালক বলে স্বীকার করে থাকো। তিনি এসব মালিক ও প্রভুদের কাউকে মালিকানা, প্রভুত্ব ও উপাস্য হবার ছাড়পত্র দেননি। তিনি সার্বভৌমত্ব ও শাসন কর্তৃত্বের যাবতীয় অধিকার ও ক্ষমতা নিজের জন্য নির্ধারিত করে রেখেছেন এবং তাঁরই আদেশ হচ্ছে, তোমরা তাঁর ছাড়া আর কারো বন্দেগী করবে না।

পাঁচ ঃ হযরত ইউসুফ (আ) কারাগারের এ আট দশ বছরের জীবন কিভাবে অতিবাহিত করেছেন এ থেকে একথাও অনুমান করা যেতে পারে। লোকেরা মনে করে, কুরআনে যেহেতু তাঁর শুধু একটি মাত্র ভাষণের উল্লেখ আছে কাজেই তিনি কেবল একবারই

وَقَالَ الْمَلِكُ إِنِّي أَرَىٰ سَبْعَ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْعَ سُنْبُلَاتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ يَابِسَاتٍ ۖ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ أَفْتُونِي فِي رُؤْيَايَ إِنْ كُنْتُمْ لِلرُّؤْيَا تَعْبُرُونَ ﴿٤٣﴾ قَالُوا أَضْغَاثُ أَحْلَامٍ ۖ وَمَا نَحْنُ بِتَأْوِيلِ الْأَحْلَامِ بِعَالِمِينَ ﴿٤٤﴾ وَقَالَ الَّذِي نَجَا مِنْهُمَا وَادَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ أَنَا أُنَبِّئُكُمْ بِتَأْوِيلِهِ فَأَرْسِلُونِ ﴿٤٥﴾

৬ রুকূ'

একদিন[৩৬] বাদশাহ বললো, "আমি স্বপ্ন দেখেছি, সাতটি মোটা গাভীকে সাতটি পাতলা গাভী খেয়ে ফেলছে এবং সাতটি সবুজ শীষ ও সাতটি শুকনো শীষ। হে সভাসদবৃন্দ! আমাকে এ স্বপ্নের তা'বীর বলে দাও, যদি তোমরা স্বপ্নের মানে বুঝে থাকো।"[৩৭] লোকেরা বললা, "এসব তো অর্থহীন স্বপ্ন, আর আমরা এ ধরনের স্বপ্নের মানে জানি না।"

সেই দু'জন কয়েদীর মধ্য থেকে যে বেঁচে গিয়েছিল এবং দীর্ঘকাল পরে এখন যার মনে পড়েছিল, সে বললো, "আমি আপনাদের এর তা'বীর বলে দিচ্ছি, আমাকে একটু (কারাগারে ইউসুফের কাছে) পাঠিয়ে দিন।"[৩৮]

দীনের দাওয়াত দেবার জন্য মুখ খুলেছিলেন। কিন্তু প্রথমত নবী তাঁর আসল কাজ থেকে গাফেল ছিলেন, একজন নবী সম্পর্কে এ ধারণা করা মারাত্মক ধরনের কুধারণার পর্যায়ভুক্ত। তারপর যে ব্যক্তির সত্যদীন প্রচারের আগ্রহ ও ফিকির এত বেশী প্রবল ছিল যে, দু'জন লোক স্বপ্নের ব্যাখ্যা জিজ্ঞেস করতেই তিনি সেই সুযোগের সদ্ব্যবহার করে তাদের কাছে দীনের তাবলীগ করতে শুরু করে দেন, তাঁর সম্পর্কে কেমন করে এ ধারণা করা যেতে পারে যে, তিনি কারাবাসের এ কয়েক বছর নীরবে কাটিয়ে দিয়েছিলেন?

৩৫. এ আয়াতের ব্যাখ্যায় কোন কোন মুফাসসির বলেছেন, "শয়তান হযরত ইউসুফকে তাঁর রবের (অর্থাৎ আল্লাহর) স্মরণ থেকে গাফেল করে দেয় এবং তিনি এক বান্দার কাছে চান যে, সে তার রবের (মিসরের বাদশাহর) কাছে তার কথা আলোচনা করে তার কারামুক্তির চেষ্টা করুক, তাই আল্লাহ তাঁকে কয়েক বছর জেলখানা পড়ে থাকার শাস্তি দেন।" মূলত এটি পুরোপুরি একটি ভুল ব্যাখ্যা ছাড়া আর কিছুই নয়। এর সঠিক ব্যাখ্যা হচ্ছে, যেমন আল্লামা ইবনে কাসীর এবং প্রথম যুগের তাফসীরকারদের মধ্যে মুজাহিদ, মুহাম্মাদ ইবনে ইসহাক ইত্যাদি তাফসীরকারগণ বলেন, فانساه الشيطان ذكر ربه (শয়তান তাকে ভুলিয়ে দেয় তার রবের বা প্রভুর স্মরণ) এর মধ্যে "তার" বলতে সেই ব্যক্তিকে বুঝানো হয়েছে যার সম্পর্কে হযরত ইউসুফের

يُوسُفُ أَيُّهَا الصِّدِّيقُ أَفْتِنَا فِي سَبْعِ بَقَرَٰتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْعِ سُنۢبُلَٰتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ يَابِسَٰتٍ لَّعَلِّيٓ أَرْجِعُ إِلَى ٱلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿٤٦﴾

সে গিয়ে বললো, "হে সত্যবাদিতার প্রতীক ইউসুফ![৩৯] আমাকে এ স্বপ্নের অর্থ বলে দাও : সাতটি মোটা গাভীকে সাতটি পাতলা গাভী খেয়ে ফেলছে এবং সাতটি শীষ সবুজ ও সাতটি শীষ শুকনো সম্ভবত আমি লোকদের কাছে ফিরে যেতে পারবো এবং তারা জানতে পারবে।"[৪০]

ধারণা ছিল যে, সে মুক্তি পাবে এবং এ আয়াতের মানে হচ্ছে, "শয়তান তার প্রভুর কাছে হযরত ইউসুফের বিষয়টা উথাপন করার কথা ভুলিয়ে দিয়েছিল।" এ প্রসংগে একটি হাদীসও পেশ করা হয়। হাদীসটিতে বলা হয়েছে : নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "ইউসুফ আলাইহিস সালাম যে কথা বলেছিলেন সে কথা যদি তিনি না বলতেন তাহলে তিনি কয়েক বছর কারাগারে আটক থাকতেন না।" কিন্তু আল্লামা ইবনে কাসীর বলেছেন : "এ হাদীস যে ক'টি সূত্রে বর্ণিত হয়েছে সব কটিই দুর্বল। কোন কোন সূত্রে এটি "মরফূ" হাদীস। সেখানে বর্ণনাকারী হচ্ছে সুফিয়ান ইবনে ওয়াকী' ও ইবরাহীম ইবনে ইয়াযীদ। এরা উভয়ই অনির্ভরযোগ্য। আবার কোন কোন সূত্রে এটি "মুরসাল" হাদীস। কিন্তু এ ধরনের বিষয়ে মুরসাল হাদীসের ওপর ভরসা করা যেতে পারে না।" এ ছাড়া একজন মজলুম ব্যক্তি নিজের মুক্তির জন্য পার্থিব পন্থা অবলম্বন করাকে আল্লাহ থেকে গাফলতির ও তাঁর প্রতি অনির্ভরশীলতার প্রমাণ হিসেবে গণ্য করা হবে—একথা যুক্তির দিক দিয়েও গ্রহণযোগ্য নয়।

৩৬. মাঝখানে কারাগার জীবনের কয়েক বছরের অবস্থা বাদ দিয়ে এখন হযরত ইউসুফের পার্থিব উন্নতির সূচনা লগ্নের সাথে সম্পর্ক জুড়ে দেয়া হয়েছে।

৩৭. বাইবেল ও তালমূদের বর্ণনা মতে এ স্বপ্ন দেখার পর বাদশাহ বড়ই পেরেশান হয়ে পড়েছিলেন। তিনি সাধারণ ঘোষণার মাধ্যমে নিজের রাজ্যের বুদ্ধিমান ও চিন্তাশীল গোষ্ঠী, জ্যোতিষী, গণক, ধর্মীয় নেতা ও যাদুকরদের একত্র করে তাদের সবার সামনে এ স্বপ্ন পেশ করেছিলেন।

৩৮. কুরআন এখানে ঘটনার আলোচনা সংক্ষেপে সেরে দিয়েছে। বাইবেল ও তালমূদে এর যে বিস্তারিত বিবরণ এসেছে (বস্তুত যুক্তির আলোকে এ বিবরণই সঠিক মনে হয়।) তা হচ্ছে এই : মদ পরিবেশকদের সরদার ইউসুফ আলাইহিস সালামের অবস্থা বাদশাহর কাছে বর্ণনা করে এবং এ সংগে জেলখানায় তাদের স্বপ্ন এবং হযরত ইউসুফ (আ) তার যে তা'বীর করেছিলেন আর এ তা'বীর যেভাবে সত্য প্রমাণিত হয়েছে তা সবই তার সামনে তুলে ধরে। শেষে সে বাদশাহর কাছে আবেদন করে, আমি জেলখানায় গিয়ে তাঁর কাছ থেকে এর তা'বীর জিজ্ঞেস করে আসবো, আমাকে সেখানে যাবার অনুমতি দেয়া হোক।

قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأَبًا ۚ فَمَا حَصَدتُّمْ فَذَرُوهُ فِي سُنۢبُلِهِۦٓ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا تَأْكُلُونَ ۝٤٧ ثُمَّ يَأْتِى مِنۢ بَعْدِ ذَٰلِكَ سَبْعٌ شِدَادٌ يَأْكُلْنَ مَا قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا تُحْصِنُونَ ۝٤٨ ثُمَّ يَأْتِى مِنۢ بَعْدِ ذَٰلِكَ عَامٌ فِيهِ يُغَاثُ ٱلنَّاسُ وَفِيهِ يَعْصِرُونَ ۝٤٩

ইউসুফ বললো, "তোমরা সাত বছর পর্যন্ত লাগাতার চাষাবাদ করতে থাকবে। এ সময় তোমরা যে ফসল কাটবে তা থেকে সামান্য পরিমাণ তোমাদের আহারের প্রয়োজনে বের করে নেবে এবং বাদবাকি সব শীষ সমেত রেখে দেবে। তারপর সাতটি বছর আসবে বড়ই কঠিন। এ সময়ের জন্য তোমরা যে শস্য জমা করবে তা সমস্ত এ সময়ে খেয়ে ফেলা হবে। যদি কিছু বেঁচে যায় তাহলে তা হবে কেবলমাত্র সে টুকুই যা তোমরা সংরক্ষণ করবে। এরপর আবার এক বছর এমন আসবে যখন রহমতের বৃষ্টি ধারার মাধ্যমে মানুষের আবেদন পূর্ণ করা হবে এবং তারা রস নিংড়াবে।[৪১]

৩৯. মূল ভাষ্যে صديق শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। এ শব্দটি আরবী ভাষায় সর্বোচ্চ মানের সততা ও সত্যবাদিতার ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়। এ থেকে অনুমান করা যেতে পারে যে, কারাগারে অবস্থানকালে এ ব্যক্তি হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালামের পবিত্র জীবন ও চরিত্র দ্বারা কী বিপুলভাবে প্রভাবিত হয়েছিল! দীর্ঘকাল অতিবাহিত হবার পরও এ প্রভাব কেমন অটুট ছিল! "সিদ্দীক" শব্দটির আরো বেশী ব্যাখ্যা জানার জন্য দেখুন সূরা নিসার ৯৯ টীকা।

৪০. অর্থাৎ তারা আপনার মর্যাদা ও মূল্য বুঝতে পারবে। তারা অনুভব করতে পারবে কত উঁচুদরের ব্যক্তিত্বকে তারা কোথায় আটকে রেখেছে। এভাবে আপনার সাথে কারাবাসের সময় আমি যে ওয়াদা করেছিলাম তা পূর্ণ করার সুযোগ আমি পেয়ে যাবো।

৪১. মূল ভাষ্যে يعصرون শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। এর শাব্দিক মানে হচ্ছে 'নিংড়ানো'। এখানে এর মাধ্যমে পরবর্তীকালের চতুরদিকের এমন শষ্য শ্যামল তরতাজা পরিবেশ বর্ণনা করাই উদ্দেশ্য যা দুর্ভিক্ষের পর রহমতের বৃষ্টিধারা ও নীলনদের জোয়ারের পানি সিঞ্চনের মাধ্যমে সৃষ্টি হবে। জমি ভালোভাবে পানিসিক্ত হলে তেল উৎপাদনকারী বীজ, রসাল ফল ও অন্যান্য ফলফলাদি বিপুল পরিমাণে উৎপন্ন হয় এবং ভালো ঘাস খাওয়ার কারণে গৃহপালিত পশুরাও প্রচুর পরিমাণে দুধ দেয়।

হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালাম এ তা'বীরে শুধুমাত্র বাদশাহর স্বপ্নের অর্থ বর্ণনা করেই ক্ষান্ত থাকেননি বরং তিনি এ সংগে প্রাচুর্যের প্রথম সাত বছরে আসন্ন দুর্ভিক্ষের মোকাবিলা ও শস্য সংরক্ষণ করার জন্য কি ব্যবস্থা অবলম্বন করতে হবে তাও বলে দিয়েছেন। এ ছাড়াও তিনি দুর্ভিক্ষের পরে সুদিন আসার সুখবরও দিয়েছেন অথচ বাদশাহর স্বপ্নে এর কোন উল্লেখ ছিল না।

وَقَالَ الْمَلِكُ ائْتُونِي بِهِ ۖ فَلَمَّا جَاءَهُ الرَّسُولُ قَالَ ارْجِعْ إِلَىٰ
رَبِّكَ فَاسْأَلْهُ مَا بَالُ النِّسْوَةِ اللَّاتِي قَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ ۚ إِنَّ رَبِّي
بِكَيْدِهِنَّ عَلِيمٌ ﴿٥٠﴾ قَالَ مَا خَطْبُكُنَّ إِذْ رَاوَدتُّنَّ يُوسُفَ عَن نَّفْسِهِ ۚ قُلْنَ
حَاشَ لِلَّهِ مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ مِن سُوءٍ ۚ قَالَتِ امْرَأَتُ الْعَزِيزِ الْآنَ
حَصْحَصَ الْحَقُّ أَنَا رَاوَدتُّهُ عَن نَّفْسِهِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ ﴿٥١﴾
ذَٰلِكَ لِيَعْلَمَ أَنِّي لَمْ أَخُنْهُ بِالْغَيْبِ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ
الْخَائِنِينَ ﴿٥٢﴾

৭ রুকূ'

বাদশাহ বললো, "তাকে আমার কাছে আনো।" কিন্তু বাদশাহর দূত যখন ইউসুফের কাছে পৌছুল তখন সে বললো,[৪২] তোমার প্রভুর কাছে ফিরে যাও এবং তাকে জিজ্ঞেস করো, যে মহিলারা হাত কেটে ফেলেছিল তাদের ব্যাপারটা কি? আমার রব তো তাদের চক্রান্ত সম্পর্কে অবগত।[৪৩] একথায় বাদশাহ সেই মহিলাদেরকে জিজ্ঞেস করলো,[৪৪] "তোমরা যখন ইউসুফকে অসৎকাজে প্ররোচিত করার চেষ্টা করেছিলে তোমাদের তখনকার অভিজ্ঞতা কি?" সবাই একবাক্যে বললো, "আল্লাহর কী অপার মহিমা! আমরা তার মধ্যে অসৎ প্রবণতার গন্ধই পাইনি।" আযীযের স্ত্রী বলে উঠলো, "এখন সত্য প্রকাশ হয়ে গেছে। আমিই তাকে ফুসলাবার চেষ্টা করেছিলাম, নিসন্দেহে সে একদম সত্যবাদী।[৪৫]

(ইউসুফ বললো ঃ)[৪৬] "এ থেকে আমার উদ্দেশ্য এই ছিল যে, আযীয জানতে পারুক, আমি তার অবর্তমানে তার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করিনি এবং আল্লাহ বিশ্বাস ঘাতকতাকারীদের চক্রান্ত সফল করেন না।

৪২. এখান থেকে শুরু করে বাদশাহর সাথে সাক্ষাত পর্যন্ত আলোচনাটি এ কাহিনীর একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। এ সম্পর্কে যাকিছু কুরআনে বর্ণিত হয়েছে তার কোন উল্লেখ বাইবেল ও তালমূদে নেই। বাইবেলে বলা হয়েছে, বাদশাহর ডাকে হযরত ইউসুফ (আ) সংগে সংগেই চলে আসার জন্য প্রস্তুত হলেন। তিনি ক্ষৌরকর্ম শেষ করলেন, পোশাক বদলালেন এবং রাজ দরবারে হাযির হয়ে গেলেন। তালমূদ এর চাইতেও নিকৃষ্ট ভংগীতে

এ ঘটনাকে পেশ করেছে। তার বর্ণনামতে, "বাদশাহ তার কর্মচারীদেরকে হুকুম দিলেন, ইউসুফকে আমার সামনে হাজির করো এবং এ সংগে এও নির্দেশ দিলেন যে, দেখো এমন কোন কাজ করো না যাতে ছেলেটি ভয় পেয়ে যায় এবং সঠিক তা'বীর দিতে না পারে। কাজেই রাজ কর্মচারীরা হযরত ইউসুফকে কারাগার থেকে বের করলো। তাঁর ক্ষৌরকর্ম সম্পন্ন করলো, পোশাক বদলালো এবং দরবারে নিয়ে এলো। বাদশাহ নিজের সিংহাসনে বসেছিলেন। সেখানে হীরা, মুক্তা, মনি-মাণিক্যের চোখ ধাঁধানো দৃশ্য ও দরবারের শান-শওকত দেখে ইউসুফ হতভম্ব হয়ে গেলেন এবং তাঁর দৃষ্টি বিস্ফারিত হয়ে গেলো। বাদশাহর সিংহাসনের সাতটি সিঁড়ি ছিল। নিয়ম ছিল, যখন কোন সম্মানিত ও মর্যাদাশালী ব্যক্তি কিছু বলতে চাইতেন তখন ছয়টি সিঁড়ি চড়ে ওপরে যেতেন এবং বাদশাহর সাথে কথা বলতেন। আর যখন নিম্ন শ্রেণীর কোন ব্যক্তিকে বাদশাহর সাথে কথা বলার জন্য ডাকা হতো তখন সে নিচে দাঁড়িয়ে থাকতো এবং বাদশাহ তৃতীয় সিঁড়িতে নেমে এসে তার সাথে কথা বলতেন। এ নিয়ম মোতাবেক ইউসুফ নীচে দাঁড়িয়ে ভূমি চুম্বন করে বাদশাহকে সালামী দিলেন এবং বাদশাহ তৃতীয় সিঁড়িতে নেমে এসে তাঁর সাথে কথা বললেন।" এ চিত্রে বনী ইসরাঈল তার মহান মর্যাদাশালী পয়গম্বরকে যেভাবে হেয় করে পেশ করেছে তা চোখের সামনে রেখে কুরআন তাঁর কারাগার থেকে বের হওয়া এবং বাদশাহর সাথে সাক্ষাত করার ঘটনাকে যে মর্যাদাপূর্ণ ও গৌরবময় ভংগীতে পেশ করেছে তা একবার পর্যালোচনা করে দেখুন। এখন একজন বিবেকবান ও বিচক্ষণ ব্যক্তি এ ফায়সালা করতে পারেন যে, এ দু'টি চিত্রের মধ্যে কোন্ চিত্রটি নবুওয়াতের মর্যাদার সাথে বেশী সামঞ্জস্যশীল। তাছাড়া সাধারণ বিচার বুদ্ধির দৃষ্টিতেও একথাটি ত্রুটিপূর্ণ মনে হয় যে, বাদশাহর সাথে সাক্ষাত করা পর্যন্ত যদি হযরত ইউসুফ এতই নিকৃষ্ট মর্যাদার অধিকারী থেকে থাকেন যেমন তালমূদের বর্ণনা থেকে জানা যায়, তাহলে স্বপ্নের তা'বীর শুনার পর অকস্মাত তাঁকে একেবারে সমগ্র রাজ্যের সার্বিক ক্ষমতার অধিকারী করে দেয়া হলো কেমন করে? একটি উন্নত ও সুসভ্য দেশে এতবড় মর্যাদা মানুষ তখনই লাভ করে যখন সে লোকদের কাছে নিজের নৈতিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করে দেয়। কাজেই বুদ্ধিবৃত্তিক দিক দিয়েও বাইবেল ও তালমূদের তুলনায় কুরআনের বর্ণনাই বাস্তবতার সাথে বেশী সামঞ্জস্যশীল মনে হয়।

৪৩. অর্থাৎ আমার রব আল্লাহ তো আগে থেকেই জানেন যে, আমি নিরপরাধ। কিন্তু তোমাদের রব অর্থাৎ বাদশাহেরও আমার মুক্তির পূর্বে যে কারণে আমাকে কারাগারে নিক্ষেপ করা হয়েছে সে ব্যাপারটির পুরোপুরি অনুসন্ধান করে নেয়া উচিত। কারণ আমি কোন সন্দেহ ও অপবাদের কলংক মাথায় নিয়ে মানুষের সামনে যেতে চাই না। আমাকে মুক্তি দিতে চাইলে আগে আমি যে নিরপরাধ ছিলাম একথাটি সর্বসমক্ষে প্রমাণিত হওয়া উচিত। আসল অপরাধী ছিল তোমাদের রাষ্ট্রীয় কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ। তারা নিজেদের স্ত্রীদের অসচ্চরিত্রতার বোঝা চাপিয়ে দিয়েছে আমার নিরপরাধ সত্তা ও নিষ্কলংক চরিত্রের ওপর।

হযরত ইউসুফ (আ) তাঁর এ দাবীকে যে ভাষায় পেশ করেছেন তা থেকে সুস্পষ্টভাবে একথা প্রকাশিত হয় যে, আযীযের স্ত্রীর ভোজের মজলিসে যে ঘটনা ঘটেছিল সে সম্পর্কে মিসরের বাদশাহ পুরোপুরি অবগত ছিলেন। বরং সেটি এমনি একটি বহুল প্রচারিত ঘটনা ছিল যে, সেদিকে কেবলমাত্র একটি ইংগিতই যথেষ্ট ছিল।

তারপর এ দাবীতে হযরত ইউসুফ (আ) আযীযের স্ত্রীকে বাদ দিয়ে শুধুমাত্র যে মহিলাগুলো আংগুল কেটে ফেলেছিল তাদের ব্যাপারটি উত্থাপন করেই ক্ষান্ত হয়েছেন। এটি তাঁর চরম ভদ্রতা ও উন্নত হৃদয়বৃত্তির আর একটি প্রমাণ। আযীযের স্ত্রী তাঁর সাথে যে পর্যায়ের অসদ্ব্যবহার করে থাকুক না কেন তবুও তার স্বামী তাঁর উপকার করেছিলেন। তাই তাঁর ইজ্জত-আবরুর ওপর হামলা করে কোন কথা তিনি বলতে চাননি।

৪৪. সম্ভবত শাহীমহলে এ মহিলাদেরকে ডেকে এনে এ জবানবন্দী নেয়া হয়েছিল। আবার এও হতে পারে যে, বাদশাহ নিজের কোন বিশেষ বিশ্বস্ত ব্যক্তিকে পাঠিয়ে প্রত্যেকের কাছ থেকে ব্যক্তিগতভাবে এ স্বীকারোক্তি আদায় করেছিলেন।

৪৫. অনুমান করা যেতে পারে, এ স্বীকারোক্তিগুলো কিভাবে আট নয় বছর আগের ঘটনাবলীকে আবার নতুন করে তরতাজা করে দিয়েছিল, কিভাবে হযরত ইউসুফের ব্যক্তিত্ব কারাজীবনের দীর্ঘকালীন বিস্মৃতির পর আবার অকস্মাত বিপুলভাবে উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছিল, কিভাবে মিসরের সমস্ত অভিজাত, মর্যাদাশালী ও মধ্যবিত্ত সমাজে এবং সাধারণ মানুষের মধ্যেও তাঁর নৈতিক মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত হয়ে গিয়েছিল। ওপরে বাইবেল ও তালমূদের বরাত দিয়ে একথা বলা হয়েছে যে, বাদশাহ সাধারণ ঘোষণার মাধ্যমে সারা দেশের জ্ঞানী-গুণী, আলেম ও পীরদের একত্র করেছিলেন এবং তারা সবাই তাঁর স্বপ্নের ব্যাখ্যা করতে অক্ষম হয়েছিল। এরপর হযরত ইউসুফ (আ) এর ব্যাখ্যা করেছিলেন। এ ঘটনার ফলে সারা দেশের জনতার দৃষ্টি আগে থেকেই তাঁর প্রতি নিবদ্ধ হয়েছিল। তারপর বাদশাহর তলবনামা পেয়ে যখন তিনি জেলখানা থেকে বাইরে আসতে অস্বীকার করলেন তখন সমগ্র দেশবাসী অবাক হয়ে গিয়েছিল যে, এ আবার কেমন অদ্ভুত প্রকৃতির উচ্চ মনোবল সম্পন্ন মানুষ, যাকে আট নয় বছরের কারাবাসের পর বাদশাহ নিজেই মেহেরবানী করে ডাকছেন এবং তারপরও তিনি ব্যাকুল চিত্তে দৌড়ে আসছেন না। তারপর যখন তারা ইউসুফের নিজের কারামুক্তির এবং বাদশাহর সাথে দেখা করতে আসার জন্য পেশকৃত শর্তাবলী শুনলো তখন সবার দৃষ্টি এ অনুসন্ধান ও তদন্তের ফলাফলের প্রতি কেন্দ্রীভূত হয়ে রইল। এরপর যখন লোকেরা এর ফলাফল শুনলো তখন দেশের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা এই বলে বাহ্‌বা দিল যে, আহা, এ ব্যক্তি কেমন পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন জীবন ও চরিত্রের অধিকারী। কাল যারা নিজেদের সমবেত প্রচেষ্টায় তাঁকে কারাগারে পাঠিয়েছিল আজ তাঁর চারিত্রিক নিষ্কলুষতার পক্ষে তারাই সাক্ষ দিয়ে যাচ্ছে। এ অবস্থা সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করলে একথা ভালোভাবেই উপলব্ধি করা যায় যে, সে সময় হযরত ইউসুফের উন্নতির উচ্চ শিখরে উঠার জন্য কেমন অনুকূল পরিবেশ তৈরী হয়ে গিয়েছিল। এরপর বাদশাহর সাথে সাক্ষাতের সময় হযরত ইউসুফ হঠাৎ কেমন করে তাঁকে দেশের অর্থ-সম্পদের ওপর কর্তৃত্ব দান করার দাবী জানিয়েছিলেন এবং বাদশাহ কেন নির্দ্বিধায় তা গ্রহণ করে নিয়েছিলেন একথা আর মোটেই বিস্ময়কর ঠেকে না। ব্যাপার যদি শুধু এতটুকুর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকতো যে কারাগারের একজন বন্দী বাদশাহর একটি স্বপ্নের তা'বীর বলে দিয়েছিলেন তাহলে এ জন্য তিনি বড়জোর কোন পুরস্কারের এবং কারাগার থেকে মুক্তিলাভের অধিকারী হতে পারতেন। কিন্তু শুধুমাত্র এতটুকুন কথায় তিনি বাদশাহকে বলবেন "আমাকে দেশের যাবতীয় অর্থ-সম্পদের ওপর কর্তৃত্ব দান করো" এবং বাদশাহ বলে দেবেন "নাও, সবকিছু তোমার জন্য হাযির"—এটা যথেষ্ট হতে পারতো না।

৪৬. একথা সম্ভবত হযরত ইউসুফ তখনই বলে থাকবেন যখন কারাগারে তাঁকে তদন্তের ফলাফল জানিয়ে দেয়া হয়ে থাকবে। ইবনে তাইমিয়া ও ইবনে কাসীরের মতো বড় বড় মুফাস্‌সিরসহ আরো কোন কোন তাফসীরকার এ বাক্যটিকে হযরত ইউসুফের নয় বরং আযীযের স্ত্রীর বক্তব্যের অংশ হিসেবে গণ্য করেছেন। তাদের যুক্তি হচ্ছে, এ বাক্যটি আযীযের স্ত্রীর উক্তির সাথে সংযুক্ত এবং মাঝখানে এমন কোন শব্দ নেই যা থেকে একথা মনে করা যেতে পারে যে, انه لمن الصادقين এ এসে আযীযের স্ত্রীর কথা শেষ হয়ে গেছে এবং পরবর্তী কথা হযরত ইউসুফ বলেছেন। তাঁরা বলেন, দু'টি লোকের কথা যদি পরস্পরের সাথে সংলগ্ন থাকে এবং এটা অমুকের কথা ও ওটা অমুকের কথা—এ বিষয়টি যদি সুস্পষ্ট না থাকে তাহলে এ অবস্থায় অবশ্যি এমন কোন চিহ্ন থাকা উচিত যা উভয় কথার মধ্যে পার্থক্য করতে পারে। কিন্তু এখানে এ ধরনের কোন পার্থক্য চিহ্ন নেই। কাজেই একথা মেনে নিতে হবে যে الئن حصحص الحق থেকে শুরু করে ان ربى غفور رحيم পর্যন্ত সম্পূর্ণ বক্তব্যটি আযীযের স্ত্রীর। কিন্তু আমি অবাক হচ্ছি, এ বিষয়টি কেমন করে ইবনে তাইমিয়ার মতো সূক্ষ্মদর্শী ব্যক্তিরও দৃষ্টির আগোচরে থেকে গেলো যে, কথা বলার ধরন ও ভংগী নিজেই একটি বড় পার্থক্য চিহ্ন এবং এর উপস্থিতিতে আর কোন পার্থক্য চিহ্নের প্রয়োজনই হয় না। প্রথম বাক্যটি অবশ্যি আযীযের স্ত্রীর মুখে সাজে কিন্তু দ্বিতীয় বাক্যটিও কি তার মুখে খাপ খায়? দ্বিতীয় বাক্যের প্রকাশভংগী তো পরিষ্কার জানাচ্ছে যে, আযীযের স্ত্রী নয় হযরত ইউসুফই তার প্রবক্তা। এ বাক্যে যে সৎহৃদয়বৃত্তি, উচ্চ মনোভাব, বিনয় ও আল্লাহভীতি সোচ্চার তা নিজেই সাক্ষ দিচ্ছে যে, তা এমন এক নারীর কণ্ঠে উচ্চারিত হতে পারে না যে কণ্ঠে ইতিপূর্বে هيت لك (এসে যাও) উচ্চারিত হয়েছিল, যে কণ্ঠ থেকে ইতিপূর্বে বের হয়েছিল ما جزاء من اراد باهلك سوء (যে ব্যক্তি তোমার স্ত্রীকে কুকর্মে লিপ্ত করতে চায় তার শাস্তি কি?) এর মতো মিথ্যা ভাষণ এবং যে কণ্ঠে প্রকাশ্য মাহফিলে لئن لم يفعل ما امره ليسجنن (যদি সে আমার কথা মতো কাজ না করে তাহলে তাকে কারাগারে পাঠানো হবে)–এর মতো হুমকি উচ্চারিত হয়েছিল। এমন ধরনের পবিত্র বাক্য কেবলমাত্র এমনি এক কণ্ঠে উচ্চারিত হতে পারতো যে কণ্ঠে ইতিপূর্বে معاذ الله انه ربى احسن مثواى (আল্লাহর পানাহ চাই, তিনি আমার রব, তিনি আমাকে উচ্চ মর্যাদা দান করেছেন) এ ধরনের সকৃতজ্ঞ বাণী উচ্চারিত হয়েছিল, যে কণ্ঠ ইতিপূর্বে رَبِّ السِّجْنُ أَحَبُّ إِلَىَّ مِمَّا يَدْعُونَنِىٓ إِلَيْهِ (হে আমার রব! এরা আমাকে যে পথে চলার জন্য ডাকছে তার চেয়ে কারাগার আমার কাছে ভালো।)–এর মতো সৎপথে অটল থাকার দৃঢ় মনোবৃত্তির ঘোষণা দিয়েছিল এবং যে কণ্ঠ ইতিপূর্বে إِلَّا تَصْرِفْ عَنِّى كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ (হে আল্লাহ! যদি তুমি আমাকে তাদের ষড়যন্ত্র থেকে উদ্ধার না করো তাহলে আমি তাদের জালে আটকে যাবো)–এর মতো সমর্পিত প্রাণ বান্দার আকুতি ধ্বনিত হয়েছিল। এ ধরনের পবিত্র বাণীকে সত্যনিষ্ঠ–সত্যবাদী ইউসুফের পরিবর্তে আযীযের স্ত্রীর উক্তি বলে মেনে নেয়া ততক্ষণ পর্যন্ত সম্ভব নয় যতক্ষণ পর্যন্ত এমন কোন আলামত বা চিহ্ন না পাওয়া যায় যা থেকে প্রমাণ হয় এ পর্যায়ে পৌঁছে আযীযের স্ত্রী তাওবা করে ঈমান এনেছিল এবং নিজের প্রবৃত্তি ও আচরণ সংশোধন করার সৌভাগ্য লাভ করেছিল। কিন্তু দুঃখের বিষয় এমন কোন আলামত ও নিদর্শন পাওয়া যায় না।

وَمَآ اُبَرِّئُ نَفْسِىْ ۚ اِنَّ النَّفْسَ لَاَمَّارَةٌ ۢ بِالسُّوْٓءِ اِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّىْ ؕ اِنَّ رَبِّىْ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿٥٣﴾ وَقَالَ الْمَلِكُ ائْتُوْنِىْ بِهٖٓ اَسْتَخْلِصْهُ لِنَفْسِىْ ۚ فَلَمَّا كَلَّمَهٗ قَالَ اِنَّكَ الْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِيْنٌ اَمِيْنٌ ﴿٥٤﴾ قَالَ اجْعَلْنِىْ عَلٰى خَزَآئِنِ الْاَرْضِ ۚ اِنِّىْ حَفِيْظٌ عَلِيْمٌ ﴿٥٥﴾

আমি নিজের নফ্‌সকে দোষমুক্ত করছি না। নফ্‌স তো খারাপ কাজ করতে প্ররোচিত করে, তবে যদি কারোর প্রতি আমার রবের অনুগ্রহ হয় সে ছাড়া। অবশ্যি আমার রব বড়ই ক্ষমাশীল ও মেহেরবান।"

বাদশাহ বললো, "তাকে আমার কাছে আনো, আমি তাকে একান্তভাবে নিজের জন্য নির্দিষ্ট করে নেব।"

ইউসুফ যখন তার সাথে আলাপ করলো, সে বললো, "এখন আপনি আমাদের এখানে সম্মান ও মর্যদার অধিকারী এবং আপনার আমানতদারীর ওপর পূর্ণ ভরসা আছে।[৪৭] *ইউসুফ বললো, "দেশের অর্থ–সম্পদ আমার হাতে সোপর্দ করুন। আমি সংরক্ষণকারী এবং জ্ঞানও রাখি।*[৪৭(ক)]

৪৭. এটা যেন বাদশাহর পক্ষ থেকে এ মর্মে একটি সুস্পষ্ট ইংগিত ছিল যে, আপনার হাতে যে কোন দায়িত্বপূর্ণ কাজ সোপর্দ করা যেতে পারে।

৪৭(ক). এর আগে যেসব আলোচনা হয়েছে তার আলোকে পর্যালোচনা করলে একথা পরিষ্কার বুঝা যাবে যে, কোন পদলোভী ব্যক্তি বাদশাহর ইশারা পাওয়ার সাথে সাথেই যেমন কোন পদলাভের জন্য আবেদন করে বসে এটি তেমনি ধরনের কোন চাকরির আবেদন ছিল না। আসলে এটি ছিল একটি বিপ্লবের দরজা খোলার জন্য সর্বশেষ আঘাত। হযরত ইউসুফের নৈতিক শক্তির বলে বিগত দশ–বারো বছরের মধ্যে এ বিপ্লব ক্রমবিকাশ লাভ করে আত্মপ্রকাশ করার জন্য প্রস্তুত হয়ে গিয়েছিল এবং এখন এর দরজা খোলার জন্য শুধুমাত্র একটি হাল্‌কা আঘাতের প্রয়োজন ছিল। হযরত ইউসুফ (আ) একটি সুদীর্ঘ ধারাবাহিক পরীক্ষার অংগন অতিক্রম করে আসছিলেন। কোন অজ্ঞাত স্থানে এ পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়নি। বরং বাদশাহ থেকে শুরু করে মিসরের আবাল–বৃদ্ধ–বনিতা সবাই এ সম্পর্কে অবগত ছিল। এসব পরীক্ষার মাধ্যমে তিনি একথা প্রমাণ করে দিয়েছিলেন যে, আমানতদারী, সততা, ধৈর্য, সংযম, উদারতা, বুদ্ধিমত্তা, বিচক্ষণতা ও দূরদর্শীতার ক্ষেত্রে অন্তত সমকালীন লোকদের মধ্যে তিনি ছিলেন অপ্রতিদ্বন্দ্বী। তাঁর ব্যক্তিত্বের এ গুণগুলো এমনভাবে বিকশিত হয়ে উঠেছিল যে, এগুলো অস্বীকার করার সাধ্য কারোর ছিল না। দেশবাসী মুখে এগুলোর পক্ষে সাক্ষ দিয়েছিল। তাদের হৃদয়

এগুলোর দ্বারা বিজিত হয়েছিল। বাদশাহ নিজেই এগুলোর সামনে আত্মসমর্পণ করেছিলেন। এখন তাঁর "সংরক্ষণকারী" ও "জ্ঞানী" হওয়া শুধুমাত্র একটি দাবীর পর্যায়ভুক্ত ছিল না বরং এটি ছিল একটি প্রমাণিত ঘটনা। সবাই এটা বিশ্বাস করতো। এখন শুধু রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা কর্তৃত্ব পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করার ক্ষেত্রে হযরত ইউসুফের সম্মতিটুকুই বাকি ছিল। বাদশাহ, তাঁর মন্ত্রী পরিষদ ও রাষ্ট্রীয় কর্মকর্তাগণ একথা ভালোভাবেই জেনেছিলেন যে, তিনি ছাড়া এ রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব পালন করার মতো আর দ্বিতীয় কোন যোগ্য ব্যক্তিত্বই নেই। কাজেই নিজের এ উক্তির সাহায্যে তিনি এ সম্মতিটুকুরই প্রকাশ ঘটিয়েছিলেন মাত্র। তাঁর কন্ঠে এ দাবীটুকু উচ্চারিত হবার সাথে সাথেই বাদশাহ ও তাঁর রাজ পরিষদ যেভাবে দু'হাত বাড়িয়ে তা গ্রহণ করে নিয়েছেন তা একথাই প্রমাণ করে যে, ফল পুরোপুরি পেকে গিয়েছিল এবং তা ছিঁড়ে পড়ার জন্য শুধুমাত্র একটা ইশারার অপেক্ষায় ছিল। (তালমূদের বর্ণনামতে হযরত ইউসুফকে রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্ব দান করার ফায়সালাটি কেবল বাদশাহ একাই করেননি। বরং সমগ্র রাজপরিষদ সর্বসম্মতিক্রমে তাঁর পক্ষে রায় দিয়েছিল।

হযরত ইউসুফ (আ) এই যে ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব চান এবং যা তাকে দেয়া হয়, এটা কোন্ ধরনের ছিল? অজ্ঞ লোকেরা এখানে خزائن ارض (দেশের ধন-সম্পদ) শব্দ এবং পরবর্তী পর্যায়ে অগ্রসর হয়ে খাদ্য বন্টনের ঘটনাবলীর উল্লেখ দেখে মনে করেন সম্ভবত তিনি ধনভাণ্ডারের কর্তা, অর্থ বিভাগীয় কর্মকর্তা, দুর্ভিক্ষ কমিশনার, অর্থমন্ত্রী অথবা খাদ্য মন্ত্রী ধরনের একটা কিছু ছিলেন। কিন্তু কুরআন, বাইবেল ও তালমূদের সম্মিলিত সাক্ষ হচ্ছে এই যে, আসলে ইউসুফকে মিসর রাজ্যের সর্বময় কর্তৃত্বের আসনে (রোমীয় পরিভাষায় ডিকটেটর) অধিষ্ঠিত করা হয়েছিল। দেশের সর্বময় কর্তৃত্ব তাঁকে দান করা হয়েছিল। কুরআন বলছে, হযরত ইয়াকূব (আ) যখন মিসরে পৌঁছলেন তখন ইউসুফ আলাইহিস সালাম সিংহাসনে বসেছিলেন ورفع ابويه على العرش এবং তিনি নিজের পিতামাতাকে তাঁর পাশে সিংহাসনে বসালেন)। হযরত ইউসুফের মুখ নিঃসৃত এ বাণী কুরআনে উদ্ধৃত হয়েছে ঃ "হে আমার রব! তুমি আমাকে বাদশাহী দান করেছো।" (رب قد اتيتنى من الملك) আবার আল্লাহ মিসরে তাঁর কর্তৃত্বের অবস্থা এভাবে বর্ণনা করছেন যেন সমগ্র মিসর তাঁর অধীনে ছিল (يتبوا منها حيث يشاء) অন্যদিকে বাইবেল সাক্ষ দিচ্ছে ঃ

> "তুমিই আমার বাটির অধ্যক্ষ হও, আমার সমস্ত প্রজা তোমার বাক্য শিরোধার্য করিবে, কেবল সিংহাসনে আমি তোমা হইতে বড় থাকিব।"........ দেখো, আমি তোমাকে সমস্ত মিসর দেশের উপরে নিযুক্ত করিলাম।.......তোমার আজ্ঞা ব্যতিরেকে সমস্ত মিসর দেশে কোন লোক হাত কি পা তুলিতে পারিবে না। আর ফেরাউন যোসেফের নাম সাফনৎ পানেহ (দুনিয়ার মুক্তিদাতা) রাখিলেন।" (আদি পুস্তক ৪১ ঃ ৪০-৪৫)

আবার তালমূদ বলছে, ইউসুফের ভাইয়েরা মিসর থেকে ফিরে গিয়ে মিসরের শাসন-কর্তার (ইউসুফ) প্রশংসা করে বলে ঃ

> "দেশের অধিবাসীদের ওপর তিনি সর্বোচ্চ কর্তৃত্বশালী। তাঁর হুকুমে তারা বের হয় এবং তাঁর হুকুমে প্রবেশ করে তাঁর কন্ঠ সারা দেশ শাসন করে। কোন ব্যাপারেই তাঁর ফেরাউনের অনুমতির প্রয়োজন হয় না।"

দ্বিতীয় প্রশ্ন হচ্ছে, হযরত ইউসুফ কি উদ্দেশ্যে এ কর্তৃত্ব চেয়েছিলেন? তিনি কি একটি কাফের সরকারের রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা প্রচলিত কুফরী নীতি ও আইনের ভিত্তিতেই পরিচালনা করার জন্য কর্তৃত্ব ও ক্ষমতা চেয়েছিলেন? অথবা তাঁর সামনে এ লক্ষ্য ছিল যে, রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্ব লাভ করার পর দেশের তামাদ্দুনিক, নৈতিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থা ইসলামী নীতির ভিত্তিতে ঢেলে সাজাবেন? এর সবচেয়ে চমৎকার জবাব আল্লামা যামাখ্‌শারী তাঁর তাফসীর "কাশ্‌শাফ" গ্রন্থে দিয়েছেন। তিনি লিখেছেন :

"হযরত ইউসুফ اجعلنى على خزائن الارض বলেছেন। একথা বলার পেছনে তাঁর কেবল এতটুকুই উদ্দেশ্য ছিল যে, তাঁকে আল্লাহর বিধান জারি ও সত্য প্রতিষ্ঠা করা এবং ন্যায় ও ইনসাফের সুফল চতুরদিকে ছড়িয়ে দেবার সুযোগ দেয়া হোক। আর যেসব কাজের জন্য নবীদেরকে পাঠানো হয়ে থাকে সেগুলো সম্পন্ন করার জন্য তিনি শক্তি অর্জন করবেন। তিনি রাজত্বের লোভে বা কোন বৈষয়িক লালসার বসবর্তী হয়ে এ দাবী করেননি। বরং তিনি ছাড়া আর কেউ এ কাজ করতে পারবে না একথা জেনেই এ দাবী করেছিলেন।"

আর সত্যি বলতে কি, এ প্রশ্নটি আসলে অন্য একটি প্রশ্নের জন্ম দেয়। সেটি অনেক বেশী গুরুত্বপূর্ণ ও মৌলিক প্রশ্ন। সেটি হচ্ছে, হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালাম নবীই ছিলেন কি না? যদি নবী থেকে থাকেন তাহলে কুরআন থেকে কি আমরা পয়গম্বরীর এ ধারণা লাভ করি যে, ইসলামের আহবায়ক নিজেই কুফরী ব্যবস্থাকে কাফেরী পদ্ধতিতে পরিচালনা করার জন্য নিজের শক্তি ও যোগ্যতা পেশ করছেন? বরং এ প্রশ্ন শুধু এখানেই শেষ হয়ে যায় না, এর চেয়েও আরো অনেক বেশী কঠিন ও নাজুক অন্য একটি প্রশ্নেরও জন্ম দেয়। অর্থাৎ হযরত ইউসুফ একজন সত্যবাদী ও সত্যনিষ্ঠ ব্যক্তি ছিলেন কি না? যদি সত্যবাদী ও সত্যনিষ্ঠ ব্যক্তি হয়ে থেকে থাকেন তাহলে একজন সত্যবাদী ও সত্যনিষ্ঠ ব্যক্তি কি এ ধরনের কাজ করে থাকেন যে, কারাগারে অবস্থানকালে এ প্রশ্নের মাধ্যমে তাঁর নবুওয়াতের দাওয়াতের সূচনা করেন : "অনেক প্রভু ভালো অথবা একজন আল্লাহ তিনি সবার ওপর বিজয়ী" এবং বারংবার মিসরবাসীদের কাছে একথা সুস্পষ্ট করে দেন যে, মিসরের বাদশাহও তোমাদের এসব বিভিন্ন মনগড়া প্রভুদের একজন আর এ সংগে পরিষ্কারভাবে নিজের মিশনের এ মৌলিক বিশ্বাসটিও বর্ণনা করে দেন যে, "শাসন কর্তৃত্বের অধিকার এক আল্লাহ ছাড়া আর কারোর নেই।" কিন্তু যখন বাস্তব পরীক্ষার সময় আসে তখন এ ব্যক্তিই আবার হয়ে যান মিসরের বাদশাহর প্রভুত্ব ও কর্তৃত্বাধীনে পরিচালিত রাষ্ট্র ব্যবস্থার খাদেম বরং ব্যবস্থাপক, সংরক্ষক ও পৃষ্ঠপোশক, যার মৌলিক আদর্শই ছিল, "শাসন কর্তৃত্ব আল্লাহর জন্য নয়, বাদশাহর জন্য নির্ধারিত?"

আসলে এ অংশের ব্যাখ্যায় পতন যুগের মুসলমানরা অনেকটা তেমনি ধরনের মানসিকতার পরিচয় দিয়েছেন যা এক সময় ইহুদিদের বৈশিষ্ট ছিল। ইহুদীদের অবস্থা ছিল এই যে, অতীত ইতিহাসের যেসব মনীষীর জীবন ও চরিত্র তাদেরকে উন্নতির শিখরে আরোহণে উদ্বুদ্ধ করতো, নিজেদের নৈতিক ও মানসিক পতনের যুগে তারা তাদের সবাইকে নিচে নামিয়ে নিজেদের সমপর্যায়ে দাঁড় করিয়ে দিয়েছিল। এভাবে তারা নিজেদের জন্য আরো বেশি নিচে নেমে যাবার বাহানা সৃষ্টি করে নিয়েছিল। দুঃখের বিষয় যে, মুসলমানরাও একই ধরনের আচরণ করেছে। তাদের কাফের সরকারের চাকরি করার

وَكَذٰلِكَ مَكَّنَّا لِيُوْسُفَ فِى الْاَرْضِ ۚ يَتَبَوَّاُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ ۚ نُصِيْبُ بِرَحْمَتِنَا مَنْ نَّشَاءُ وَلَا نُضِيْعُ اَجْرَ الْمُحْسِنِيْنَ ۝ وَلَاَجْرُ الْاٰخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَكَانُوْا يَتَّقُوْنَ ۝

এভাবে আমি পৃথিবীতে ইউসুফের জন্য কর্তৃত্বের পথ পরিষ্কার করেছি। সেখানে সে যেখানে ইচ্ছা অবস্থান করতে পারতো।[৪৮] আমি যাকে ইচ্ছা নিজের রহমতে অভিষিক্ত করি। সৎকর্মশীল লোকদের প্রতিদান আমি নষ্ট করি না। আর যারা ঈমান এনেছে এবং তাকওয়া সহকারে কাজ করতে থেকেছে আখেরাতের প্রতিদান তাদের জন্য আরো ভালো।[৪৯]

প্রয়োজন ছিল। কিন্তু এভাবে নিচে নামতে গিয়ে ইসলাম ও তার পতাকাবাহীদের নৈতিক শ্রেষ্ঠত্ব দেখে তারা লজ্জা পেলো। তাই এ লজ্জা দূর করার এবং নিজেদের বিবেককে সন্তুষ্ট করার জন্য তারা নিজেদের সাথে এমন মহান মর্যাদাশালী পয়গম্বরকেও কুফরের সেবা করার পংকে নামিয়ে আনলো, যাঁর জীবন তাদেরকে এ শিক্ষা দিচ্ছিল যে, কোন দেশে যদি শুধুমাত্র একজন মর্দে মুমিনও নির্ভেজাল ইসলামী চরিত্র এবং ঈমানী বুদ্ধিমত্তা ও বিচক্ষণতার অধিকারী থেকে থাকে, তাহলে সে একাকীই কেবলমাত্র নিজের চরিত্র ও বুদ্ধিমত্তার জোরে সে দেশে ইসলামী বিপ্লব সৃষ্টি করতে পারে। আর মর্দে মুমিনের চারিত্রিক শক্তি (শর্ত হচ্ছে, সে যেন তা ব্যবহার করতে জানে এবং ব্যবহার করার ইচ্ছাও রাখে) সেনাবাহিনী ও অস্ত্রশস্ত্র ছাড়াই দেশ জয় করতে পারে এবং রাষ্ট্র ও সরকারের ওপর বিজয় লাভ করে।

৪৮. অর্থাৎ এখন সমগ্র মিসর দেশ ছিল তার অধিকারভুক্ত। এ দেশের যে কোন জায়গায় তিনি নিজের আবাস গড়ে তুলতে পারতেন। এ দেশের কোন জায়গায় বসতি গড়ে তোলার ক্ষেত্রে তাঁকে বাধা দেবার ক্ষমতা কারো ছিল না। এ দেশের ওপর হযরত ইউসুফের যে পূর্ণাংগ কর্তৃত্ব অধিকার ছিল এ যেন ছিল তার বর্ণনা। প্রথম যুগের মুফাস্‌সিরগণ এ আয়াতের এ ব্যাখ্যাই করেছেন। ইবনে যায়েদের বরাত দিয়ে আল্লামা ইবনে জারীর তাবারী তাঁর নিজের তাফসীর গ্রন্থে এর এই অর্থ বর্ণনা করেছেন যে, "আমি ইউসুফকে মিসরে যা কিছু ছিল সব জিনিসের মালিক বানিয়ে দিলাম। দুনিয়ার সেই এলাকার যেখানেই সে যা কিছু চাইতো করতে পারতো। সেই দেশটির সমগ্র এলাকা তার হাতে সোপর্দ করে দেয়া হয়েছিল। এমনকি সে যদি ফেরাউনকে নিজের অধীনস্থ করে তার ওপর কর্তৃত্ব করতে চাইতো তাহলে তাও করতে পারতো।" আল্লামা তাবারী দ্বিতীয় একটি বক্তব্য উদ্ধৃত করেছেন, সেটি মুজাহিদের উক্তি। মুজাহিদ হচ্ছেন তাফসীর শাস্ত্রের প্রখ্যাত ইমাম। তাঁর মতে মিসরের বাদশাহ হযরত ইউসুফের হাতে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন।

وَجَآءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُۥ مُنكِرُونَ ﴿٥٨﴾
وَلَمَّا جَهَّزَهُم بِجَهَازِهِمْ قَالَ ٱئْتُونِى بِأَخٍ لَّكُم مِّنْ أَبِيكُمْ ۚ أَلَا تَرَوْنَ
أَنِّىٓ أُوفِى ٱلْكَيْلَ وَأَنَا۠ خَيْرُ ٱلْمُنزِلِينَ ﴿٥٩﴾ فَإِن لَّمْ تَأْتُونِى بِهِۦ فَلَا
كَيْلَ لَكُمْ عِندِى وَلَا تَقْرَبُونِ ﴿٦٠﴾ قَالُوا سَنُرَٰوِدُ عَنْهُ أَبَاهُ وَإِنَّا
لَفَٰعِلُونَ ﴿٦١﴾ وَقَالَ لِفِتْيَٰنِهِ ٱجْعَلُوا بِضَٰعَتَهُمْ فِى رِحَالِهِمْ لَعَلَّهُمْ
يَعْرِفُونَهَآ إِذَا ٱنقَلَبُوٓا إِلَىٰٓ أَهْلِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿٦٢﴾

৮ রুকূ'

ইউসুফের ভাইয়েরা মিসরে এলো এবং তার কাছে হাযির হলো।[৫০] সে তাদেরকে চিনে ফেললো। কিন্তু তারা তাকে চিনতে পারলো না।[৫১] তারপর সে যখন তাদের জিনিসপত্র তৈরী করালো তখন চলার সময় তাদেরকে বললো, "তোমাদের বৈমাত্রেয় ভাইকে আমাদের কাছে আনবে, দেখছো না আমি কেমন পরিমাপ পাত্র ভরে দেই এবং আমি কেমন ভালো অতিথিপরায়ণ? যদি তোমরা তাকে না আনো তাহলে আমার কাছে তোমাদের জন্য কোন শস্য নেই বরং তোমরা আমার ধারেকাছেও এসো না"।[৫২] তারা বললো, "আমরা চেষ্টা করবো যাতে আব্বাজান তাকে পাঠাতে রাযী হয়ে যান এবং আমরা নিশ্চয়ই এমনটি করবো।" ইউসুফ নিজের গোলামদেরকে ইশারা করে বললো, "ওরা শস্যের বিনিময়ে যে অর্থ দিয়েছে তা চুপিসারে ওদের জিনিসপত্রের মধ্যেই রেখে দাও।" ইউসুফ এটা করলো এ আশায় যে, বাড়িতে পৌঁছে তারা নিজেদের ফেরত পাওয়া অর্থ চিনতে পারবে (অথবা এ দানশীলতার ফলে তারা তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞ হবে) এবং বিচিত্র নয় যে, তারা আবার ফিরে আসবে।

৪৯. এখানে এ মর্মে সতর্ক করে দেয়া হয়েছে যে, কোন ব্যক্তি যেন পার্থিব রাষ্ট্র–ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব লাভ করাকে সততা ও সৎকর্মশীলতার প্রকৃত পুরস্কার ও যথার্থ কাংখিত প্রতিদান মনে না করে বসে। বরং তাকে জেনে রাখতে হবে যে, আল্লাহ আখেরাতে যে পুরস্কার দেবেন সেটিই সর্বোত্তম প্রতিদান এবং সেই প্রতিদানটিই মুমিনের কাংখিত হওয়া উচিত।

৫০. এখানে আবার সাত আট বছরের ঘটনা মাঝখানে বাদ দিয়ে বর্ণনার ধারাবাহিকতা এমন এক জায়গা থেকে শুরু করে দেয়া হয়েছে যেখান থেকে বনী ইসরাঈলের মিসরে

স্থানান্তরিত হবার এবং হযরত ইয়াকূবের (আ) হারানো ছেলের সন্ধান পাওয়ার সূত্রপাত হয়। মাঝখানে যেসব ঘটনা বাদ দেয়া হয়েছে সেগুলোর সংক্ষিপ্তসার হচ্ছে, হযরত ইউসুফের (আ) রাজত্বের প্রথম সাত বছর মিসরে প্রচুর শস্য উৎপন্ন হয়। এ সময় তিনি আসন্ন দুর্ভিক্ষের মোকাবিলা করার জন্য পূর্বাহ্নে এমন সমস্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করেন যার পরামর্শ তিনি স্বপ্নের তা'বীর বলার সময় বাদশাহকে দিয়েছিলেন। এরপর শুরু হয় দুর্ভিক্ষের যামানা। এ দুর্ভিক্ষ শুধু মিসরের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকেনি। আশেপাশের দেশগুলোতেও দুর্ভিক্ষ ছড়িয়ে পড়ে। সিরিয়া, ফিলিস্তিন, পূর্ব জর্দান, দক্ষিণ আরব সব জায়গায় চলে দুর্ভিক্ষের অবাধ বিচরণ। এ অবস্থায় হযরত ইউসুফের বিচক্ষণ ব্যবস্থাপনার কারণে একমাত্র মিসরে দুর্ভিক্ষ সত্ত্বেও খাদ্যশস্যের প্রাচুর্য থাকে। কাজেই প্রতিবেশী দেশগুলোর লোকেরা খাদ্যশস্য সংগ্রহের জন্য মিসরে আসতে বাধ্য হয়। এ সময় ফিলিস্তিন থেকে হযরত ইউসুফের (আ) ভাইয়েরা খাদ্যশস্য কেনার জন্য মিসরে পৌঁছে। সম্ভবত হযরত ইউসুফ (আ) খাদ্য ব্যবস্থা এমনভাবে গড়ে তোলেন যার ফলে বাইরের দেশগুলোয় বিশেষ অনুমতিপত্র ছাড়া এবং বিশেষ পরিমাণের বেশী খাদ্য সরবরাহ করা যেতে পারতো না। এ কারণে ইউসুফের ভাইয়েরা যখন বহির্দেশ থেকে এসে খাদ্য সংগ্রহ করতে চেয়েছিল তখন সম্ভবত তাদের বিশেষ অনুমতিপত্র সংগ্রহ করার প্রয়োজন হয়েছিল এবং এভাবেই তাদের হযরত ইউসুফের সামনে হাযির হতে হয়েছিল।

৫১. ইউসুফের ভাইয়েরা যে ইউসুফকে চিনতে পারেনি এটা কোন অযৌক্তিক বা অস্বাভাবিক ব্যাপার ছিল না। যে সময় তারা তাঁকে কূয়ায় ফেলে দিয়েছিল তখন তিনি ছিলেন সতের বছর বয়সের একটি কিশোর মাত্র। আর এখন তাঁর বয়স আটতিরিশ বছরের কাছাকাছি। এত দীর্ঘ সময়ে মানুষের চেহারার কাঠামোয় অনেক পরিবর্তন আসে। তাছাড়া যে ভাইকে তারা কূয়ায় ফেলে দিয়েছিল সে আজ মিসরের অধিপতি হবে, একথা তারা কল্পনাও করতে পারেনি।

৫২. বর্ণনা সংক্ষেপের কারণে হয়তো কারো পক্ষে একথা অনুধাবন করা কঠিন হয়ে পড়ছে যে, হযরত ইউসুফ যখন নিজের ব্যক্তিত্বকে তাদের সামনে প্রকাশ করতে চাচ্ছিলেন না তখন আবার তাদের বৈমাত্রেয় ভাইয়ের কথা এলো কেমন করে? এবং তাকে আনার ব্যাপারে তাঁর এত বেশী পীড়াপীড়ি করারই বা অর্থ কি? কেননা, এভাবে তো রহস্য ফাঁস হয়ে যাওয়ার আশংকা ছিল। কিন্তু সামান্য চিন্তা করলে একথা পরিষ্কার বুঝা যায়। সেখানে খাদ্যশস্যের নিয়ন্ত্রিত ব্যবস্থা ছিল এবং প্রত্যেক ব্যক্তি একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ খাদ্যশস্য গ্রহণ করতে পারতো। শস্য নেবার জন্য তারা দশ ভাই এসেছিল। কিন্তু তারা তাদের পিতার ও একাদশতম ভাইয়ের অংশও হয়তো চেয়েছিল। একথায় হযরত ইউসুফ (আ) বলে থাকবেন, বুঝলাম তোমাদের পিতার না আসার জন্য যথেষ্ট যুক্তিসংগত কারণ রয়েছে। তিনি অত্যন্ত বৃদ্ধ এবং তার ওপর চোখে দেখতে পান না, ফলে তাঁর পক্ষে সশরীরে আসা সম্ভব নয়। কিন্তু ভাইয়ের না আসার কি ন্যায়সঙ্গত কারণ থাকতে পারে? এমন তো নয় যে, একজন বানোয়াট ভাইয়ের নাম করে অতিরিক্ত শস্য সংগ্রহ করে তোমরা অবৈধ ব্যবসায়ে নামার চেষ্টা করছো? জওয়াবে তারা হয়তো নিজেদের গৃহের অবস্থা বর্ণনা করেছে। তারা বলে থাকবে, সে আমাদের বৈমাত্রেয় ভাই। কিছু অসুবিধার কারণে পিতা তাকে আমাদের সাথে পাঠাতে ইতস্তত করেন। তাদের এসব কথায় হযরত

فَلَمَّا رَجَعُوا إِلَىٰ أَبِيهِمْ قَالُوا يَا أَبَانَا مُنِعَ مِنَّا الْكَيْلُ فَأَرْسِلْ مَعَنَا
أَخَانَا نَكْتَلْ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ﴿٦٣﴾ قَالَ هَلْ آمَنُكُمْ عَلَيْهِ إِلَّا كَمَا
أَمِنتُكُمْ عَلَىٰ أَخِيهِ مِن قَبْلُ ۖ فَاللَّهُ خَيْرٌ حَافِظًا ۖ وَهُوَ أَرْحَمُ
الرَّاحِمِينَ ﴿٦٤﴾ وَلَمَّا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ وَجَدُوا بِضَاعَتَهُمْ رُدَّتْ إِلَيْهِمْ ۖ
قَالُوا يَا أَبَانَا مَا نَبْغِي ۖ هَٰذِهِ بِضَاعَتُنَا رُدَّتْ إِلَيْنَا ۖ وَنَمِيرُ أَهْلَنَا
وَنَحْفَظُ أَخَانَا وَنَزْدَادُ كَيْلَ بَعِيرٍ ۖ ذَٰلِكَ كَيْلٌ يَسِيرٌ ﴿٦٥﴾ قَالَ
لَنْ أُرْسِلَهُ مَعَكُمْ حَتَّىٰ تُؤْتُونِ مَوْثِقًا مِّنَ اللَّهِ لَتَأْتُنَّنِي بِهِ إِلَّا أَن
يُحَاطَ بِكُمْ ۖ فَلَمَّا آتَوْهُ مَوْثِقَهُمْ قَالَ اللَّهُ عَلَىٰ مَا نَقُولُ وَكِيلٌ ﴿٦٦﴾

যখন তারা তাদের বাপের কাছে ফিরে গেলো তখন বললো, "আব্বাজান। আগামীতে আমাদের শস্য দিতে অস্বীকার করা হয়েছে, কাজেই আমাদের ভাইকে আমাদের সাথে পাঠিয়ে দিন, যাতে আমরা শস্য নিয়ে আসতে পারি এবং অবশ্যি আমরা হেফাজতের জন্য দায়ী থাকবো।" বাপ জবাব দিল, "আমি কি ওর ব্যাপারে তোমাদের ওপর ঠিক তেমনি ভরসা করবো যেমন ইতিপূর্বে তার ভাইয়ের ব্যাপারে করেছিলাম? অবশ্য আল্লাহ সবচেয়ে ভালো হেফাজতকারী এবং তিনি সবচেয়ে বেশী করুণাশীল।" তারপর যখন তারা নিজেদের জিনিসপত্র খুললো, তারা দেখলো তাদের অর্থও তাদেরকে ফেরত দেয়া হয়েছে। এ দৃশ্য দেখে তারা চিৎকার করে উঠলো, "আব্বাজান, আমাদের আর কী চাই! দেখুন এই আমাদের অর্থও আমাদের ফেরত দেয়া হয়েছে। ব্যস্ এবার আমরা যাবো আর নিজেদের পরিজনদের জন্য রসদ নিয়ে আসবো, নিজেদের ভাইয়ের হেফাজতও করবো এবং অতিরিক্ত একটি উট বোঝাই করে শস্যও আনবো, এ পরিমাণ শস্য বৃদ্ধি অতি সহজেই হয়ে যাবে।" তাদের বাপ বললো, "আমি কখনোই তাকে তোমাদের সাথে পাঠাবো না যতক্ষণ না তোমরা আল্লাহর নামে আমার কাছে অংগীকার করবে। এ মর্মে যে তাকে নিশ্চয়ই আমার কাছে ফিরিয়ে নিয়ে আসবে তবে হাঁ যদি কোথাও তোমরা ঘেরাও হয়ে যাও তাহলে ভিন্ন কথা।" যখন তারা তার কাছে অংগীকার করলো তখন সে বললো, "দেখো, আল্লাহ আমাদের একথার রক্ষক।"

وَقَالَ يَٰبَنِيَّ لَا تَدْخُلُوا مِنْ بَابٍ وَاحِدٍ وَادْخُلُوا مِنْ أَبْوَابٍ مُتَفَرِّقَةٍ ۖ وَمَا أُغْنِي عَنْكُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ ۖ إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ ۖ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ ۖ وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ ﴿٦٧﴾ وَلَمَّا دَخَلُوا مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُمْ مَا كَانَ يُغْنِي عَنْهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا حَاجَةً فِي نَفْسِ يَعْقُوبَ قَضَاهَا ۚ وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِمَا عَلَّمْنَاهُ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٦٨﴾

তারপর সে বললো, "হে আমার সন্তানরা! মিসরের রাজধানীতে এক দরজা দিয়ে প্রবেশ করো না বরং বিভিন্ন দরজা দিয়ে প্রবেশ করো।[৫৩] কিন্তু আল্লাহর ইচ্ছা থেকে আমি তোমাদের বাঁচাতে পারি না। তাঁর ছাড়া আর কারোর হুকুম চলে না, তাঁর ওপরই আমি ভরসা করি এবং যার ভরসা করতে হয় তাঁর ওপরই করতে হবে।" আর ঘটনাক্ষেত্রে তা-ই হলো, যখন তারা নিজেদের বাপের নির্দেশ মতো শহরে (বিভিন্ন দরজা দিয়ে) প্রবেশ করল তখন তার এ সতর্কতামূলক ব্যবস্থা আল্লাহর ইচ্ছার মোকাবিলায় কোন কাজে লাগলো না। তবে হাঁ, ইয়াকূবের মনে যে একটি খটকা ছিল তা দূর করার জন্য সে নিজের মনমতো চেষ্টা করে নিল। অবশ্যি সে আমার দেয়া শিক্ষায় জ্ঞানবান ছিল কিন্তু অধিকাংশ লোক প্রকৃত সত্য জানে না।[৫৪]

ইউসুফ সম্ভবত বলেছেন, যাক এবারের জন্য তো আমি তোমাদের কথা বিশ্বাস করে পূর্ণ শস্য দিয়ে দিলাম কিন্তু আগামীতে তোমরা যদি তাকে সংগে করে না আনো তাহলে তোমাদের ওপর থেকে আস্থা উঠে যাবে এবং এখান থেকে তোমরা আর কোন শস্য পাবে না। এ শাসক সুলভ হুমকি দেবার সাথে সাথে তিনি নিজের দাক্ষিণ্য ও মেহমানদারীর মাধ্যমে তাদেরকে বশীভূত করার চেষ্টা করেন। কারণ নিজের ছোট ভাইকে দেখার এবং ঘরের অবস্থা জানার জন্য তাঁর মন অস্থির হয়ে পড়েছিল। এটি ছিল ঘটনার একটি সাদামাটা চেহারা। সামান্য একটু চিন্তা-ভাবনা করলে ব্যাপারটি আপনাআপনিই বুঝতে পারা যায়। এ অবস্থায় বাইবেলের আদি পুস্তকের ৪২-৪৩ অধ্যায়ে নানা প্রকার রং চড়িয়ে যে অতিরঞ্জিত কাহিনী বর্ণনা করা হয়েছে তার ওপর আস্থা স্থাপন করার কোন প্রয়োজন নেই।

৫৩. এ থেকে অনুমান করা যায়, ইউসুফের পরে তার ভাইকে পাঠাবার সময় হযরত ইয়াকূবের মন কত দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়েছিল। যদিও আল্লাহর প্রতি আস্থা ছিল এবং সবর

ও আত্মসমর্পণের দিক দিয়েও তাঁর স্থান ছিল অনেক উঁচুতে তবুও তো তিনি মানুষই ছিলেন। নানা সন্দেহ ও আশংকা তাঁর মনে জেগে ওঠা বিচিত্র নয় এবং স্বতই এ চিন্তায় তিনি পেরেশান হয়ে গিয়ে থাকবেন যে, আল্লাহই ভালো জানেন এখন এ ছেলের চেহারাও আর দেখতে পাবো কি না! তাই তিনি হয়তো নিজের সাধ্যমত সতর্কতা অবলম্বন করার ক্ষেত্রে কোনপ্রকার ত্রুটি না রাখতে চেয়েছিলেন।

সে সময় যে রাজনৈতিক অবস্থা বিরাজিত ছিল তার কথা চিন্তা করলেই এক দরজা দিয়ে সকল ভাইয়ের মিসরের রাজধানীতে প্রবেশ না করার এ সতর্কতামূলক পরামর্শটির তাৎপর্য পরিষ্কার বুঝা যেতে পারে। তারা ছিল মিসর সীমান্তের স্বাধীন উপজাতীয় এলাকার বাসিন্দা। বিচিত্র নয় যে, মিসরবাসীরা এ এলাকার লোকদেরকে ঠিক তেমনি সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখতো যেমন বৃটিশ শাসনামলে ভারতবর্ষের ইংরেজ শাসকরা সীমান্ত এলাকার স্বাধীন অধিবাসীদেরকে দেখে এসেছে। হযরত ইয়াকূবের মনে আশংকা জেগে থাকবে, এ দুর্ভিক্ষের দিনে যদি তারা দলবদ্ধ হয়ে সেখানে প্রবেশ করে তাহলে হয়তো তাদেরকে সন্দেহভাজন মনে করা হবে এবং ধারণা করা হবে, তারা এখানে লুটপাট করতে এসেছে। আগের আয়াতে হযরত ইয়াকূবের "তবে যদি তোমাদের ঘেরাও করা হয়" এ উক্তিটি নিজেই এ বিষয়বস্তুর দিকে ইংগিত করছে যে, রাজনৈতিক কারণে এ পরামর্শটি দেয়া হয়েছিল।

৫৪. এর অর্থ হচ্ছে, কৌশল ও আল্লাহর প্রতি নির্ভরশীলতার মধ্যে এ যথাযথ ভারসাম্য স্থাপন, যা তোমরা ইয়াকুব আলাইহিস সালামের উপরোল্লিখিত উক্তির মধ্যে পাও। আসলে আল্লাহর অনুগ্রহে তার সত্যজ্ঞানের যে ধারা বর্ষিত হয়েছিল এ ছিল তারই ফলশ্রুতি। একদিকে উপায় উপকরণের স্বাভাবিক বাধ্যবাধকতার বিধান অনুযায়ী তিনি এমন সব ব্যবস্থা অবলম্বন করেন, যা বুদ্ধি, চিন্তা ও অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে অবলম্বন করা সম্ভব ছিল। ছেলেদেরকে তাদের প্রথম অপরাধের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে ভয় দেখান ও সাবধান করে দেন, যাতে তারা পুনর্বার ঐ ধরনের অপরাধ করার সাহস না করে। তাদের কাছ থেকে বৈমাত্রেয় ভাইয়ের হেফাজত করার জন্য আল্লাহর নামে শপথ নেন এবং তদানীন্তন রাজনৈতিক অবস্থার প্রেক্ষিতে যে সতর্কতামূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করার প্রয়োজন অনুভূত হয় তা অবলম্বন করার জন্য তাদেরকে নির্দেশ দেন, যাতে নিজেদের সাধ্যমত ব্যবস্থাপনার মধ্যে এমন কোন ত্রুটি থাকতে না দেয়া হয় যার ফলে তারা ঘেরাও হয়ে যেতে পারে। কিন্তু অন্যদিকে প্রতি মূহূর্তে একথা তাঁর সামনে আছে এবং তিনি বারবার একথা প্রকাশও করেন যে, আল্লাহর ইচ্ছা প্রয়োগের পথে কোন মানবীয় কৌশল বাধার সৃষ্টি করতে পারে না। আল্লাহর হেফাজতই আসল হেফাজত এবং নিজের কৌশল ও ব্যবস্থাপনার ওপর ভরসা না করে আল্লাহর অনুগ্রহের ওপর ভরসা করা উচিত। যে ব্যক্তি প্রকৃত সত্যের জ্ঞান রাখে, যে ব্যক্তি একথাও জানে যে, দুনিয়ার জীবনের বাইরের দিকে আল্লাহর তৈরী প্রাকৃতিক ব্যবস্থা কোন্ ধরনের প্রচেষ্টা ও কাজ দাবী করে এবং একথাও জানে যে, এ বাহ্যিক দিকের পেছনে যে প্রকৃত সত্য লুকিয়ে আছে তার ভিত্তিতে আসল কার্যকর শক্তি কি এবং তার উপস্থিতিতে নিজের প্রচেষ্টা ও কাজের ওপর মানুষের ভরসা কত বেশী ভিত্তিহীন—একমাত্র সে-ই নিজের কথা ও কাজের মধ্যে এ সঠিক ভারসাম্য কায়েম করতে পারে। একথাটিই অধিকাংশ লোক জানে না। তাদের মধ্য

وَلَمَّا دَخَلُوْا عَلٰى يُوْسُفَ اٰوٰۤى اِلَيْهِ اَخَاهُ قَالَ اِنِّىْۤ اَنَا اَخُوْكَ فَلَا
تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿٦٩﴾ فَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ جَعَلَ السِّقَايَةَ
فِىْ رَحْلِ اَخِيْهِ ثُمَّ اَذَّنَ مُؤَذِّنٌ اَيَّتُهَا الْعِيْرُ اِنَّكُمْ لَسٰرِقُوْنَ ﴿٧٠﴾ قَالُوْا
وَاَقْبَلُوْا عَلَيْهِمْ مَّاذَا تَفْقِدُوْنَ ﴿٧١﴾ قَالُوْا نَفْقِدُ صُوَاعَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ
جَآءَ بِهٖ حِمْلُ بَعِيْرٍ وَّاَنَا بِهٖ زَعِيْمٌ ﴿٧٢﴾ قَالُوْا تَاللّٰهِ لَقَدْ عَلِمْتُمْ مَّا جِئْنَا لِنُفْسِدَ
فِى الْاَرْضِ وَمَا كُنَّا سٰرِقِيْنَ ﴿٧٣﴾ قَالُوْا فَمَا جَزَاۤؤُهٗۤ اِنْ كُنْتُمْ كٰذِبِيْنَ ﴿٧٤﴾

৯ রুকূ'

তারা ইউসুফের কাছে পৌঁছলে সে তার সহোদর ভাইকে নিজের কাছে আলাদা করে ডেকে নিল এবং তাকে বললো, "আমি তোমার সেই (হারানো) ভাই, এখন আর সেসব আচরণের জন্য দুঃখ করো না যা এরা করে এসেছে।"[৫৫]

যখন ইউসুফ তাদের মালপত্র বোঝাই করাতে লাগলো তখন নিজের ভাইয়ের মালপত্রের মধ্যে নিজের পেয়ালা রেখে দিল।[৫৬] তারপর একজন নকীব চীৎকার করে বললো, "হে যাত্রীদল! তোমরা চোর।"[৫৭] তারা পেছন ফিরে জিজ্ঞেস করলো, "তোমাদের কি হারিয়ে গেছে?" সরকারী কর্মচারী বললো, "আমরা বাদশাহর পানপাত্র পাচ্ছি না," (এবং তাদের জমাদার বললো ঃ) "যে ব্যক্তি তা এনে দেবে তার জন্য রয়েছে পুরস্কার এক উট বোঝাই মাল। আমি এর দায়িত্ব নিচ্ছি।" এ ভাইয়েরা বললো, "আল্লাহর কসম! তোমরা খুব ভালোভাবেই জানো, আমরা এ দেশে বিপর্যয় সৃষ্টি করতে আসিনি এবং চুরি করার মতো লোক আমারা নই।" তারা বললো, "আচ্ছা, যদি তোমাদের কথা মিথ্যা প্রমাণিত হয় তাহলে চোরের কি শাস্তি হবে?"

থেকে যাদের ওপর বাহ্যিক দিকের প্রভাব বেশী পড়ে তারা আল্লাহর প্রতি নির্ভরতা থেকে গাফেল হয়ে কৌশল ও ব্যবস্থা অবলম্বনকে সবকিছু মনে করে বসে এবং অন্তরনিহিত সত্য যার মনকে আচ্ছন্ন করে ফেলে সে জাগতিক কৌশল ও ব্যবস্থা অবলম্বন না করে শুধু মাত্র আল্লাহর প্রতি নির্ভরতার ভিত্তিতে জীবনের গাড়ি চালিয়ে নিয়ে যেতে চায়।

৫৫. একুশ বাইশ বছরের ব্যবধানে দু'ভাইয়ের পুনরমিলনের পর যে অবস্থার সৃষ্টি হয়ে থাকবে এ বাক্যে তার সম্পূর্ণ চেহারাটাই ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। হযরত ইউসুফ (আ)

قَالُوْا جَزَآؤُهٗ مَنْ وُّجِدَ فِيْ رَحْلِهٖ فَهُوَ جَزَآؤُهٗ ؕ كَذٰلِكَ نَجْزِي الظّٰلِمِيْنَ ۝٧٥

তারা জবাব দিল, "তার শাস্তি" যার মালপত্রের মধ্যে ঐ জিনিস পাওয়া যাবে তার শাস্তি হিসেবে তাকেই রেখে দেয়া হবে। আমাদের এখানে তো এটাই এ ধরনের জালেমদের শাস্তির পদ্ধতি।"৫৮

নিজের অবস্থা বর্ণনা করে কোন্ কোন্ অবস্থার মধ্য দিয়ে তিনি আজকের এ মর্যাদায় পৌছেছেন তা বলে থাকবেন। বিন ইয়ামীন বর্ণনা করে থাকবেন তাঁর অন্তরধানের পর বৈমাত্রেয় ভাইয়েরা তার সাথে কেমনতর দুর্ব্যবহার করেছে। হযরত ইউসুফ (আ) ভাইকে এই বলে সান্ত্বনা দিয়ে থাকবেন, এখন থেকে তুমি আমার কাছেই থাকবে, এ জালেমদের খপ্পরে তোমাকে আর দ্বিতীয়বার পড়তে দেবো না। সম্ভবত এ সময়ই বিন ইয়ামীনকে মিসরে আটকে রাখার জন্য কি ব্যবস্থা অবলম্বন করা হবে এবং প্রয়োজনের খাতিরে এখন তা গোপন রাখতে হবে এ ব্যাপারে আলোচনার পর দু'ভাই একটি সিদ্ধান্তে পৌছে যান।

৫৬. সম্ভবত পেয়ালা রেখে দেবার কাজটা হযরত ইউসুফ (আ) নিজের ভাইয়ের সম্মতি নিয়ে তার জ্ঞাতসারেই করেছিলেন। আগের আয়াতে এ দিকে ইংগিত করা হয়েছে। হযরত ইউসুফ (আ) দীর্ঘকালীন বিচ্ছেদের পর জালেম বৈমাত্রেয় ভাইদের হাত থেকে নিজের সহোদর ভাইকে রক্ষা করতে চাচ্ছিলেন। ভাই নিজেও এ জালেমদের সাথে ফিরে না যেতে চেয়ে থাকবেন। কিন্তু হযরত ইউসুফের নিজের পরিচয় প্রকাশ না করে তাকে প্রকাশ্যে আটকে রাখা এবং তার মিসরে থেকে যাওয়া সম্ভব ছিল না। আর এ অবস্থায় এ পরিচয় প্রকাশ করাটা কল্যাণকর ছিল না। তাই বিন ইয়ামীনকে আটকে রাখার জন্য দু'ভাইয়ের মধ্যে এ পরামর্শ হয়ে থাকবে। যদিও এর মধ্যে কিছুক্ষণের জন্য ভাইয়ের অপমান অনিবার্য ছিল, কারণ তার বিরুদ্ধে চুরির অভিযোগ আনা হচ্ছিল, কিন্তু পরে উভয় ভাই মিলে আসল ব্যাপারটি জনসমক্ষে প্রকাশ করে দিলেই এ কলংকের দাগ অতি সহজেই মুছে ফেলা যেতে পারবে।

৫৭. এ আয়াতে এবং পরবর্তী আয়াতগুলোতে কোথাও এ ধরনের কোন ইশারা পাওয়া যায় না, যা থেকে ধারণা করা যেতে পারে যে, হযরত ইউসুফ (আ) নিজের কর্মচারীদেরকে এ গোপন ব্যাপারটি পূর্বাহ্নে অবহিত করেছিলেন এবং তাদেরকে যাত্রীদলের বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ আনার ব্যাপারটি শিখিয়ে দিয়েছিলেন। ঘটনার যে সরল আকৃতিটি সহজেই চোখে ধরা পড়ে তা হচ্ছে এই যে, পেয়ালাটি হয়তো নীরবে রেখে দেয়া হয়েছিল, পরে সরকারী কর্মচারীরা সেটি খুঁজে না পেলে অনুমান করা হয়েছিল, এটা নিশ্চয় সেই কাফেলার অন্তরভুক্ত কোন লোকের কাজ যারা এখানে অবস্থান করেছিল।

৫৮. উল্লেখ্য, এ ভাইয়েরা ছিল ইবরাহিমী পরিবারের সন্তান। কাজেই চুরির ব্যাপারে তারা যে আইনের কথা বলে তা ছিল ইবরাহিমী শরীয়াতের আইন। এ আইন অনুযায়ী চোরের শাস্তি ছিল, যে ব্যক্তির সম্পদ সে চুরি করেছে তাকে তার দাসত্ব করতে হবে।

فَبَدَاَ بِاَوْعِيَتِهِمْ قَبْلَ وِعَاءِ اَخِيْهِ ثُمَّ اسْتَخْرَجَهَا مِنْ وِّعَاءِ اَخِيْهِ ؕ كَذٰلِكَ كِدْنَا لِيُوْسُفَ ؕ مَا كَانَ لِيَاْخُذَ اَخَاهُ فِيْ دِيْنِ الْمَلِكِ اِلَّاۤ اَنْ يَّشَاۤءَ اللّٰهُ ؕ نَرْفَعُ دَرَجٰتٍ مَّنْ نَّشَاۤءُ ؕ وَفَوْقَ كُلِّ ذِيْ عِلْمٍ عَلِيْمٌ ﴿۷۶﴾

তখন ইউসুফ নিজের ভাইয়ের আগে তাদের থলের তল্লাশী শুরু করে দিল। তারপর নিজের ভাইয়ের থলের মধ্য থেকে হারানো জিনিস বের করে ফেললো।—এভাবে আমি নিজের কৌশলের মাধ্যমে ইউসুফকে সহায়তা করলাম।[৫৯] বাদশাহর দীন (অর্থাৎ মিসরের বাদশাহর আইন) অনুযায়ী নিজের ভাইকে পাকড়াও করা তার পক্ষে সংগত ছিল না, তবে যদি আল্লাহই এমনটি চান।[৬০] যাকে চাই তার মর্তবা আমি বুলন্দ করে দেই। আর একজন জ্ঞানবান এমন আছে যে প্রত্যেক জ্ঞানবানের চেয়ে জ্ঞানী।

৫৯. এ সমগ্র ধারাবাহিক ঘটনাবলীতে আল্লাহর পক্ষ থেকে হযরত ইউসুফের সমর্থনে সরাসরি কোন্ কৌশলটি অবলম্বন করা হয়েছিল তা অবশ্যি এখানে ভেবে দেখার মতো বিষয়। একথা সুস্পষ্ট যে, পেয়ালা রাখার কৌশলটি হযরত ইউসুফ নিজেই করেছিলেন। এটাও সুস্পষ্ট, সরকারী কর্মচারীদের চুরির সন্দেহে কাফেলাকে আটকানোও একটি নিয়ম মাফিক কাজ ছিল, যা এ ধরনের অবস্থায় সব সরকারী কর্মচারীই করে থাকে। তাহলে আল্লাহর সেই কৌশল কোনটি? ওপরের আয়াতের মধ্যে অনুসন্ধান চালালে এ ছাড়া আর দ্বিতীয় কোন জিনিসই এর ক্ষেত্রহিসেবে পাওয়া যেতে পারে না যে, সরকারী কর্মচারীরা নিয়ম বিরোধীভাবে নিজেরাই সন্দেহপূর্ণ অপরাধীদের কাছে চুরির শাস্তি জিজ্ঞেস করলো এবং জবাবে তারাও এমন শাস্তির কথা বললো যা ইবরাহিমী শরীয়াতের দৃষ্টিতে চোরকে দেয়া হতো। এর ফলে দু'টি লাভ হলো। প্রথমত হযরত ইউসুফ ইবরাহিমী শরীয়াতকে কার্যকর করার সুযোগ পেলেন এবং দ্বিতীয়ত নিজের ভাইকে হাজতে পাঠাবার পরিবর্তে তিনি নিজের কাছে রাখতে পারলেন।

৬০. অর্থাৎ হযরত ইউসুফ (আ) নিজের একটি ব্যক্তিগত ব্যাপারে মিসরের বাদশাহর আইন কার্যকর করবেন, এটা তাঁর নবুওয়াতের মর্যাদার সাথে সামঞ্জস্যশীল ছিল না। ভাইকে আটকে রাখার জন্য তিনি নিজে যে কৌশল অবলম্বন করেছিলেন তার মধ্যে তাঁর জন্য একটি বাধা থেকে গিয়েছিল। অর্থাৎ তিনি ভাইকে আটক করতে পারতেন ঠিকই কিন্তু এ জন্য তাঁকে মিসরের বাদশাহর অপরাধ দণ্ডবিধির আশ্রয় নিতে হতো। আর এটি ছিল তাঁর পয়গম্বরীর মর্যাদা বিরোধী। কারণ তিনি ইসলাম বিরোধী আইনের জায়গায় ইসলামী শরীয়াতের আইন প্রয়োগ করার উদ্দেশ্যেই দেশের শাসন ক্ষমতা হাতে নিয়েছেলেন। আল্লাহ চাইলে তাঁর নবীকে এ ধরনের একটি বেমানান ভুলের অবতারণা

করতে দিতে পারতেন। কিন্তু এ কলংক কালিমা তাঁর গায়ে লেগে থাকুক এটা তিনি চাননি। তাই তিনি সরাসরি নিজ ব্যবস্থাপনায় একটি পথ বের করে দিলেন। ঘটনাক্রমে ইউসুফের ভাইদের কাছে চোরের শাস্তি কি হতে পারে তা জিজ্ঞেস করা হলো এবং তারা এ জন্য ইবরাহিমী শরীয়াতের আইন বর্ণনা করলো। ইউসুফের ভাইয়েরা মিসরের নাগরিক না হওয়ার কারণে এ জিনিসটি এদিক দিয়ে একেবারেই যথাযথ ছিল। তারা এসেছিল একটি স্বাধীন এলাকা থেকে। কাজেই তারা যদি তাদের এলাকায় প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী নিজেদের লোককে এমন এক ব্যক্তির দাসত্ব শৃংখলে আবদ্ধ করতে রাযী থাকে যার সম্পদ সে চুরি করেছে তাহলে এ ক্ষেত্রে আর মিসরীয় দণ্ডবিধির সাহায্য নেবার প্রয়োজনই থাকে না। পরবর্তী দু'টি আয়াতে আল্লাহ এ জিনিসটিকেই নিজের অনুগ্রহ ও তাত্বিক শ্রেষ্ঠত্ব হিসেবে বর্ণনা করেছেন। এক ব্যক্তি যখন তার মানবিক দুর্বলতার কারণে নিজে কোন পদস্খলনের শিকার হয় তখন আল্লাহ অদৃশ্য থেকে তাকে রক্ষা করার ব্যবস্থা করেন, তার জন্য এর চেয়ে বড় মর্যাদা আর কি হতে পারে! এ ধরনের উন্নত মর্যাদা একমাত্র তারাই লাভ করতে পারেন যারা নিজেদের প্রচেষ্টা ও কর্মের মাধ্যমে বড় বড় পরীক্ষায় নিজেদের 'মুহসিন' তথা সৎকর্মশীল হওয়া প্রমাণ করে দিয়েছেন। যদিও হযরত ইউসুফ (আ) তাত্বিক জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন, নিজে প্রখর প্রজ্ঞা ও বুদ্ধিমত্তা সহকারে কাজ করতেন, তবুও এ সময় তাঁর জ্ঞানের মধ্যে একটি ফাঁক থেকে গিয়েছিল এবং এমন এক সত্তা এ ফাঁক পূরণ করেছিলেন যিনি সবার চেয়ে বড় জ্ঞানী।

এখানে আরো কয়েকটি বিষয় ব্যাখ্যা সাপেক্ষ থেকে যায়। সেগুলো সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করবো।

এক ঃ সাধারণভাবে এ আয়াতটির অনুবাদ এভাবে করা হয়ে থাকে ঃ "বাদশাহর আইন মোতাবিক ইউসুফ নিজের ভাইকে পাকড়াও করতে পারতো না।" অর্থাৎ ما كان لياخذ কে অনুবাদক ও ব্যাখ্যাতাগণ অক্ষমতা অর্থে নিয়েছেন, অন্যায় বা অসংগত অর্থে নেননি। কিন্তু প্রথমত এ অনুবাদ ও ব্যাখ্যা আরবী বাকধারা ও কুরআনিক ব্যবহার উভয় দিক দিয়েই ঠিক নয়। কেননা আরবীতে সাধারণত ما كان له শব্দ ব্যবহৃত হয় ما ينبغى له ما صح له ، ما استقام له ইত্যাদি অর্থে। আর কুরআনেও এটি বেশীর ভাগ এ অর্থেই এসেছে। যেমন–

مَا كَانَ اللّٰهُ اَنْ يَّتَّخِذَ مِنْ وَّلَدٍ - مَا كَانَ لَنَا اَنْ نُّشْرِكَ بِاللّٰهِ مِنْ شَيْءٍ - مَا كَانَ اللّٰهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ - مَا كَانَ اللّٰهُ لِيُضِيْعَ اِيْمَانَكُمْ - فَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيَظْلِمَهُمْ - مَا كَانَ اللّٰهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِيْنَ عَلٰى مَا اَنْتُمْ عَلَيْهِ - مَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ اَنْ يَّقْتُلَ مُؤْمِنًا -

দ্বিতীয়ত অনুবাদক ও ব্যাখ্যাতাগণ সাধারণভাবে যে অর্থ বর্ণনা করেন যদি এর সে অর্থ গ্রহণ করা হয় তাহলে ব্যাপারটি অর্থহীন হয়ে পড়ে। বাদশাহর আইনে চোরকে পাকড়াও

করতে না পারার কি কারণ হতে পারে? দুনিয়ায় কি কখনো এমন পর্যায়েরও কোন রাষ্ট্র ছিল যার আইন চোরকে গ্রেফতার করার অনুমতি দিত না?

দুই ঃ রাজকীয় আইনের জন্য আল্লাহ دين الملك (বাদশাহর আইন) শব্দ ব্যবহার করে নিজেই ما كان لياخذ থেকে যে অর্থ গ্রহণ করা উচিত সেদিকে ইংগিত করেছেন। একথা সুস্পষ্ট যে, আল্লাহর নবীকে দুনিয়ায় পাঠানো হয়েছিল دين الله (আল্লাহর আইন) জারী কার জন্য, دين الملك (বাদশাহর আইন) জারী করার জন্য নয়। পরিবেশ ও পরিস্থিতির অনিবার্যতার কারণে যদি সেই রাষ্ট্রে সেই সময় পর্যন্ত বাদশাহর আইনের পরিবর্তে আল্লাহর আইন পুরোপুরি জারি করা সম্ভব না হয়ে থাকে তাহলে অন্ততপক্ষে নিজের একটি ব্যক্তিগত বিষয়ে বাদশাহর আইন কার্যকর করাতো নবীর পক্ষে সমিচীন ছিল না। কাজেই হযরত ইউসুফের (আ) বাদশাহর আইন অনুযায়ী নিজের ভাইকে গ্রেফতার না করার কারণ এটা ছিল না যে, বাদশাহর আইনে এ ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণের অবকাশ ছিল না বরং এর কারণ শুধু এটিই ছিল যে, নবী হিসেবে অন্ততপক্ষে নিজের ব্যক্তিগত ব্যাপারে আল্লাহর আইন কার্যকর করা তাঁর জন্য ফরয ছিল। এ ক্ষেত্রে বাদশাহর আইন অনুযায়ী কাজ করা তাঁর জন্য কোনক্রমেই সংগত ছিল না।

তিন ঃ দেশীয় আইনের (Law of the land) জন্য "দীন" শব্দ ব্যবহার করে আল্লাহর দীনের অর্থের ব্যাপকতা পুরোপুরি প্রকাশ করে দিয়েছেন। এ থেকে "দীন" সম্পর্কে এক ধরনের লোকদের ধারণার মূল উৎপাটিত হয়ে গেছে। তারা ধারণা করেন, নবীগণের দাওয়াত শুধুমাত্র সাধারণ ধর্মীয় অর্থে এক আল্লাহর পূজা উপাসনা-আরাধনা করা এবং নিছক কতিপয় ধর্মীয় আকীদা-বিশ্বাস ও রসম-রেওয়াজ মেনে চলার মধ্যেই সীমাবদ্ধ। তারা এও মনে করেন, মানুষের সমাজ-সংস্কৃতি, রাজনীতি, অর্থনীতি, আইন-আদালত এবং এ ধরনের অন্যান্য পার্থিব বিষয়াদির সাথে দীনের কোন সম্পর্ক নেই। অথবা যদি সম্পর্ক থাকে তাহলে উল্লেখিত বিষয়াদি সম্পর্কে দীনের নির্দেশাবলী নিছক ঐচ্ছিক সুপারিশের পর্যায়ভুক্ত। এগুলো কার্যকর করতে পারলে ভালো, অন্যথায় মানুষের নিজের হাতে গড়া বিধান মেনে চলায় কোন ক্ষতি নেই। এটি পুরোপুরি দীন সম্পর্কে একটি বিভ্রান্ত চিন্তা ছাড়া আর কিছুই নয়। দীর্ঘদিন থেকে মুসলমানদের মধ্যে এর অনুশীলন চলছে। মুসলমানদেরকে ইসলামী জীবন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা ও সংগ্রাম থেকে গাফেল করে দেবার ক্ষত্রে এটিই বেশীরভাগ দায়ী। এরি বদৌলতে মুসলমানরা কুফরী ও জাহেলী জীবন ব্যবস্থায় কেবল সন্তুষ্টই হয়নি বরং একজন নবীর সুন্নাত মনে করে এ ব্যবস্থার কল-কব্জায় পরিণত হতে এবং নিজেরাই তাকে পরিচালিত করতেও উদ্যোগী হয়েছে। এ আয়াতের দৃষ্টিতে এ চিন্তা ও কর্মনীতি পুরোপুরি ভুল প্রমাণিত হচ্ছে। এখানে সর্বশক্তিমান আল্লাহ পরিষ্কার ভাষায় বলছেন ঃ যেভাবে নামায, রোযা ও হজ্জ দীনের অন্তরভুক্ত ঠিক তেমনি যে আইনের ভিত্তিতে দেশ ও সমাজ ব্যবস্থা পরিচালনা করা হয় তাও দীনের অন্তরভুক্ত। কাজেই إِنَّ الدِّيْنَ عِنْدَ اللّٰهِ الْاِسْلَامُ এবং وَمَنْ يَّبْتَغِ غَيْرَ الْاِسْلَامِ دِيْنًا فَلَنْ يُّقْبَلَ مِنْهُ ইত্যাদি আয়াতগুলোতে যে দীনের প্রতি আনুগত্যের দাবী জানানো হয়েছে তার অর্থ শুধু নামায-রোযাই নয় বরং ইসলামের সমগ্র সমাজ ব্যবস্থাও তার আওতায় এসে যায়। এ ক্ষেত্রে আল্লাহর মনোনীত এ ব্যবস্থার প্রতি আনুগত্য পরিহার করে অন্য কোন ব্যবস্থার প্রতি আনুগত্য করা কোনক্রমেই গ্রহণযোগ্য হতে পারে না।

চার ঃ প্রশ্ন করা যেতে পারে, অন্ততপক্ষে এতটুকুন তো প্রমাণিত যে, এ সময় পর্যন্ত মিসরে রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে "বাদশাহর দীন"-ই জারী ছিল। যদি এ সরকারের প্রধান শাসনকর্তা হযরত ইউসুফই হয়ে থাকেন যেমন এর আগে আপনি প্রমাণ করেছেন, তাহলে তো দেখা যায় আল্লাহর নবী হযরত ইউসুফ নিজেই নিজের হাতে "বাদশাহর দীন" জারী করছিলেন। এরপর হযরত ইউসুফ যদি নিজের ব্যক্তিগত ব্যাপারে "বাদশাহর দীন"-এর পরিবর্তে ইবরাহীমের শরীয়াতকে কার্যকর করেন তাহলে তাতেই বা কি পার্থক্য হয়? এর জবাব হচ্ছে, হযরত ইউসুফ তো আল্লাহর দীন জারী করার জন্য নিযুক্ত হয়েছিলেন। এটিই ছিল তাঁর নবুওয়াতী মিশন এবং তাঁর শাসনের উদ্দেশ্য। কিন্তু একটি দেশের ব্যবস্থা কার্যত এক দিনেই বদলে দেয়া যায় না। আজ যদি কোন দেশ সম্পূর্ণভাবে আমাদের কর্তৃত্বাধীনে থাকে এবং আমরা সেখানে ইসলামী জীবন বিধান প্রতিষ্ঠার ঐকান্তিক সংকল্প সহকারে তার সামগ্রিক ব্যবস্থাপনা নিজেদের হাতে নেই, তাহলেও তার সামাজিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক এবং আইন ও আদালত ব্যবস্থা বাস্তবে পরিবর্তিত করতে কয়েক বছর লেগে যাবে। এ অবস্থায় কিছুকাল পর্যন্ত আমাদের ব্যবস্থাপনায়ও পূর্বের আইন বহাল রাখতে হবে। ইতিহাস কি একথার সাক্ষ দেয় না যে, আরবের জীবন ব্যবস্থায় পূর্ণ ইসলামী বিপ্লব সাধনের জন্য নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নয়-দশ বছর সময় লেগেছিল? এ সময় শেষ নবীর নিজের রাষ্ট্রেই কয়েক বছর মদ পান চলতে থাকে। সূদের লেন-দেন জারী থাকে। জাহেলী যুগের মীরাসী আইন জারী থাকে। পুরাতন বিয়ে-তালাকের আইন চালু থাকে। অনেক ধরনের অবৈধ ব্যবসায় কার্যকর হতে থাকে। প্রথম দিনেই ইসলামের দেওয়ানী ও ফৌজদারী আইন পুরোপুরি ও সর্বতোভাবে প্রবর্তিত হয়নি। কাজেই হযরত ইউসুফের রাষ্ট্রে যদি প্রথম আট-নয় বছর পর্যন্ত সাবেক মিসরীয় রাজতন্ত্রের কিছু আইন চালু থাকে তাহলে তাতে অবাক হবার কি আছে? আর এ থেকে আল্লাহর নবীকে মিসরে আল্লাহর দীন প্রবর্তনের জন্য নয় বরং বাদশাহর দীন প্রবর্তনের জন্য নিযুক্ত করা হয়েছিল, এ যুক্তির উদ্ভব হয় কেমন করে? তবে দেশে যখন বাদশাহর দীন জারী ছিলই তখন হযরত ইউসুফের নিজের ব্যক্তিগত ব্যাপারে তাকে কার্যকর করা তাঁর মর্যাদার সাথে সামঞ্জস্যশীল ছিল না কেন, এ প্রশ্নের জবাবও নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পদ্ধতি সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করলে সহজেই পাওয়া যায়। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের শাসন কালের প্রথম যুগে যতদিন ইসলামী আইন জারি হয়নি ততদিন লোকেরা পুরাতন পদ্ধতি অনুযায়ী শরাব পান করতে থাকে। কিন্তু নবী (সা) নিজেও কি শরাব পান করেন? লোকেরা সুদী লেনদেন করতো। কিন্তু তিনি নিজেও কি সুদী লেনদেন করেন? লোকেরা মুতা বিয়ে করতে থাকে এবং দুই সহোদরা বোনকে একসাথে বিয়ে করতে থাকে। কিন্তু নবী (সা)ও কি এমনটি করেন? এ থেকে জানা যায়, বাস্তব অক্ষমতার কারণে ইসলামের আহবায়কের ইসলামী বিধান জারি করার জন্য পর্যায়ক্রমে অগ্রসর হওয়া একটি ভিন্ন ব্যাপার এবং এ পর্যায়ক্রমে অগ্রসর হওয়ার যুগে তাঁর নিজের জাহেলী পদ্ধতিকে কার্যকর করা এর থেকে একটি সম্পূর্ণ ভিন্নতর ব্যাপার। পর্যায়ক্রমের কারণে যে ছুট দেয়া হয় তা অন্যদের জন্য। আহবায়ক নিজে এমন সব পদ্ধতির মধ্য থেকে কোন একটিকে বাস্তবায়িত করবেন যেগুলোকে নিশ্চিহ্ন করার জন্য তাঁকে নিযুক্ত করা হয়েছে, এটা আসলে তাঁর নিজের কাজ নয়।

قَالُوْٓا اِنْ يَّسْرِقْ فَقَدْ سَرَقَ اَخٌ لَّهٗ مِنْ قَبْلُ ۚ فَاَسَرَّهَا يُوْسُفُ فِيْ نَفْسِهٖ وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ ۚ قَالَ اَنْتُمْ شَرٌّ مَّكَانًا ۚ وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا تَصِفُوْنَ ﴿٧٧﴾ قَالُوْا يٰٓاَيُّهَا الْعَزِيْزُ اِنَّ لَهٗٓ اَبًا شَيْخًا كَبِيْرًا فَخُذْ اَحَدَنَا مَكَانَهٗ ۚ اِنَّا نَرٰىكَ مِنَ الْمُحْسِنِيْنَ ﴿٧٨﴾ قَالَ مَعَاذَ اللّٰهِ اَنْ نَّاْخُذَ اِلَّا مَنْ وَّجَدْنَا مَتَاعَنَا عِنْدَهٗٓ ۙ اِنَّآ اِذًا لَّظٰلِمُوْنَ ﴿٧٩﴾

এ ভাইয়েরা বললো, "এ যদি চুরি করে থাকে তাহলে অবাক হবার কিছু নেই, কারণ এর আগে এর ভাইও (ইউসুফ) চুরি করেছিল।"[৬১] ইউসুফ তাদের একথা শুনে আত্মস্থ করে ফেললো, সত্য তাদের কাছে প্রকাশ করলো না, শুধুমাত্র (মনে মনে) এতটুকু বলে থেমে গেলো, "বড়ই বদ তোমরা, (আমার সামনে দাঁড়িয়ে আমার ওপর) এই যে দোষারোপ তোমরা করছো সে সম্পর্কে আল্লাহ প্রকৃত সত্য ভালোভাবে অবগত।"

তারা বললো, " হে ক্ষমতাসীন সরদার (আযীয)![৬২] এর বাপ অত্যন্ত বৃদ্ধ, এর জায়গায় আপনি আমাদের কাউকে রেখে দিন। আমরা আপনাকে বড়ই সদাচারী ব্যক্তি হিসেবে পেয়েছি।" ইউসুফ বললেন, "আল্লাহর পানাহ! অন্য কাউকে আমরা কেমন করে রাখতে পারি? যার কাছে আমরা নিজেদের জিনিস পেয়েছি[৬৩] তাকে ছেড়ে দিয়ে অন্য কাউকে রাখলে আমরা জালেম হয়ে যাবো।"

৬১. আসলে নিজেদের অপমান স্খলন করার জন্য তারা একথা বলে। প্রথমে তারা বলে এসেছে, আমরা চোর নই। আর এখন দেখছে, তাদের ভাইয়ের থলের মধ্য থেকে হারানো জিনিসটি বের হচ্ছে। কাজেই এখন সংগে সংগেই একটি মিথ্যা কথা বলে সেই ভাই থেকে নিজেদেরকে আলাদা করে নিয়েছে এবং তার সাথে তার আগের ভাইকেও জড়িয়ে ফেলেছে। এ থেকে অনুমান করা যায়, হযরত ইউসুফের অবর্তমানে বিন ইয়ামিনের সাথে এ ভাইয়েরা কোন্ ধরনের ব্যবহার করে আসছে এবং কি কারণে তার ও হযরত ইউসুফের মনে এ আকাংখা জেগেছে যে, সে তাদের সাথে ফিরে না গিয়ে ওখানে থেকে যাক।

৬২. এখানে "আযীয" শব্দটি হযরত ইউসুফের জন্য ব্যবহার করার কারণে তাফসীরকারগণ ধারণা করে নিয়েছেন যে, যুলায়খার স্বামী ইতিপূর্বে যে পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন হযরত ইউসুফ সেই পদেই অধিষ্ঠিত হন। এরপর আরো ধারণা করা হয়েছে যে, পূর্ববর্তী আযীয মারা গিয়েছিল এবং হযরত ইউসুফ তার স্থলাভিষিক্ত হন। যুলায়খাকে নতুন করে অলৌকিকভাবে যুবতী বানিয়ে দেয়া হয় এবং মিসরের বাদশাহ হযরত

ইউসুফের সাথে তাঁর বিয়ে দেন। এমন কি বাসর রাতে হযরত ইউসুফের সাথে যুলায়খার যে কথাবার্তা হয় তাও পর্যন্ত আমাদের একশ্রেণীর তাফসীরকারগণের কাছে পৌছে যায়। অথচ একথাগুলো সবই কাল্পনিক। "আযীয" শব্দটি সম্পর্কে আমি আগেই একথা বলে এসেছি যে, মিসরে এটি কোন বিশেষ পদবী হিসেবে চিহ্নিত ছিল না বরং নিছক "কর্তৃত্বশালী" অর্থে শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। সম্ভবত মিসরে বড় বড় লোকদের জন্য এ ধরনের কিছু শব্দ পারিভাষিক অর্থে প্রচলিত ছিল, যেমন আমাদের দেশে "সরকার" শব্দটির প্রচলন দেখা যায়। এরি অনুবাদ কুরআনে "আযীয" শব্দের মাধ্যমে করা হয়েছে। আর যুলায়খার সাথে হযরত ইউসুফের বিয়ের যে গল্প ফাঁদা হয়েছে এর ভিত্তি শুধু এতটুকুই যে, বাইবেল ও তালমূদে পোটিফেরের মেয়ে আস্নাত–এর সাথে তার বিয়ের ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে। ওদিকে যুলায়খার স্বামীর নামও ছিল পোটিফর। এ ঘটনাগুলো ইসরাঈলী বর্ণনা থেকে বিভিন্ন পর্যায়ে উদ্ধৃত হতে হতে মুফাস্সিরগণের কাছে পৌছে যায়। তারপর গুজব ও জনশ্রুতির বিস্তার লাভের প্রচলিত রীতি অনুযায়ী। পোটিফের সহজেই পোটিফর হয়ে গেছে। মেয়ে হয়ে গেছে স্ত্রী। আর এ স্ত্রী নিশ্চিতভাবেই হয়ে গেছে যুলায়খা। কাজেই তার সাথে হযরত ইউসুফের বিয়ে দেবার জন্য পোটিফরকে হত্যা করা হয়েছে। এভাবেই "ইউসুফ যুলায়খার" উপাখ্যান পূর্ণতা লাভ করেছে।

৬৩. এখানে কতদূর সতর্কতা অবলম্বন করা হয়েছে একবার তলিয়ে দেখুন। এখানে "চোর" বলা হচ্ছে না বরং কেবল এতটুকু বলা হচ্ছে, "যার কাছে আমরা আমাদের জিনিস পেয়েছি।" শরীয়াতী পরিভাষায় একেই বলা হয় "তাওরীয়া" অর্থাৎ "সত্যকে সুকৌশলে গোপন করা"। যখন কোন মজলুমকে জালেমের হাত থেকে বাঁচাবার অথবা কোন বড় আকারের জুলুমের প্রতিরোধ করার জন্য প্রকৃত ঘটনার বিপরীত কথা বলা বা সত্য বিরোধী বাহানাবাজী করা ছাড়া আর কোন উপায় থাকে না তখন এ অবস্থায় একজন আল্লাহভীরু ব্যক্তি সুস্পষ্ট মিথ্যা এড়িয়ে এমন কথা বলবে বা এমন কৌশল অবলম্বন করার চেষ্টা করবে যার ফলে প্রকৃত সত্যকে গোপন করে দুষ্কৃতিকে রোধ করা যেতে পারে। এমনটি করা শরীয়াত ও নৈতিকতার দৃষ্টিতে বৈধ, তবে এখানে শর্ত থাকবে যে, নিছক কার্যোদ্ধার করার জন্য এমনটি করা যাবে না বরং কোন বড় আকারের দুষ্কৃতি দূর করাই হবে উদ্দেশ্য। এখন এ সমগ্র ব্যাপারটিতে হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালাম কেমন ধরনের বৈধ তাওরীয়ার শর্ত পূরণ করেছেন দেখুন ঃ ভাইয়ের সম্মতিক্রমে তার মালপত্রের মধ্যে নিজের পেয়ালাটি রেখে দিয়েছেন। কিন্তু কর্মচারীদেরকে একথা বলেননি যে, এর বিরুদ্ধে চুরির অভিযোগ দায়ের করো। তারপর সরকারী কর্মচারীরা যখন চুরির অভিযোগে তাদেরকে ধরে এনেছে তখন কোন প্রকার হৈ চৈ না করে নীরবে তাদের মালপত্র তল্লাশী করতে শুরু করেছেন। এরপর যখন এ ভাইয়েরা বললো, বিন ইয়ামীনের জায়গায় আমাদের কাউকে রাখুন তখন এর জবাবে তাদেরই কথা তাদের দিকে ফিরিয়ে দিয়েছেন এই বলে যে, তোমরাইতো ফতোয়া দিয়েছিলে, যার মালপত্রের মধ্য থেকে পেয়ালা বের হবে তাকেই রেখে দেয়া হবে। কাজেই এখন তোমাদের সামনে বিন ইয়ামীনের মালপত্রের মধ্য থেকে আমাদের জিনিস বের হয়েছে এবং তাকেই আমরা রেখে দিচ্ছি। অন্যকে তার জায়গায় আমরা কেমন করে রাখতে পারি? এ ধরনের তাওরীয়ার দৃষ্টান্ত নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুদ্ধবিগ্রহের ইতিহাসেও পাওয়া যাবে। কোন যুক্তি দিয়ে নৈতিক দৃষ্টিতে একে দোষণীয়ও বলা যেতে পারে না।

فَلَمَّا اسْتَيْئَسُوا مِنْهُ خَلَصُوا نَجِيًّا ۖ قَالَ كَبِيرُهُمْ أَلَمْ تَعْلَمُوا أَنَّ
أَبَاكُمْ قَدْ أَخَذَ عَلَيْكُمْ مَوْثِقًا مِنَ اللَّهِ وَمِنْ قَبْلُ مَا فَرَّطْتُمْ فِي
يُوسُفَ ۖ فَلَنْ أَبْرَحَ الْأَرْضَ حَتَّىٰ يَأْذَنَ لِي أَبِي أَوْ يَحْكُمَ اللَّهُ
لِي ۖ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ ﴿٨٠﴾ ارْجِعُوا إِلَىٰ أَبِيكُمْ فَقُولُوا يَا أَبَانَا إِنَّ
ابْنَكَ سَرَقَ ۖ وَمَا شَهِدْنَا إِلَّا بِمَا عَلِمْنَا وَمَا كُنَّا لِلْغَيْبِ حَافِظِينَ ﴿٨١﴾
وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا وَالْعِيرَ الَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا ۖ وَإِنَّا
لَصَادِقُونَ ﴿٨٢﴾ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَمْرًا ۖ فَصَبْرٌ جَمِيلٌ ۖ
عَسَى اللَّهُ أَنْ يَأْتِيَنِي بِهِمْ جَمِيعًا ۚ إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ﴿٨٣﴾

১০ রুকূ'

যখন তারা ইউসুফের কাছ থেকে নিরাশ হয়ে গেলো তখন একান্তে পরামর্শ করতে লাগলো। তাদের মধ্যে যে সবচেয়ে বয়সে বড় ছিল সে বললো : "তোমরা কি জান না, তোমাদের বাপ তোমাদের কাছ থেকে আল্লাহর নামে কি অংগীকার নিয়েছেন এবং ইতিপূর্বে ইউসুফের ব্যাপারে তোমরা যেসব বাড়াবাড়ি করেছো তাও তোমরা জানো। এখন আমি তো এখান থেকে কখনোই যাবো না যে পর্যন্ত না আমার বাপ আমাকে অনুমতি দেন অথবা আল্লাহ আমার ব্যাপারে কোন ফায়সালা করে দেন, কেননা তিনি সবচেয়ে ভালো ফায়সালাকারী। তোমরা তোমাদের বাপের কাছে ফিরে গিয়ে বলো, "আব্বাজান, আপনার ছেলে চুরি করেছে, আমরা তাকে চুরি করতে দেখিনি, যতটুকু আমরা জেনেছি শুধু ততটুকুই বর্ণনা করছি এবং অদৃশ্যের রক্ষণাবেক্ষণ করা তো আমাদের পক্ষে সম্ভবপর ছিল না। আমরা যে পল্লীতে ছিলাম সেখানকার লোকজনদেরকে জিজ্ঞেস করে দেখুন এবং যে কাফেলার সাথে আমরা ছিলাম তাকে জিজ্ঞেস করে দেখুন, আমরা যা বলছি সত্য বলছি।"

ইয়াকূব এ কাহিনী শুনে বললো, "আসলে তোমাদের মন তোমাদের জন্য আরো একটি বড় ঘটনাকে সহজ করে দিয়েছে।[৬৪] ঠিক আছে, এ ব্যাপারেও আমি সবর করবো এবং ভালো করেই করবো। হয়তো আল্লাহ এদের সবাইকে এনে আমার সাথে মিলিয়ে দেবেন। তিনি সবকিছু জানেন এবং তিনি জ্ঞানের ভিত্তিতে সমস্ত কাজ করেন।"

وَتَوَلّٰى عَنْهُمْ وَقَالَ يٰٓاَسَفٰى عَلٰى يُوْسُفَ وَابْيَضَّتْ عَيْنٰهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيْمٌ ۝٨٤ قَالُوْا تَاللّٰهِ تَفْتَؤُا تَذْكُرُ يُوْسُفَ حَتّٰى تَكُوْنَ حَرَضًا اَوْ تَكُوْنَ مِنَ الْهٰلِكِيْنَ ۝٨٥ قَالَ اِنَّمَآ اَشْكُوْا بَثِّيْ وَحُزْنِيْٓ اِلَى اللّٰهِ وَاَعْلَمُ مِنَ اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ۝٨٦ يٰبَنِيَّ اذْهَبُوْا فَتَحَسَّسُوْا مِنْ يُّوْسُفَ وَاَخِيْهِ وَلَا تَايْـَٔسُوْا مِنْ رَّوْحِ اللّٰهِ ۭ اِنَّهٗ لَا يَايْـَٔسُ مِنْ رَّوْحِ اللّٰهِ اِلَّا الْقَوْمُ الْكٰفِرُوْنَ ۝٨٧ فَلَمَّا دَخَلُوْا عَلَيْهِ قَالُوْا يٰٓاَيُّهَا الْعَزِيْزُ مَسَّنَا وَاَهْلَنَا الضُّرُّ وَجِئْنَا بِبِضَاعَةٍ مُّزْجٰىةٍ فَاَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا ۭ اِنَّ اللّٰهَ يَجْزِي الْمُتَصَدِّقِيْنَ ۝٨٨

তারপর সে তাদের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে বসে গেলো এবং বলতে লাগলো, "হায় ইউসুফ"— সে মনে মনে দুঃখে ও শোকে জর্জরিত হয়ে যাচ্ছিল এবং তার চোখগুলো সাদা হয়ে গিয়েছিল,—ছেলেরা বললো, "আল্লাহর দোহাই। আপনি তো শুধু ইউসুফের কথাই স্মরণ করে যাচ্ছেন। অবস্থা এখন এমন পর্যায়ে পৌছে গেছে যে, তার শোকে আপনি নিজেকে দিশেহারা করে ফেলবেন অথবা নিজের প্রাণ সংহার করবেন।" সে বললো, "আমি আমার পেরেশানি এবং আমার দুঃখের ফরিয়াদ আল্লাহ্ ছাড়া আর কারো কাছে করছি না। আর আল্লাহর ব্যাপারে আমি যতটুকু জানি তোমরা ততটুকু জানো না। হে আমার ছেলেরা। তোমরা যাও এবং ইউসুফ ও তার ভাইয়ের ব্যাপারে কিছু অনুসন্ধান চালাও। আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না। তাঁর রহমত থেকে তো একমাত্র কাফেররাই নিরাশ হয়।"

যখন তারা মিসরে গিয়ে ইউসুফের সামনে হাযির হলো তখন আরয করলো, "হে পরাক্রান্ত শাসক। আমরা ও আমাদের পরিবার পরিজন কঠিন বিপদের মুখোমুখি হয়েছি এবং আমরা মাত্র সামান্য পুঁজি নিয়ে এসেছি। আপনি আমাদের পূর্ণমাত্রায় শস্য দিয়ে দিন এবং আমাদেরকে দান করুন,[৬৫] আল্লাহ দানকারীদেরকে প্রতিদান দেন।"

৬৪. অর্থাৎ আমার ছেলের চারিত্রিক সততা সম্পর্কে আমি ভালোভাবেই জানি। তার একটি পেয়ালা চুরির দোষে অভিযুক্ত হবার কথা মেনে নেয়া তোমাদের জন্য সহজ হতে

قَالَ هَلْ عَلِمْتُمْ مَّا فَعَلْتُمْ بِيُوسُفَ وَأَخِيهِ إِذْ أَنْتُمْ جٰهِلُونَ ﴿٨٩﴾ قَالُوٓا ءَإِنَّكَ لَأَنْتَ يُوسُفُ ۖ قَالَ أَنَا يُوسُفُ وَهٰذَآ أَخِى ۖ قَدْ مَنَّ اللّٰهُ عَلَيْنَا ۖ إِنَّهُ مَنْ يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللّٰهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ ﴿٩٠﴾ قَالُوا تَاللّٰهِ لَقَدْ اٰثَرَكَ اللّٰهُ عَلَيْنَا وَإِنْ كُنَّا لَخٰطِئِينَ ﴿٩١﴾ قَالَ لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ ۖ يَغْفِرُ اللّٰهُ لَكُمْ ۖ وَهُوَ أَرْحَمُ الرّٰحِمِينَ ﴿٩٢﴾ اِذْهَبُوا بِقَمِيصِى هٰذَا فَأَلْقُوهُ عَلٰى وَجْهِ أَبِى يَأْتِ بَصِيرًا ۚ وَأْتُونِى بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ ﴿٩٣﴾

(একথা শুনে ইউসুফ আর চুপ থাকতে পারলো না) সে বললো, "তোমরা কি জানো, তোমরা ইউসুফ ও তার ভাইয়ের সাথে কি ব্যবহার করেছিলে, যখন তোমরা অজ্ঞ ছিলে?" তারা চমকে উঠে বললো, "হায় তুমিই ইউসুফ নাকি?" সে বললো, "হাঁ, আমি ইউসুফ এবং এই আমার সহোদর। আল্লাহ আমাদের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন। আসলে কেউ যদি তাকওয়া ও ছবর অবলম্বন করে তাহলে আল্লাহর কাছে এ ধরনের সৎলোকদের কর্মফল নষ্ট হয়ে যায় না।" তারা বললো, "আল্লাহর কসম, আল্লাহ তোমাকে আমাদের ওপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন এবং যথার্থই আমরা অপরাধী ছিলাম।" সে জবাব দিল, "আজ তোমাদের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ নেই। আল্লাহ তোমাদের মাফ করে দিন। তিনি সবার প্রতি অনুগ্রহকারী। যাও, আমার এ জামাটি নিয়ে যাও এবং এটি আমার পিতার চেহারার ওপর রেখো, তিনি দৃষ্টিশক্তি ফিরে পাবেন। আর তোমাদের সমস্ত পরিবার পরিজনকে আমার কাছে নিয়ে এসো।"

পারে। ইতিপূর্বে তোমাদের জন্য তোমাদের এক ভাইকে জেনেবুঝে নিখোজ করে দেয়া এবং তার পোশাকে কৃত্রিম রক্ত লাগিয়ে আনা খুব সহজ কাজ হয়ে গিয়েছিল। আর এখন অন্য এক ভাইকে সত্যি সত্যি চোর বলে মেনে নেয়া এবং আমাকে এসে তার খবর দেয়াও তেমনি সহজ কাজ হয়ে গেছে।

৬৫. অর্থাৎ আমাদের এ আবেদনে সাড়া দিয়ে আপনি যাকিছু দেবেন তাই যেন আপনি আমাদের দান করছেন বলে মনে করা হবে। এ শস্যের মূল্য হিসেবে যে অর্থ আমরা দিচ্ছি তা আমাদের প্রয়োজনের জন্য যথেষ্ট পরিমাণ শস্যের মূল্য হিসেবে বিবেচিত হবার অবশ্যি যোগ্যতা রাখে না।

وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ قَالَ أَبُوهُمْ إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ لَوْلَا
أَنْ تُفَنِّدُونِ ﴿٩٤﴾ قَالُوا تَاللّٰهِ إِنَّكَ لَفِي ضَلٰلِكَ الْقَدِيمِ ﴿٩٥﴾ فَلَمَّا أَنْ
جَاءَ الْبَشِيرُ أَلْقٰهُ عَلٰى وَجْهِهٖ فَارْتَدَّ بَصِيرًا ۚ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَّكُمْ ۚ
إِنِّيٓ أَعْلَمُ مِنَ اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٩٦﴾ قَالُوا يٰٓأَبَانَا اسْتَغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَآ
إِنَّا كُنَّا خٰطِئِينَ ﴿٩٧﴾ قَالَ سَوْفَ أَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّيْ ۖ إِنَّهٗ هُوَ الْغَفُورُ
الرَّحِيمُ ﴿٩٨﴾ فَلَمَّا دَخَلُوا عَلٰى يُوسُفَ اٰوٰٓى إِلَيْهِ أَبَوَيْهِ وَقَالَ ادْخُلُوا
مِصْرَ إِنْ شَآءَ اللّٰهُ اٰمِنِينَ ﴿٩٩﴾

১১ রুকূ'

কাফেলাটি যখন (মিসর থেকে) রওয়ানা দিল তখন তাদের বাপ (কেনানে) বললো, "আমি ইউসুফের গন্ধ পাচ্ছি,[৬৬] তোমরা যেন আমাকে একথা বলো না যে, বুড়ো বয়সে আমার বুদ্ধিভ্রষ্ট হয়েছে।" ঘরের লোকেরা বললো, "আল্লাহর কসম, আপনি এখনো নিজের সেই পুরাতন পাগলামি নিয়েই আছেন।"[৬৭]

তারপর যখন সুখবর বহনকারী এলো তখন সে ইউসুফের জামা ইয়াকূবের চেহারার ওপর রাখলো এবং অকস্মাত তার দৃষ্টিশক্তি ফিরে এলো। তখন সে বললো, "আমি না তোমাদের বলেছিলাম, আমি আল্লাহর পক্ষ থেকে এমন সব কথা জানি যা তোমরা জানো না?" সবাই বলে উঠলো, "আব্বাজান! আপনি আমাদের গুনাহ মাফের জন্য দোয়া করুন, সত্যিই আমরা অপরাধী ছিলাম।" তিনি বললেন, "আমি আমার রবের কাছে তোমাদের মাগফেরাতের জন্য আবেদন জানাবো, তিনি বড়ই ক্ষমাশীল ও করুণাময়।"

তারপর যখন তারা ইউসুফের কাছে পৌঁছুলো[৬৮] তখন সে নিজের বাপ–মাকে নিজের কাছে বসালো[৬৯] এবং (নিজের সমগ্র পরিবার পরিজনকে) বললো, "চলো, এবার শহরে চলো, আল্লাহ চাহেতো শান্তি ও নিরাপত্তার মধ্যে বসবাস করবে।"

৬৬. আল্লাহর নবীগণ কেমন অসাধারণ শক্তির অধিকারী হয়ে থাকেন, এ ঘটনা থেকে সে সম্পর্কে ধারণা জন্মে। একদিকে হযরত ইউসুফের (আ) জামা নিয়ে মিসর থেকে কাফেলা সবেমাত্র রওয়ানা দিচ্ছে আর অন্যদিকে শত শত মাইল দূরে হযরত ইয়াকূব

(আ) তার গন্ধ পাচ্ছেন। কিন্তু এ থেকে একথাও জানা যায় যে, নবীগণের এ শক্তিগুলো আসলে তাঁদের সহজাত ছিল না বরং এগুলো আল্লাহ তাঁদেরকে দান করেছিলেন এবং আল্লাহ যখন ও যে পরিমাণ চাইতেন এ শক্তিকে কাজে লাগানোর সুযোগ দিতেন। হযরত ইউসুফ (আ) বহু বছর যাবত মিসরে রয়েছেন এবং সে সময় হযরত ইয়াকূব (আ) কখনো তাঁর গন্ধ পাননি। কিন্তু এখন হঠাৎ ঘ্রাণ শক্তি এত তীব্র হয়ে গেলো যে, তাঁর জামা মিসর থেকে চলা শুরু হওয়ার সাথে সাথেই তিনি তার সুগন্ধ পেতে শুরু করলেন।

এখানে এ আলোচনাও কম গুরুত্বপূর্ণ নয় যে, একদিকে কুরআন হযরত ইয়াকূব আলাইহিস সালামকে এভাবে পয়গম্বরের বিপুল মর্যাদা সহকারে পেশ করছে কিন্তু অন্যদিকে বনী ইসরাঈল তাঁকে পেশ করছে আরবের একজন সাধারণ বেদুইনের মতো করে। বাইবেলের বর্ণনা মতে, যখন ছেলেরা এসে খবর দিল, "ইউসুফ এখনো বেঁচে আছে এবং সে-ই সারা মিসর দেশের শাসনকর্তা তখন ইয়াকূব হতভম্ব হয়ে গেলেন। কেননা তিনি এটা বিশ্বাস করতে পারছিলেন না......... পরে যখন তিনি তাঁদের নিয়ে যাবার জন্য ইউসুফের পাঠানো শকটগুলো দেখলেন তখন তাঁর ধড়ে প্রাণ এলো।" (আদি পুস্তক ৪৫ : ২৬-২৭)

৬৭. এ থেকে বুঝা যায়, সমগ্র পরিবারে হযরত ইউসুফ (আ) ছাড়া তাদের পিতার মর্যাদা উপলব্ধিকারী আর দ্বিতীয় কোন ব্যক্তি ছিল না। হযরত ইয়াকূব (আ) নিজেও তাদের এ মানসিক ও নৈতিক অধোপতনের কারণে হতাশ ছিলেন। গৃহের প্রদীপের আলো বাইরে ছড়িয়ে পড়ছিল কিন্তু গৃহবাসীরা নিজেরাই আঁধারের মধ্যে বাস করছিল। তাদের দৃষ্টিতে তিনি একটি পোড়া মাটি ছাড়া আর কিছুই ছিলেন না। ইতিহাসের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিদের অধিকাংশই প্রকৃতির এ নির্মম পরিহাসের শিকার হয়েছেন।

৬৮. বাইবেলের বর্ণনামতে এ সময় মিসরে আগমনকারী হযরত ইয়াকূবের (আ) পরিবারের সদস্য সংখ্যা মোট ৬৭ ছিল। অন্যান্য পরিবারের যেসব মেয়েকে হযরত ইয়াকূবের (আ) পরিবারে বিয়ে দেয়া হয়েছিল তাদেরকে এ সংখ্যার অন্তরভুক্ত করা হয়নি। এ সময় হযরত ইয়াকূবের (আ) বয়স ছিল ১৩০ বছর এবং এরপরও তিনি মিসরে ১৭ বছর জীবিত থাকেন।

এখানে একজন জ্ঞানানুসন্ধানীর মনে প্রশ্ন জাগে, বনী ইসরাঈল যখন মিসরে প্রবেশ করে তখন হযরত ইউসুফ (আ) সহ তাদের সংখ্যা ছিল ৬৮ এবং প্রায় ৫ শত বছর পর যখন তারা মিসর থেকে বের হয় তখন তাদের সংখ্যা ছিল কয়েক লাখ। বাইবেলের বর্ণনা অনুযায়ী মিসর ত্যাগ করার পরের বছর সিনাইয়ের মরু এলাকায় হযরত মূসা (আ) তাদের যে আদমশুমারী করান তাতে কেবলমাত্র যুদ্ধ করতে সমর্থ যুবকদের সংখ্যা ৬,০৩,৫৫০ ছিল। এর মানে এ দাঁড়ায়, নারী-পুরুষ-শিশু মিলিয়ে সব শুদ্ধ তাদের সংখ্যা হবে অন্তত ২০ লাখ। কোন হিসেবে কি ৬৮ জন থেকে ৫শত বছরে বংশবৃদ্ধি পেয়ে ২০ লাখ হতে পারে? যদি ধরা যায়, সারা মিসরের জনসংখ্যা এ সময় ছিল ২ কোটি (যা অবশ্যি খুব বেশী অতিরঞ্জিত বিবেচিত হবে) তাহলে এর অর্থ এ দাঁড়াবে যে, শুধুমাত্র বনী ইসরাঈলের সংখ্যাই সেখানে ছিল শতকরা ১০ ভাগ। শুধুমাত্র বংশবৃদ্ধির মাধ্যমে একটি পরিবারের লোকসংখ্যা কি এ পরিমাণ বৃদ্ধি পেতে পারে? এ প্রশ্নটি সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করলে একটি গুরুত্বপূর্ণ সত্যের প্রকাশ ঘটে। একথা ঠিক ৫শত বছরে একটি পরিবারের

লোকসংখ্যা এত বেশী বাড়তে পারে না। কিন্তু বনী ইসরাঈল ছিল নবীদের সন্তান। তাদের নেতা হযরত ইউসুফের (আ) বদৌলতে তারা মিসরে প্রতিষ্ঠিত হতে পেরেছিল। এ ইউসুফ (আ) নিজেই ছিলেন নবী। তাঁর পর থেকে চার পাঁচশো বছর পর্যন্ত দেশের শাসন কর্তৃত্ব তাদেরই হাতে ছিল। এ সময় নিশ্চয়ই তারা মিসরে ব্যাপকভাবে ইসলাম প্রচার করে থাকবেন। মিসরবাসীদের মধ্য থেকে যারা ইসলাম গ্রহণ করেছিল তাদের কেবল ধর্মই নয়, তামাদ্দুন এবং সমগ্র জীবন ব্যবস্থাই মিসরীয় অমুসলিমদের থেকে আলাদা হয়ে বনী ইসরাঈলের রঙে রঞ্জিত হয়ে গিয়ে থাকবে। মিসরীয়রা তাদের সবাইকে ঠিক তেমনি আগন্তুক গণ্য করে থাকবে যেমন ভারতীয় উপমহাদেশে হিন্দুরা ভারতীয় মুসলমানদেরকে গণ্য করে থাকে। অনারব মুসলমানদের ওপর আজ 'মোহামেডান' শব্দটি যেভাবে লাগানো হয় তাদের ওপর ঠিক তেমনিভাবেই 'ইসরাঈলী' শব্দটি লাগানো হয়ে থাকবে। আর তাছাড়া তারা নিজেরাও দীনী ও সাংস্কৃতিক সম্পর্ক এবং বিয়ে–শাদীর সম্পর্কের কারণে অমুসলিম মিসরীয়দের থেকে বিচ্ছিন্ন এবং বনী ইসরাঈলের সাথে একাত্ম হয়ে গিয়ে থাকবে। এ কারণে যখন মিসরে জাতীয়তাবাদের প্রবল জোয়ার উঠলো তখন কেবলমাত্র বনী ইসরাঈলই নির্যাতনের শিকার হলো না বরং মিসরীয় মুসলিমরাও তাদের সাথে একইভাবে নির্যাতীত হলো। আর বনী ইসরাঈল যখন মিসর ত্যাগ করলো তখন মিসরীয় মুসলমানরাও তাদের সাথে বের হলো এবং তাদের সবাইকে বনী ইসরাঈলের সাথে গণ্য করা হতে থাকলো।

বাইবেলের বিভিন্ন ইংগিত থেকে আমাদের এ ধারণার সমর্থন মেলে। উদাহরণ স্বরূপ "যাত্রা পুস্তকে" যেখানে বনী ইসরাঈলদের মিসর থেকে বের হবার অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে সেখানে বাইবেল লেখক বলছেন ঃ "আর তাহাদের সাথে মিশ্রিত লোকদের মহাজনতাও গেলো।" (১২ঃ৩৮) অনুরূপভাবে "গণনা পুস্তকে"ও তিনি আবার বলছেন ঃ "আর তাহাদের মধ্যবর্তী মিশ্রিত লোকেরা লোভাতুর হইয়া উঠিল।" (১১ঃ৪) তারপর পর্যায়ক্রমে এ অইসরাঈলী মুসলমানদের জন্য "আগন্তুক" ও "পরদেশী" পরিভাষা ব্যবহার করা হতে থাকে। বস্তুত তাওরাতে হযরত মূসাকে যেসব বিধান দেয়া হয় তার মধ্যে আমরা পাই ঃ

> " তোমরা ও তোমাদের মধ্যে বসবাসকারী বিদেশী লোক, উভয়ের জন্য একই ব্যবস্থা হইবে ; ইহা তোমাদের পুরুষানুক্রমে পালনীয় চিরস্থায়ী বিধি। সদা প্রভুর সামনে তোমরা ও বিদেশীয়েরা, উভয়ে সমান। তোমাদের ও তোমাদের মধ্যে বসবাসকারী বিদেশীয়দের জন্য একই ব্যবস্থা ও একই শাসন হইবে।"
>
> (গণনা পুস্তক ১৫ঃ ১৫–১৬)

"কি স্বজাতীয় কি বিদেশী যে ব্যক্তি নিসংকোচে পাপ করে, সে সদাপ্রভুর অবমাননা করে, সেই ব্যক্তি আপন লোকদের মধ্য হইতে উচ্ছিন্ন হইবে।" (গণনা পুস্তক ১৫ঃ৩০)

"তোমরা তোমাদের ভ্রাতাদের মধ্যে, চাই স্বদেশী হোক বা বিদেশী হোক, ন্যায্য বিচার করিও।" (দ্বিতীয় বিবরণ ১ঃ১৬)

আল্লাহর কিতাবে অইসরাঈলীদের জন্য আসলে কি শব্দ ব্যবহার করা হয়েছিল যাকে অনুবাদকরা 'বিদেশী" বানিয়ে রেখে দিয়েছে, সেটা এখন অনুসন্ধানের মাধ্যমে জানা কঠিন।

وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا ۖ وَقَالَ يَا أَبَتِ هَٰذَا تَأْوِيلُ رُؤْيَايَ مِن قَبْلُ قَدْ جَعَلَهَا رَبِّي حَقًّا ۖ وَقَدْ أَحْسَنَ بِي إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ السِّجْنِ وَجَاءَ بِكُم مِّنَ الْبَدْوِ مِن بَعْدِ أَن نَّزَغَ الشَّيْطَانُ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخْوَتِي ۚ إِنَّ رَبِّي لَطِيفٌ لِّمَا يَشَاءُ ۚ إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ﴿١٠٠﴾

(শহরে প্রবেশ করার পর) সে নিজের বাপ-মাকে উঠিয়ে নিজের পাশে সিংহাসনে বসালো এবং সবাই তার সামনে স্বতস্ফূর্তভাবে সিজদায় ঝুঁকে পড়লো।[৭০] *ইউসুফ বললো, "আব্বাজান। আমি ইতিপূর্বে যে স্বপ্ন দেখেছিলাম এ হচ্ছে তার তা'বীর। আমার রব তাকে সত্যে পরিণত করেছেন। আমার প্রতি তাঁর অনুগ্রহ হিসেবে তিনি আমাকে কারাগার থেকে বের করেছেন এবং আপনাদেরকে মরু অঞ্চল থেকে এনে আমার সাথে মিলিয়ে দিয়েছেন, অথচ শয়তান আমার ও আমার ভাইদের মধ্যে বিরোধ সৃষ্টি করে দিয়েছিল। আসলে আমার রব অননুভূত ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে তাঁর ইচ্ছা পূর্ণ করেন। নিসন্দেহে তিনি সবকিছু জানেন ও সুগভীর প্রজ্ঞার অধিকারী।*

৬৯. তালমূদে লিখিত হয়েছে, হযরত ইয়াকূবের (আ) আগমন সংবাদ যখন রাজধানীতে এসে পৌঁছুল তখন হযরত ইউসুফ (আ) রাজ্যের বড় বড় আমীর উমরাহ, উচ্চ পদস্থ কর্মচারীবৃন্দ ও বিরাট এক সেনাবাহিনী নিয়ে তাঁকে অভ্যর্থনা করতে বের হলেন। অত্যন্ত মর্যাদা ও শান-শওকতের সাথে তাঁদেরকে শহরে নিয়ে এলেন। সেদিনটি সেখানে ছিল উৎসবের দিন। নারী-পুরুষ-শিশু নির্বিশেষে সবাই সেদিন এ শোভাযাত্রা দেখতে জমা হয়েছিল। সারা দেশে আনন্দের ঢেউ প্রবাহিত হয়ে গিয়েছিল।

৭০. এ "সিজদাহ" শব্দটি বহু লোককে বিভ্রান্ত করেছে। এমনকি একটি দল তো এ থেকে প্রমাণ সংগ্রহ করে বাদশাহ ও পীরদের জন্য "আদবের সিজদাহ" ও "সম্মান প্রদর্শনের সিজদাহ"-এর বৈধতা আবিষ্কার করেছেন। এর দোষমুক্ত হবার জন্য অন্য লোকদের এ ব্যাখ্যা দিতে হয়েছে যে, আগের নবীদের শরীয়াতে কেবলমাত্র ইবাদাতের সিজদা আল্লাহ ছাড়া আর সবার জন্য হারাম ছিল। এ ছাড়া যে সিজ্‌দার মধ্যে ইবাদাতের অনুভূতি নেই তা আল্লাহ ছাড়া অন্যদের জন্যও করা যেতে পারতো। তবে মুহাম্মাদী শরীয়াতে আল্লাহ ছাড়া অন্যদের জন্য সবরকমের সিজদা হারাম করে দেয়া হয়েছে। কিন্তু আসলে "সিজদাহ" শব্দটিকে বর্তমান ইসলামী পরিভাষার অর্থে গ্রহণ করার ফলেই যাবতীয় বিভ্রান্তি দেখা দিয়েছে। অর্থাৎ হাত, হাঁটু ও কপাল মাটিতে ঠেকিয়ে দেয়া। অথচ

সিজদার মূল অর্থ হচ্ছে শুধুমাত্র ঝুঁকে পড়া। আর এখানে এ শব্দটি এ অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে। কারো প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করার, কাউকে অভ্যর্থনা জানাবার অথবা নিছক কাউকে সালাম করার জন্য বুকে দু'হাত বেঁধে সামনের দিকে কিছুটা ঝুঁকে পড়ার রেওয়াজ প্রাচীন যুগের মানুষের সাংস্কৃতিক জীবনে ব্যাপকভাবে প্রচলিত ছিল। (এবং আজো দুনিয়ার কোন কোন দেশে এর প্রচলন আছে)। এ ধরনের ঝুঁকে পড়ার জন্য আরবীতে "সিজদাহ" এবং ইংরেজীতে Bow শব্দ ব্যবহার করা হয়। বাইবেলে আমরা এর অসংখ্য দৃষ্টান্ত পাই, যা থেকে প্রমাণ হয় যে, প্রাচীন যুগে এ পদ্ধতিটি সাংস্কৃতিক জীবনের অংশ ছিল। তাই হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালাম সম্পর্কে এক জায়গায় বলা হয়েছে : তিনি নিজের তাঁবুর দিকে তিনটি লোককে আসতে দেখলেন। তাদেরকে অভ্যর্থনা করার জন্য তিনি দৌড়ে গেলেন এবং মাটি পর্যন্ত ঝুঁকে পড়লেন। আরবী বাইবেলে এখানে যে শব্দগুলো ব্যবহার করা হয়েছে তা হচ্ছে :

فَلَمَّا نَظَرَ رَكَضَ لاِسْتِقْبَالِهِمْ مِنْ بَابِ الْخَيْمَةِ وَسَجَدَ اِلَى الْاَرْضِ

(تكوين : ١٨-٣)

তারপর যেখানে বলা হচ্ছে, হেতের সন্তানরা হযরত সারাকে দাফন করার জন্য বিনামূল্যে কবরের জন্য জমি দান করে, সেখানে উর্দূ বাইবেলে যা বলা হয়েছে তার বাংলা অনুবাদ করলে দাঁড়ায়। "ইবরাহীম উঠে বনী হেতের সামনে, যারা সেই দেশের বাসিন্দা ছিল, কুর্নিশ করলেন এবং তাদের সাথে এভাবে আলাপ করলেন।" (বাংলা বাইবেলে বলা হয়েছে : তখন আব্রাহাম উঠিয়া তদ্দেশীয় লোকদিগের, অর্থাৎ হেতের সন্তানগণের কাছে প্রণিপাত করিলেন ও সম্ভাসন করিয়া কহিলেন,) তারপর যখন তারা শুধু কবরের জমিই নয়, পুরো একটি ক্ষেত এবং একটি গুহা দান করে তখন "ইবরাহীম সেই দেশীয় লোকদের সামনে মাথা নত করলেন (বাংলা বাইবেলে বলা হয়েছে : তখন আব্রাহাম তদ্দেশীয় লোকদের সামনে প্রণিপাত করিলেন)। কিন্তু আরবী অনুবাদে এ উভয় জায়গায় কুর্নিশ করা, প্রণিপাত করা, মাথা নত করা ইত্যাদির জন্য "সিজদাহ" শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। বলা হয়েছে :

فقام ابراهيم وسجد لشعب الارض لبنى حت (تكوين : ٢١- ٧)

فسجد ابراهيم امام شعب الارض (تكوين : ٢٣ - ١٢)

ইংরেজী বাইবেলে এখানে যে শব্দাবলী ব্যবহার করা হয়েছে তা হচ্ছে :

"Bowed himself towards the ground.

"Bowed himself to the people of the land and Abraham bowed down himself before the people of the land."

এ ধরনের বিষয়ের বহু দৃষ্টান্ত বাইবেলে পাওয়া যায়। এ থেকে পরিষ্কার জানা যায়, বর্তমানে ইসলামী পরিভাষায় "সিজদাহ" বলতে যা বুঝায় এ সিজদাহর অর্থ তা নয়।

যারা বিষয়টির যথার্থ স্বরূপ না জেনে এর ব্যাখ্যায় হাল্‌কাভাবে লিখে দিয়েছেন যে, পূর্ববর্তী শরীয়াতগুলোয় গায়রুল্লাহকে সম্মানের সিজদা অথবা আদবের সিজদা করা জায়েয

رَبِّ قَدْ اٰتَيْتَنِىْ مِنَ الْمُلْكِ وَعَلَّمْتَنِىْ مِنْ تَاْوِيْلِ الْاَحَادِيْثِ ۚ فَاطِرَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۗ اَنْتَ وَلِىّٖ فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ ۚ تَوَفَّنِىْ مُسْلِمًا وَّاَلْحِقْنِىْ بِالصّٰلِحِيْنَ ﴿١٠١﴾ ذٰلِكَ مِنْ اَنْۢبَآءِ الْغَيْبِ نُوْحِيْهِ اِلَيْكَ ۚ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ اِذْ اَجْمَعُوْٓا اَمْرَهُمْ وَهُمْ يَمْكُرُوْنَ ﴿١٠٢﴾ وَمَآ اَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِيْنَ ﴿١٠٣﴾ وَمَا تَسْـَٔلُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرٍ ؕ اِنْ هُوَ اِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعٰلَمِيْنَ ﴿١٠٤﴾

হে আমার রব! তুমি আমাকে রাষ্ট্র ক্ষমতা দান করেছো এবং আমাকে কথার গভীরে প্রবেশ করা শিখিয়েছো। হে আকাশ ও পৃথিবীর স্রষ্টা! দুনিয়ায় ও আখেরাতে তুমিই আমার অভিভাবক। ইসলামের ওপর আমাকে মৃত্যু দান করো এবং পরিণামে আমাকে সৎকর্মপরায়ণদের অন্তরভুক্ত করো।"[৭১]

হে মুহাম্মাদ! এ কাহিনী অদৃশ্যলোকের খবরের অন্তরভুক্ত, যা আমি তোমাকে অহীর মাধ্যমে জানাচ্ছি। নয়তো, তুমি তখন উপস্থিত ছিলে না যখন ইউসুফের ভাইয়েরা একজোট হয়ে ষড়যন্ত্র করেছিল। কিন্তু তুমি যতই চাওনা কেন অধিকাংশ লোক তা মানবে না।[৭২] অথচ তুমি এ খেদমতের বিনিময়ে তাদের কাছে কোন পারিশ্রমিকও চাচ্ছো না। এটা তো দুনিয়াবাসীদের জন্য সাধারণভাবে একটি নসীহত ছাড়া আর কিছুই নয়।[৭৩]

ছিল তারা নিছক একটি ভিত্তিহীন কথা বলেছেন। ইসলামী পরিভাষায় যাকে সিজদা বলা হয়, যদি সিজদা বলতে তাকেই বুঝানো হয় তাহলে আল্লাহর পাঠানো শরীয়াতে তা কোনদিন গায়রুল্লাহর জন্য জায়েয ছিল না। বাইবেলে উল্লেখিত হয়েছে যে, ব্যবিলনের পরাধীনতার যুগে বাদশাহ অহশ্বেরশ যখন হামানকে নিজের প্রধান অধ্যক্ষ করলেন এবং তার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করার জন্য তাকে সিজদা করার জন্য সবাইকে হুকুম দিলেন তখন বনী ইসরাঈলের পরম খোদাভক্ত ওলী মর্দখয় (মর্দকী) তা করতে অস্বীকার করলেন। (ইষ্টের ৩ঃ১–২) তালমূদে এ ঘটনাটির ব্যাখ্যা প্রসংগে এর যে বিস্তারিত বিবরণ দেয়া হয়েছে তা প্রণিধানযোগ্য ঃ

"বাদশাহর কর্মচারীরা জিজ্ঞেস করলো ঃ ব্যাপার কি, তুমি কেনইবা হামানকে সিজদা করতে অস্বীকৃতি জানাচ্ছো? আমরাও তো মানুষ কিন্তু আমরা বাদশাহর হুকুম মেনে চলি। তিনি জবাব দিলেন ঃ তোমরা অজ্ঞ, একজন মরণশীল মানুষ, যে কাল মাটির

সাথে মিশে যাবে, সে কি এমন যোগ্যতা রাখে যে, তার শ্রেষ্ঠত্ব মেনে নেয়া হবে? আমি কি এমন একজনকে সিজদা করবো, যে একটি মহিলার পেট থেকে জন্ম নিয়েছে? যে কাল শিশু ছিল, আজ যুবক হয়েছে, কাল বুড়ো হয়ে যাবে এবং পরশু মারা যাবে? না, আমি তো একমাত্র সেই অনাদি অনন্ত আল্লাহর সামনে মাথা নত করবো যিনি চিরঞ্জীব ও স্বয়ম্ভু........ যিনি বিশ্বলোকের স্রষ্টা ও শাসক, আমি তো একমাত্র তাঁকেই সম্মান করবো, আর কাউকে নয়।"

কুরআন নাযিলের প্রায় এক হাজার বছর আগে একজন ইসরাঈলী মুমিনের কণ্ঠে এ কথাগুলো উচ্চারিত হয়। কোন অর্থেও গায়রুল্লাহকে সিজদা করা বৈধ এ ধরনের চিন্তার নামগন্ধও এতে পাওয়া যায় না।

৭১. এ সময় হযরত ইউসুফের (আ) কন্ঠ নিঃসৃত এ বাক্য ক'টি আমাদের সামনে একজন সাচ্চা মুমিনের চরিত্রের একটা অদ্ভুত মনোমুগ্ধকর চিত্র তুলে ধরে। মরু পশুপালক পরিবারের এক ব্যক্তি, যাঁকে তাঁর হিংসুটে ভাইয়েরা মেরে ফেলতে চেয়েছিল, জীবনের উত্থান–পতন দেখতে দেখতে অবশেষে পার্থিব উন্নতির সর্বোচ্চ শিখরে আরোহণ করেন। তার দুর্ভিক্ষ পীড়িত পরিবারবর্গ তারই করুণা ভিখারী হয়ে তার সামনে এসে হাযির হয়েছে এবং এ সাথে এসেছে তার সেই হিংসুটে ভাইয়েরা যারা তাকে মেরে ফেলতে চেয়েছিল। তারা সবাই তার রাজকীয় সিংহাসনের সামনে মাথা নত করে দাঁড়িয়ে আছে। দুনিয়ার সাধারণ রীতি অনুযায়ী এটি ছিল অহংকার, অভিযোগ ও দোষারোপ করার এবং তিরষ্কার ও ভর্ৎসনার তীর বর্ষণ করার উপযুক্ত সময়। কিন্তু আল্লাহর সত্যিকার অনুগত একজন মানুষ এ সময় কিছুটা ভিন্ন ধরনের চারিত্রিক গুণাবলীর প্রকাশ ঘটান। তিনি নিজের এ উন্নতির জন্য অহংকার করার পরিবর্তে যে আল্লাহ তাকে এ মর্যাদা দান করেছেন তাঁর অনুগ্রহের স্বীকৃতি দেন। তার পরিবারের লোকেরা জীবনের প্রথম দিকে তার ওপর যে জুলুম অত্যাচার চালিয়েছিল সে জন্য তিনি তাদেরকে তিরস্কার ও ভর্ৎসনা করেন না। বরং আল্লাহ এত দীর্ঘদিনের বিচ্ছিন্নতার পর তাদেরকে আমার সাথে মিলিয়ে দিয়েছেন এ বলে তিনি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। তিনি হিংসুটে ভাইদের বিরুদ্ধে মুখে অভিযোগের একটি শব্দও উচ্চারণ করেন না। এমন কি একথাও বলেন না যে, তারা আমার সাথে দুর্ব্যবহার করেছিল। বরং নিজেই এভাবে তাদের সাফাই গাইছেন যে, শয়তান আমার ও তাদের মধ্যে বিরোধ সৃষ্টি করে দিয়েছে। আবার সেই বিরোধের খারাপ দিক বাদ দিয়ে তার এ ভালো দিকটি পেশ করছেন যে, আল্লাহ আমাকে যে মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করতে চাচ্ছিলেন সে জন্য এ সূক্ষ্ম কৌশল অবলম্বন করেছেন। অর্থাৎ ভাইদের দ্বারা শয়তান যা কিছু করায় তার মধ্যে আল্লাহর জ্ঞান অনুযায়ী আমার জন্য কল্যাণ ছিল। কয়েক শব্দে এসব কিছু প্রকাশ করার পর তিনি স্বতস্ফূর্তভাবে নিজের প্রভু–আল্লাহর সামনে নত হন এবং তাঁর প্রতি এ বলে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন ঃ তুমিই আমাকে বাদশাহী দান করেছো এবং এমন সব যোগ্যতা দান করেছো যার বদৌলতে আমি জেলখানায় পচে মরার বদলে আজ দুনিয়ার সবচেয়ে বড় রাষ্ট্রটির ওপর শাসন কর্তৃত্ব চালাচ্ছি। সবশেষে তিনি আল্লাহর কাছে যা কিছু চান তা হচ্ছে এই যে, দুনিয়ায় যতদিন বেঁচে থাকি ততদিন যেন তোমার বন্দেগী ও দাসত্বে অবিচল থাকি আর যখন দুনিয়া থেকে বিদায় নেই তখন আমাকে সৎ বান্দাদের সাথে মিশিয়ে দিয়ো। কতই উন্নত, পরিচ্ছন্ন ও পবিত্র এ চারিত্রিক আদর্শ!

হযরত ইউসুফের এ মূল্যবান ভাষণটিও বাইবেল ও তালমূদে কোন স্থান পায়নি। আশ্চর্যের বিষয় হচ্ছে, এ কিতাব দু'টি অপ্রয়োজনীয় গলপ কাহিনীর বিস্তারিত বিবরণে ভরা। অথচ যেসব বিষয় নৈতিক মূল্যমান ও মূল্যবোধের সাথে সম্পর্ক রাখে এবং যার সাহায্যে নবীগণের মূল শিক্ষা, তাঁদের যথার্থ মিশন এবং তাঁদের সীরাতের শিক্ষণীয় দিকগুলোর ওপর আলোকপাত হয়, এ কিতাব দু'টিতে সেগুলোর কোন উল্লেখই নেই।

এখানে এ কাহিনী শেষ হচ্ছে। তাই পাঠকদেরকে পুনর্বার এ সত্যটির ব্যাপারে সজাগ করে দেয়া জরুরী মনে করি যে, হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালাম, সম্পর্কে কুরআনের এ বর্ণনাটি একান্তই তার নিজস্ব ও স্বতন্ত্র বর্ণনা। এটি বাইবেল বা তালমূদের চর্বিতচর্বন নয়। তিনটি কিতাবের তুলনামূলক অধ্যয়নের পর একথা অত্যন্ত সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, কাহিনীটির বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ অংশে কুরআনের বর্ণনা অন্য দু'টি থেকে আলাদা। কোন কোন জিনিস কুরআন তাদের চেয়ে বেশী বর্ণনা করে, কোন কোনটা কম এবং কোন কোনটায় তাদের বর্ণনার প্রতিবাদ করে। কাজেই মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বনী ইসরাঈলের থেকে এ কাহিনীটি শুনে থাকবেন এবং তারি ভিত্তিতে এটি বর্ণনা করেন, একথা বলার সুযোগই কারোর নেই।

৭২. অর্থাৎ এরা এক অদ্ভুত ধরনের হটকারিতার রোগে ভুগছে। তোমার নবুওয়াতের বিষয়টি পরীক্ষা করার জন্য অনেক চিন্তা–ভাবনা ও পরামর্শ করে তারা যে দাবী করেছিল তুমি সংগেসংগেই সবার সামনে তা পূরণ করে দিয়েছো। এখন হয়তো তুমি আশা করছো, এ কুরআন তুমি নিজে রচনা কর না বরং সত্যিই তোমার প্রতি অহীর মাধ্যমে নাযিল হয়, একথা মেনে নিতে তারা আর ইতস্তত করবে না। কিন্তু নিশ্চিতভাবে জেনে রাখো, এরা এখনো মানবে না এবং নিজেদের অস্বীকৃতির ওপর অবিচল থাকার জন্য আরেকটি বাহানা খুঁজে বের করবে। কেননা, এদের না মানার আসল কারণ এটা নয় যে, তোমার সত্যতার ব্যাপারে নিশ্চিন্ত হবার জন্য এরা কোন যুক্তিসংগত প্রমাণ চাচ্ছিল এবং তা এরা এখনো পায়নি। বরং এর কারণ শুধুমাত্র একটিই যে, এরা তোমার কথা মেনে নিতে রাজী নয়। তাই এরা আসলে মেনে নেবার জন্য কোন প্রমাণ খুঁজে ফিরছে না বরং না মানার জন্য বাহানা খুঁজে বেড়াচ্ছে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কোন ভুল ধারণা দূর করা এ বক্তব্যের উদ্দেশ্য নয়। যদিও বাহ্যত তাঁকেই সম্বোধন করা হয়েছে। কিন্তু এর আসল উদ্দেশ্য হচ্ছে, যে দলকে সম্বোধন করে তাদের সমাবেশে এ ভাষণ দেয়া হচ্ছিল তাদেরকে অত্যন্ত সূক্ষ্ম ও অলংকারপূর্ণ বাগধারার মাধ্যমে এ হঠকারিতা সম্পর্কে সতর্ক করা। তারা নিজেদের মাহফিলে তাঁকে ডেকে এনেছিল তাঁকে পরীক্ষা করার জন্য। সেখানে তারা অকস্মাত দাবী করেছিল, যদি আপনি নবী হয়ে থাকেন তাহলে বলুন বনী ইসরাঈলের মিসর যাবার ঘটনাটা কি ছিল? এর জবাবে তাদেরকে তখনই এবং সেখানেই এ সংক্ষিপ্ত কাহিনী শুনিয়ে দেয়া হয়। আর সর্বশেষে এ ছোট্ট বাক্যটি বলে তাদের সামনে একটি আয়নাও তুলে ধরা হয়েছে যে, ওহে হঠকারীর দল! এ আয়নায় নিজেদের চেহারা দেখে নাও, তোমরা কোন্ মুখে পরীক্ষা নিতে বসে গিয়েছিলে? বিবেকবান ব্যক্তি তো সত্য প্রমাণ হয়ে গেলে তা মেনে নেয়, এ জন্যই সে পরীক্ষা নিয়ে থাকে। কিন্তু তোমরা নিজেদের মনের মতো প্রমাণ পেয়ে গেলেও তা মেনে নাও না।

وَكَأَيِّنْ مِنْ آيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ ۝ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ ۝ أَفَأَمِنُوا أَنْ تَأْتِيَهُمْ غَاشِيَةٌ مِنْ عَذَابِ اللَّهِ أَوْ تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ۝

১২ রুকূ'

আকাশসমূহে[৭৪] ও পৃথিবীতে কত নিদর্শন রয়েছে, যেগুলো তারা অতিক্রম করে যায় কিন্তু সেদিকে একটুও দৃষ্টিপাত করে না।[৭৫] তাদের বেশীর ভাগ আল্লাহকে মানে কিন্তু তাঁর সাথে অন্যকে শরীক করে।[৭৬] তারা কি এ ব্যাপারে নিশ্চিন্ত হয়ে গেছে যে, আল্লাহর আযাবের কোন আকস্মিক আক্রমণ তাদেরকে গ্রাস করে নেবে না অথবা তাদের অজ্ঞাতসারে তাদের ওপর সহসা কিয়ামত এসে যাবে না?[৭৭]

৭৩. ওপরের সতর্কীকরণের পর এটি দ্বিতীয় সতর্কীকরণ। তবে ওর তুলনায় এর মধ্যে তিরস্কারের দিকটি কম এবং উপদেশের অংশ বেশী। এ উক্তিটিও বাহ্যত নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সম্বোধন করে করা হয়েছে কিন্তু আসলে এখানে কাফেরদের সমাবেশকে সম্বোধন করা হয়েছে এবং তাদেরকে একথা বুঝানোই উদ্দেশ্য যে, আল্লাহর বান্দারা। একটু ভেবে দেখো, তোমাদের এ হঠকারিতার এখানে অবকাশ কোথায়? যদি পয়গম্বর নিজের কোন ব্যক্তিস্বার্থ উদ্ধারের জন্য দাওয়াত ও প্রচারের এ কাজ চালু করে থাকতেন অথবা নিজের জন্য তিনি কিছু চাইতেন তাহলে অবশ্যি তোমাদের জন্য একথা বলার সুযোগ ছিল যে, আমরা এ ধরনের মতলবী লোকের কথা কেন মানবো? কিন্তু তোমরা দেখছো, এ ব্যক্তি নিস্বার্থ, তোমাদের এবং সারা দুনিয়ার মানুষের ভালোর জন্য নসীহত করে যাচ্ছেন এবং এর মধ্যে তার নিজের কোন স্বার্থ লুকিয়ে নেই। কাজেই এ ধরনের হঠকারিতার সাহায্যে এর মোকাবিলা করার পেছনে কি যুক্তি আছে? যে ব্যক্তি সবার ভালোর জন্য নিস্বার্থভাবে একটি কথা বলে। তার বিরুদ্ধে খামখা জিদ ধরে বসে থাকা কেন? খোলা মনে তার কথা শোনো। ভালো লাগলে মেনে নাও, ভালো না লাগলে মানবে না।

৭৪. ওপরের এগারটি রুকূ'তে হযরত ইউসুফের (আ) কাহিনী শেষ হয়েছে। যদি নিছক গল্প বলা আল্লাহর অহীর উদ্দেশ্য হতো তাহলে ভাষণ এখানেই শেষ হয়ে যেতো। কিন্তু এখানে তো কোন উদ্দেশ্য সামনে রেখেই গল্প বলা হয়। এ উদ্দেশ্য প্রচার করার যে কোন সুযোগেরই সদ্ব্যবহার করতে মোটেই ইতস্তত করা হয় না। এখন যেহেতু লোকেরা নিজেরাই নবীকে ডেকে এনেছিল এবং গল্প শোনার জন্য কান খাড়া করেছিল, তাই তাদের ফরমায়েশী কথা শেষ হতেই নিজের উদ্দেশ্যমূলক কয়েকটি বাক্যও বলে দেয়া হলো। অতি সংক্ষেপে এ কয়েকটি বাক্যে উপদেশ ও দাওয়াতের সমস্ত বিষয়বস্তু একত্র করে দেয়া হয়েছে।

৭৫. লোকদেরকে তাদের গাফলতি সম্পর্কে সতর্ক করে দেয়াই এর উদ্দেশ্য। পৃথিবী ও আকাশের প্রত্যেকটি জিনিস নিছক একটি জিনিসই নয় বরং সত্যের প্রতি ইংগিতকারী একটি নিদর্শনও। যারা এ জিনিসগুলোকে শুধুমাত্র একটি জিনিস হিসেবে দেখে তারা মানুষের মতো নয় বরং পশুর মতো দেখে। পানিকে পানি, গাছকে গাছ এবং পাহাড়কে পাহাড় তো পশুরাও দেখে-থাকে এবং নিজেদের প্রয়োজন অনুযায়ী প্রত্যেকটি পশু এগুলোর ব্যবহার ক্ষেত্রও জানে। কিন্তু মানুষকে যে উদ্দেশ্যে ইন্দ্রিয়ানুভূতি সহকারে চিন্তা–ভাবনা করার জন্য মস্তিষ্ক দান করা হয়েছে তা শুধু এ জন্য নয় যে, মানুষ সেগুলো দেখবে এবং সেগুলোর ব্যবহার ক্ষেত্র জানবে বরং মানুষ সত্য অনুসন্ধান করবে এবং এ নিদর্শনগুলোর সাহায্যে তাকে চিনে নেবে, এটিই হচ্ছে এর মূল উদ্দেশ্য। এ ব্যাপারে অধিকাংশ মানুষ গাফলতির মধ্যে পড়ে আছে। আর এ গাফলতিই তাদেরকে গোমরাহীতে নিক্ষেপ করেছে। যদি মনের দুয়ারে এ তালা না লাগিয়ে নেয়া হতো, তাহলে নবীদের কথা বুঝা এবং তাঁদের নেতৃত্ব থেকে ফায়দা হাসিল করা লোকদের জন্য এত কঠিন হতো না।

৭৬. ওপরে যে গাফলতির প্রতি ইংগিত করা হয়েছে এটা আসলে তার স্বাভাবিক ফল। লোকেরা যখন পথের চিহ্ন থেকে চোখ বন্ধ করে নিয়েছে তখনই তারা সোজা পথ থেকে সরে গেছে এবং চারপাশের ঝোপঝাড়ের মধ্যে আটকা পড়ে গেছে। এরপরও খুব কম লোকই এমন রয়েছে, যারা গন্তব্য সম্পূর্ণরূপে হারিয়ে ফেলেছে এবং আল্লাহকে সৃষ্টিকর্তা ও রিযিকদাতা হিসেবে চূড়ান্তভাবে মেনে নিতে অস্বীকার করেছে। অধিকাংশ লোক যে গোমরাহীতে লিপ্ত রয়েছে তা আল্লাহকে অস্বীকার করার গোমরাহী নয় বরং শির্কের গোমরাহী। অর্থাৎ তারা আল্লাহ নেই একথা বলে না বরং তারা আল্লাহর সত্তা, গুণাবলী, ক্ষমতা, ইখতিয়ার ও অধিকারে অন্যদেরকে কোন না কোনভাবে অংশীদার করার বিভ্রান্তিতে লিপ্ত। পৃথিবী ও আকাশের বিভিন্ন নিদর্শন, যেগুলো সর্বত্র সর্বক্ষণ আল্লাহর একক সার্বভৌম কর্তৃত্বের ঘোষণা দিচ্ছে, সেগুলোতে যদি শিক্ষণীয় দৃষ্টিতে দেখা হতো তাহলে কোনদিন এ বিভ্রান্তির জন্ম হতো না।

৭৭. লোকদেরকে সতর্ক করাই এর উদ্দেশ্য। অর্থাৎ অবকাশ জীবনকে দীর্ঘতর মনে করে এবং বর্তমানের শান্তি ও নিরাপত্তাকে চিরস্থায়ী ভেবে পরিণামের চিন্তাকে ভবিষ্যতের জন্য শিকেয় তুলে রেখো না। কোন ব্যক্তিই নিশ্চয়তা সহকারে একথা বলতে পারে না যে, তার জীবনকাল অমুক সময় পর্যন্ত অবশ্যি স্থায়ী হবে। কাকে হঠাৎ কখন গ্রেফতার করা হবে এবং কোথা থেকে কি অবস্থায় তাকে ধরে আনা হবে তা কেউ জানে না। তোমাদের দিনরাতের অভিজ্ঞতা হচ্ছে, ভবিষ্যতের গর্ভে তোমাদের জন্য কি লুকানো আছে তা এক মুহূর্ত আগেও তোমরা জানতে পার না। কাজেই যা কিছু চিন্তা করার এখনই করে নাও। জীবনের যে পথে এগিয়ে যাচ্ছো তার ওপর সামনে অগ্রসর হবার আগে ঠিক পথে যাচ্ছো কিনা একটু থেমে চিন্তা করে দেখো। এটা যে সঠিক পথ, এর সপক্ষে কোন যথার্থ দলীল তোমাদের কাছে আছে কি? বিশ্ব প্রকৃতির নিদর্শনাবলী থেকে এর সত্যসঠিক পথ হবার কোন প্রমাণ পাচ্ছো কি? তোমাদের স্বজাতীয় লোকেরা এ পথে চলে ইতিপূর্বে যে ফল লাভ করেছে এবং বর্তমানে তোমাদের সমাজ সংস্কৃতিতে এর যে ফলাফল দেখা যাচ্ছে তা কি একথাই প্রমাণ করে যে, তোমরা সঠিক পথে যাচ্ছো?

قُلْ هٰذِهٖ سَبِيْلِيْٓ اَدْعُوْٓا اِلَى اللّٰهِ ۣ عَلٰى بَصِيْرَةٍ اَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِيْ ۭ وَسُبْحٰنَ اللّٰهِ وَمَآ اَنَا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ﴿١٠٨﴾ وَمَآ اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ اِلَّا رِجَالًا نُّوْحِيْٓ اِلَيْهِمْ مِّنْ اَهْلِ الْقُرٰى ۭ اَفَلَمْ يَسِيْرُوْا فِي الْاَرْضِ فَيَنْظُرُوْا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۭ وَلَدَارُ الْاٰخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِيْنَ اتَّقَوْا ۭ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ ﴿١٠٩﴾

তাদেরকে পরিষ্কার বলে দাও ঃ আমার পথতো এটাই, আমি আল্লাহর দিকে ডাকি, আমি নিজেও পূর্ণ আলোকে নিজের পথ দেখছি এবং আমার সাথীরাও। আর আল্লাহ পাক–পবিত্র[৭৮] *এবং শিরককারীদের সাথে আমার কোন সম্পর্ক নেই।*

হে মুহাম্মাদ! তোমার পূর্বে আমি যে নবীদেরকে পাঠিয়েছিলাম তারা সবাই মানুষই ছিল, এসব জনবসতিরই অধিবাসী ছিল এবং তাদের কাছেই আমি অহী পাঠাতে থেকেছি। তারা কি পৃথিবীতে ভ্রমণ করেনি এবং তাদের পূর্বে যেসব জাতি চলে গেছে তাদের পরিণাম দেখেনি? নিশ্চিতভাবেই আখেরাতের আবাস তাদের জন্য আরো বেশী ভালো যারা (নবীর কথা মেনে নিয়ে) তাকওয়ার পথ অবলম্বন করেছে। এখনো কি তোমরা বুঝবে না?[৭৯]

৭৮. অর্থাৎ তাঁর প্রতি যেসব কথা প্রয়োগ করা হচ্ছে তা থেকে তিনি পাক–পবিত্র। যেসব দোষ, ত্রুটি, অভাব ও দুর্বলতা প্রত্যেক মুশরিকী আকীদার ভিত্তিতে তার প্রতি অনিবার্যভাবে আরোপিত হয় তা থেকে তিনি সম্পূর্ণরূপে মুক্ত। এমন সব দোষ, ত্রুটি ও ভুল–ভ্রান্তি থেকেও মুক্ত যেগুলো শিরকের ফলশ্রুতি হিসেবে তাঁর সাথে সম্পৃক্ত হয়।

৭৯. এখানে একটি বিরাট বিষয়কে দু'তিনটি বাক্যে প্রকাশ করা হয়েছে। একে যদি কোন বিস্তারিত বক্তব্যের মাধ্যমে তুলে ধরা হয় তাহলে এভাবে বলা যেতে পারে ঃ "তারা যে তোমার কথার প্রতি দৃষ্টি দেয় না, তার কারণ হচ্ছে এই যে, কালকে যে ব্যক্তির জন্ম হলো তাদেরই শহরে এবং তাদেরই সামনে সে শৈশব থেকে কৈশোর, কৈশোর থেকে যৌবন এবং যৌবন থেকে বার্ধক্যে পৌঁছুলো, তার ব্যাপারে তারা কেমন করে একথা মেনে নেবে যে, একদিন হঠাৎ আল্লাহ তাকে নিজের দূত হিসেবে নিযুক্ত করেছেন? কিন্তু এটা কোন নতুন কথা নয়। দুনিয়ায় আজ প্রথমবার তাদেরকেই এর মুখোমুখি হতে হয়নি। এর আগেও আল্লাহ দুনিয়ায় নবী পাঠিয়েছেন। তাঁরা সবাই মানুষই ছিলেন। সেখানেও কখনো অকস্মাত কোন শহরে কোন অপরিচিত ব্যক্তির আবির্ভাব ঘটেনি এবং তিনি একথা বলেননি যে, তাঁকে নবী নিযুক্ত করে পাঠানো হয়েছে। বরং মানবতার সংস্কার ও সংশোধনের জন্য যাদেরই আবির্ভাব হয়েছে তারা সবাই সংশ্লিষ্ট জনগোষ্ঠীর নিজস্ব

حَتّٰٓى اِذَا اسْتَيْـَٔسَ الرُّسُلُ وَظَنُّوْٓا اَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوْا جَآءَهُمْ نَصْرُنَا ۙ فَنُجِّيَ مَنْ نَّشَآءُ ؕ وَلَا يُرَدُّ بَاْسُنَا عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِيْنَ ۝ لَقَدْ كَانَ فِيْ قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِّاُولِي الْاَلْبَابِ ؕ مَا كَانَ حَدِيْثًا يُّفْتَرٰى وَلٰكِنْ تَصْدِيْقَ الَّذِيْ بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيْلَ كُلِّ شَيْءٍ وَّهُدًى وَّرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ ۝

(আগের নবীদের সাথেও এমনটি হতে থেকেছে। অর্থাৎ তারা দীর্ঘদিন উপদেশ দিয়ে গেছেন কিন্তু লোকেরা তাদের কথা শোনেনি।) এমনকি যখন নবীরা লোকদের থেকে হতাশ হয়ে গেলো এবং লোকেরাও ভাবলো তাদেরকে মিথ্যা বলা হয়েছিল তখন অকস্মাত আমার সাহায্য নবীদের কাছে পৌঁছে গেলো। তারপর এ ধরনের সময় যখন এসে যায় তখন আমার নিয়ম হচ্ছে, যাকে আমি চাই তাকে রক্ষা করি এবং অপরাধীদের প্রতি আমার আযাব তো রদ করা যেতে পারে না।

পূর্ববর্তী লোকদের এ কাহিনীর মধ্যে বুদ্ধি ও বিবেচনা সম্পন্ন লোকদের জন্য শিক্ষা রয়েছে। কুরআনে এ যা কিছু বর্ণনা করা হচ্ছে এগুলো বানোয়াট কথা নয় বরং এগুলো ইতিপূর্বে এসে যাওয়া কিতাবগুলোতে বর্ণিত সত্যের সমর্থন এবং সবকিছুর বিশদ বিবরণ,[৮০] আর যারা ঈমান এনেছে তাদের জন্য হেদায়াত ও রহমত।

এলাকার ও জনবসতির লোকই ছিলেন। ঈসা, মূসা, ইবরাহীম, নূহ আলাইহিমুস সালাম কারা ছিলেন? যেসব জাতি তাঁদের সংস্কারের আহবান গ্রহণ করেনি এবং নিজেদের ভিত্তিহীন কল্পনা বিলাসিতা ও নিয়ন্ত্রণহীন কামনা বাসনার পিছনে দৌড়াতে থেকেছে তাদের পরিণতি কি হয়েছে তোমরা নিজেরাই দেখে নাও। তোমরা নিজেদের বাণিজ্যিক সফরসমূহে আদ, সামুদ, মাদয়ান ও লূত জাতির ধ্বংসপ্রাপ্ত এলাকার ওপর দিয়ে যাওয়া আসা করছো। সেখানে কি তোমরা কোন শিক্ষা পাওনি? দুনিয়ায় তারা এই যে পরিণতির সম্মুখীন হয়েছে এটিই তো এ খবর দিয়ে যাচ্ছে যে, আখেরাতে তাদের পরিণাম হবে এর চেয়ে আরো বেশী ভয়াবহ। আর যারা দুনিয়ায় নিজেদের সংশোধন করে নিয়েছে তারা কেবল দুনিয়ায়ই ভালো থাকেনি, আখেরাতেও তাদের পরিণতি এর চেয়ে আরো অনেক বেশী ভালো হবে।"

৮০. অর্থাৎ মানুষের হেদায়াত পাওয়া ও পথ দেখার জন্য যেসব জিনিসের প্রয়োজন তার প্রত্যেকটির বিস্তারিত বিবরণ। কেউ কেউ "প্রত্যেকটি জিনিসের বিস্তারিত বিবরণ"

শব্দাবলী থেকে অযথা সারা দুনিয়ার সমস্ত জিনিসের বিস্তারিত বিবরণ অর্থ করেন এবং এরপর কুরআনে উদ্ভিদ বিদ্যা, চিকিৎসা শাস্ত্র, বিজ্ঞান ও অন্যান্য জ্ঞান-বিজ্ঞান সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ না পেয়ে পেরেশান হয়ে পড়েন।

আর্ রা'দ

১৩

নামকরণ

তের নম্বর আয়াতের وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلٰئِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ বাক্যাংশের "আর্ রা'দ" শব্দটিকে এ সূরার নাম হিসেবে গণ্য করা হয়েছে। এ নামকরণের মানে এ নয় যে, এ সূরায় রা'দ অর্থাৎ মেঘগর্জনের বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। বরং এটা শুধু আলামত হিসেবে একথা প্রকাশ করে যে, এ সূরায় "রাদ" উল্লেখিত হয়েছে বা "রা'দ"–এর কথা বলা হয়েছে।

নাযিলের সময়-কাল

৪ ও ৬ রুকূ'র বিষয়বস্তু সাক্ষ দিচ্ছে, এ সূরাটিও সূরা ইউনূস, হূদ ও আ'রাফের সমসময়ে নাযিল হয়। অর্থাৎ মক্কায় অবস্থানের শেষ যুগে। বর্ণনাভংগী থেকে পরিষ্কার প্রতীয়মান হচ্ছে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দাওয়াত শুরু করার পর দীর্ঘকাল অতিবাহিত হয়ে গেছে। বিরোধী পক্ষ তাঁকে লাঞ্ছিত করার এবং তাঁর মিশনকে ব্যর্থ করে দেবার জন্য বিভিন্ন কৌশল অবলম্বন করতে থাকে। মুমিনরা বারবার এ আকাংখা পোষণ করতে থাকে, হায়! যদি কোনপ্রকার অলৌকিক কাণ্ড–কারখানার মাধ্যমে এ লোকগুলোকে সত্য সরল পথে আনা যায়। অন্যদিকে আল্লাহ মুসলমানদেরকে এ মর্মে বুঝাচ্ছেন যে, ঈমানের পথ দেখাবার এ পদ্ধতি আমার এখানে প্রচলিত নেই আর যদি ইসলামের শত্রুদের রশি ঢিলে করে দেয়া হয়ে থাকে তাহলে এটা এমন কোন ব্যাপার নয় যার ফলে তোমরা ভয় পেয়ে যাবে। তারপর ৩১ আয়াত থেকে জানা যায়, বার বার কাফেরদের হঠকারিতার এমন প্রকাশ ঘটেছে যারপর ন্যায়সংগতভাবে একথা বলা যায় যে, যদি কবর থেকে মৃত ব্যক্তিরাও উঠে আসেন তাহলেও এরা মেনে নেবে না বরং এ ঘটনার কোন না কোন ব্যাখ্যা করে নেবে। এসব কথা থেকে অনুমান করা যায় যে, এ সূরাটি মক্কার শেষ যুগে নাযিল হয়ে থাকবে।

কেন্দ্রীয় বিষয়বস্তু

সূরার মূল বক্তব্য প্রথম আয়াতেই বলে দেয়া হয়েছে। অর্থাৎ মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যা কিছু পেশ করছেন তাই সত্য কিন্তু এ লোকেরা তা মেনে নিচ্ছে না, এটা এদের ভুল। এ বক্তব্যই সমগ্র ভাষণটির কেন্দ্রীয় বিষয়। এ প্রসংগে বার বার বিভিন্ন পদ্ধতিতে তাওহীদ, রিসালাত ও পরকালের সত্যতা প্রমাণ করা হয়েছে। এগুলোর

প্রতি ঈমান আনার নৈতিক ও আধ্যাত্মিক ফায়দা বুঝানো হয়েছে। এগুলো অস্বীকার করার ক্ষতি জানিয়ে দেয়া হয়েছে। এ সংগে একথা মনের মধ্যে গেঁথে দেয়া হয়েছে যে, কুফরী আসলে পুরোপুরি একটি নির্বুদ্ধিতা ও মূর্খতা ছাড়া আর কিছুই নয়। তারপর এ সমগ্র বর্ণনাটির উদ্দেশ্য শুধুমাত্র বুদ্ধি-বিবেককে দীক্ষিত করা নয় বরং মনকে ঈমানের দিকে আকৃষ্ট করাও এর অন্যতম উদ্দেশ্য। তাই নিছক বুদ্ধিবৃত্তিক দলীল-প্রমাণ পেশ করেই শেষ করে দেয়া হয়নি, এ সংগে এক একটি দলীল ও এক একটি প্রমাণ পেশ করার পর থেমে গিয়ে নানা প্রকার ভীতি প্রদর্শন, উৎসাহ-উদ্দীপনা সৃষ্টি এবং স্নেহপূর্ণ ও সহানুভূতিশীল উপদেশ প্রদানের মাধ্যমে অজ্ঞ লোকদের নিজেদের বিভ্রান্তিকর হঠকারিতা থেকে বিরত থাকতে বলা হয়েছে।

ভাষণের মাঝখানে বিভিন্ন জায়গায় বিরোধীদের আপত্তিসমূহের উল্লেখ না করেই তার জবাব দেয়া হয়েছে। মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দাওয়াতের ব্যাপারে লোকদের মনে যেসব সন্দেহ-সংশয় সৃষ্টি হয়ে গিয়েছিল অথবা বিরোধীদের পক্ষ থেকে সৃষ্টি করা হচ্ছিল সেগুলো দূর করা হয়েছে। এ সংগে মুমিনরা কয়েক বছরের দীর্ঘ ও কঠিন সংগ্রামের কারণে ক্লান্ত-পরিশ্রান্ত হয়ে পড়ছিল এবং অস্থির চিত্তে অদৃশ্য সাহায্যের প্রতীক্ষা করছিল, তাই তাদেরকে সান্ত্বনা দেয়া হয়েছে।

الٓمّٓرٰ ۚ تِلْكَ اٰيٰتُ الْكِتٰبِ ؕ وَالَّذِیْۤ اُنْزِلَ اِلَیْكَ مِنْ رَّبِّكَ الْحَقُّ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا یُؤْمِنُوْنَ ﴿۱﴾ اَللّٰهُ الَّذِیْ رَفَعَ السَّمٰوٰتِ بِغَیْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا ثُمَّ اسْتَوٰی عَلَی الْعَرْشِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ ؕ كُلٌّ یَّجْرِیْ لِاَجَلٍ مُّسَمًّی ؕ یُدَبِّرُ الْاَمْرَ یُفَصِّلُ الْاٰیٰتِ لَعَلَّكُمْ بِلِقَآءِ رَبِّكُمْ تُوْقِنُوْنَ ﴿۲﴾

আলিফ লাম মীম র। এগুলো আল্লাহর কিতাবের আয়াত। আর তোমার রবের পক্ষ থেকে তোমার প্রতি যাকিছু নাযিল হয়েছে তা প্রকৃত সত্য কিন্তু (তোমার কওমের) অধিকাংশ লোক তা বিশ্বাস করে না।[১]

আল্লাহই আকাশসমূহ স্থাপন করেছেন এমন কোন স্তম্ভ ছাড়াই যা তোমরা দেখতে পাও।[২] তারপর তিনি নিজের শাসন কর্তৃত্বের আসনে সমাসীন হয়েছেন।[৩] আর তিনি সূর্য ও চন্দ্রকে একটি আইনের অধীন করেছেন।[৪] এ সমগ্র ব্যবস্থার প্রত্যেকটি জিনিস একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত চলে।[৫] আল্লাহই এ সমস্ত কাজের ব্যবস্থাপনা করছেন। তিনি নিদর্শনাবলী খুলে খুলে বর্ণনা করেন,[৬] সম্ভবত তোমরা নিজেদের রবের সাথে সাক্ষাতের ব্যাপারটি নিশ্চিতভাবে বিশ্বাস করবে।[৭]

১. এটাই এ সূরার ভূমিকা। এখানে মাত্র কয়েকটি শব্দে সমগ্র বক্তব্যের উদ্দেশ্য বর্ণনা করা হয়েছে। বক্তব্যের লক্ষ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। তাঁকে সম্বোধন করে মহান আল্লাহ বলছেন : হে নবী! তোমার সম্প্রদায়ের অধিকাংশ লোক এ শিক্ষা গ্রহণ করতে অস্বীকার করছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আমি এটা তোমার প্রতি নাযিল করেছি এবং লোকেরা মানুক বা না মানুক এটাই সত্য। এ সংক্ষিপ্ত ভূমিকার পর মূল ভাষণ শুরু হয়ে গেছে। তাতে অস্বীকারকারীদেরকে এ শিক্ষা সত্য কেন এবং এর ব্যাপারে তাদের নীতি কতটুকু ভুল—একথা বুঝাবার চেষ্টা করা হয়েছে। এ ভাষণটি বুঝতে হলে শুরুতেই এ

বিষয়টি সামনে থাকা প্রয়োজন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সে সময় যে জিনিসটির দিকে লোকদেরকে দাওয়াত দিচ্ছিলেন তা তিনটি মৌলিক বিষয় সমন্বিত ছিল। এক, প্রভুত্বের কর্তৃত্ব সম্পূর্ণরূপে আল্লাহর জন্য নির্ধারিত। এ কারণে তিনি ছাড়া আর কেউ ইবাদাত ও বন্দেগী লাভের যোগ্য নয়। দুই, এ জীবনের পরে আর একটি জীবন আছে। সেখানে তোমাদের নিজেদের যাবতীয় কার্যক্রমের জবাবদিহি করতে হবে। তিন, আমি আল্লাহর রসূল এবং আমি যা কিছু পেশ করছি নিজের পক্ষ থেকে নয় বরং আল্লাহর পক্ষ থেকে পেশ করছি। এ তিনটি মৌলিক কথা মানতে লোকেরা অস্বীকার করছিল। এ কথাগুলোকেই এ ভাষণের মধ্যে বার বার বিভিন্ন পদ্ধতিতে বুঝাবার চেষ্টা করা হয়েছে এবং এগুলো সম্পর্কে লোকদের সন্দেহ ও আপত্তির জবাব দেয়া হয়েছে।

২. অন্য কথায় আকাশসমূহকে অদৃশ্য ও অননুভূত স্তম্ভসমূহের ওপর প্রতিষ্ঠিত করেছেন। আপাতদৃষ্টে মহাশূন্যে এমন কোন জিনিস নেই, যা এ সীমাহীন মহাকাশ ও নক্ষত্র জগতকে ধরে রেখেছে। কিন্তু একটি অননুভূত শক্তি তাদের প্রত্যেককে তার নিজের স্থানে ও আবর্তন পথের ওপর আটকে রেখেছে এবং মহাকাশের এ বিশাল বিশাল নক্ষত্রগুলোকে পৃথিবীপৃষ্ঠে বা তাদের পরস্পরের ওপর পড়ে যেতে দিচ্ছে না।

৩. এর ব্যাখ্যার জন্য সূরা আ'রাফের ৪১ টীকা দেখুন। তবে সংক্ষেপে এখানে এতটুকু ইশারা যথেষ্ট মনে করি যে, আরশের (অর্থাৎ বিশ্ব–জাহানের শাসন ব্যবস্থার কেন্দ্রস্থল) ওপর আল্লাহর সমাসীন হবার ব্যাপারটি একটি বিশেষ উদ্দেশ্যে কুরআনে বিভিন্ন স্থানে উল্লেখিত হয়েছে। সে উদ্দেশ্যটি হচ্ছে এই যে, আল্লাহ এ বিশ্ব–জাহানকে কেবল সৃষ্টিই করেননি বরং তিনি নিজেই এ রাজ্যের শাসন কর্তৃত্ব পরিচালনা করছেন। এ সুবিশাল জগতটি এমন কোন কারখানা নয়, যা নিজে নিজেই চলছে, যেমন অনেক মূর্খ ও অজ্ঞ লোক ধারণা করে থাকে। আর এ প্রাকৃতিক জগতটি বহু ইলাহর বিচরণক্ষেত্র নয়, অন্য এক দল অজ্ঞ ও মূর্খ যেমনটি মনে করে বসে আছে বরং এটি একটি নিয়মতান্ত্রিক ব্যবস্থা এবং এর সৃষ্টিকর্তা নিজেই এ ব্যবস্থা পরিচালনা করছেন।

৪. এখানে এ বিষয়টি সামনে রাখতে হবে যে, এমন এক কওমকে এখানে সম্বোধন করা হচ্ছে যারা আল্লাহর অস্তিত্ব অস্বীকার করতো না, তিনি যে সবকিছুর স্রষ্টা তাও অস্বীকার করতো না এবং এখানে যেসব কাজের বর্ণনা দেয়া হচ্ছে আল্লাহ ছাড়া অন্য কেউ সেগুলোর কর্তা এ ধারণাও পোষণ করতো না। তাই প্রকৃতপক্ষে আল্লাহই যে এ আকাশসমূহ স্থাপন করেছেন এবং তিনিই চন্দ্র ও সূর্যকে একটি নিয়মের অধীন করেছেন, একথার সপক্ষে যুক্তি–প্রমাণ উপস্থাপনের প্রয়োজন বোধ করা হয়নি। বরং যেহেতু শ্রোতা নিজে এ সত্যগুলোর বিশ্বাস করতো, তাই এগুলোকে অন্য একটি মহাসত্যের জন্য যুক্তি হিসেবে দাঁড় করানো হয়েছে। সে মহাসত্যটি হচ্ছে, আল্লাহ ছাড়া মাবুদ গণ্য হবার অধিকার রাখে এমন দ্বিতীয় কোন সত্তা এ বিশ্ব ব্যবস্থায় ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের অধিকারী নয়। প্রশ্ন দেখা দিতে পারে, যে ব্যক্তি আল্লাহর অস্তিত্বই মানে না এবং তিনি যে বিশ্ব জাহানের স্রষ্টা ও শাসনকর্তা সে কথা একেবারেই অস্বীকার করে তার মোকাবিলায় এ যুক্তি কেমন করে কার্যকর হতে পারে? এর জবাবে বলা যায়, মুশরিকদের মোকাবিলায় তাওহীদকে প্রমাণ করার জন্য আল্লাহ যেসব যুক্তি দেন নাস্তিকদের মোকাবিলায় আল্লাহর অস্তিত্ব প্রমাণ করার জন্য সেই একই যুক্তি যথেষ্ট। তাওহীদের সমস্ত যুক্তির ভিত্তিভূমি

হচ্ছে এই যে, পৃথিবী থেকে নিয়ে আকাশ পর্যন্ত সমগ্র বিশ্ব–জাহান একটি পূর্ণাংগ কারখানা এবং এ সমগ্র কারখানাটি চলছে একটি মহাপরাক্রান্ত শক্তির অধীনে। এর মধ্যে সর্বত্র একটি সার্বভৌম কর্তৃত্ব, একটি নিখুঁত প্রজ্ঞা ও নির্ভুল জ্ঞানের লক্ষণ প্রতিভাত। এ লক্ষণ ও চিহ্নগুলো যেমন একথা প্রকাশ করে যে, এ ব্যবস্থার বহু পরিচালক নেই তেমনি একথাও প্রকাশ করে যে, এ ব্যবস্থার একজন পরিচালক অবশ্যই রয়েছেন। প্রতিষ্ঠান থাকবে অথচ তার পরিচালক থাকবে না, আইন থাকবে অথচ শাসক থাকবে না, প্রজ্ঞা নৈপুণ্য ও দক্ষতা বিরাজ করবে অথচ কোন প্রাজ্ঞ, দক্ষ ও নিপুণ সত্তা থাকবে না, জ্ঞান থাকবে অথচ জ্ঞানী থাকবে না, সর্বোপরি সৃষ্টি থাকবে অথচ তার স্রষ্টা থাকবে না–এমন উদ্ভট ধারণা কেবল সেই ব্যক্তিই করতে পারে যে চরম হঠকারী ও গোঁয়ার অথবা যার বুদ্ধি বিভ্রম ঘটেছে।

৫. অর্থাৎ এ অবস্থা কেবল মাত্র একথার সাক্ষ্য দিচ্ছে না যে, সর্বময় ক্ষমতাসম্পন্ন এক সত্তা এর ওপর শাসন কর্তৃত্ব চালাচ্ছে এবং একটি প্রচণ্ড শক্তিশালী প্রজ্ঞা এর মধ্যে কাজ করছে বরং এর সমস্ত অংশ এবং এর মধ্যে কর্মরত সমস্ত শক্তিই এ সাক্ষও দিচ্ছে যে, এর কোন জিনিসই স্থায়ী নয়। প্রত্যেকটি জিনিসের জন্য একটি সময় নির্ধারিত রয়েছে। সেই সময় শেষ হওয়া পর্যন্ত তা চলতে থাকে এবং সময় শেষ হয়ে গেলে খতম হয়ে যায়। এ সত্যটি যেমন এ কারখানার প্রত্যেকটি অংশের ব্যাপারে সঠিক তেমনি সমগ্র কারখানা বা স্থাপনাটির ব্যাপারেও সঠিক। এ প্রাকৃতিক ব্যবস্থার সামগ্রিক কাঠামো জানিয়ে দিচ্ছে যে, এটি চিরন্তন ব্যবস্থা নয়, এর জন্যও কোন সময় অবশ্যি নির্ধারিত রয়েছে, যখন এ সময় খতম হয়ে যাবে তখন এর জায়গায় আর একটি জগত শুরু হয়ে যাবে। কাজেই যে কিয়ামতের আসার খবর দেয়া হয়েছে তার আসাটা অসম্ভব নয় বরং না আসাটাই অসম্ভব।

৬. অর্থাৎ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যেসব সত্যের খবর দিচ্ছেন সেগুলোর যথার্থতা ও সত্যতা নিরূপক নিদর্শনাবলী। বিশ্ব–জাহানের সর্বত্র সেগুলোর পক্ষে সাক্ষ দেবার মতো নিদর্শন ছড়িয়ে রয়েছে। লোকেরা চোখ খুলে দেখলে দেখতে পাবে যে, কুরআনে যেসব বিষয়ের প্রতি ঈমান আনার দাওয়াত দেয়া হয়েছে, পৃথিবী ও আকাশে ছড়ানো অসংখ্য নিদর্শন সেগুলোর সত্যতা প্রমাণ করছে।

৭. ওপরে বিশ্ব–জাহানের যে নিদর্শনাবলীকে সাক্ষী হিসেবে পেশ করা হয়েছে তাদের এ সাক্ষ তো একেবারেই সুস্পষ্ট যে, এ বিশ্ব–জাহানের স্রষ্টা ও পরিচালক একজনই কিন্তু মৃত্যুর পর পুনরুজ্জীবন, আল্লাহর আদালতে মানুষের হাযির হওয়া এবং পুরস্কার ও শাস্তি সম্পর্কে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যেসব খবর দিয়েছেন সেগুলোর সত্যতার সাক্ষও এ নিদর্শনগুলোই দিচ্ছে। তবে এ সাক্ষ একটু অস্পষ্ট এবং সামান্য চিন্তা–ভাবনা করলে বোধগম্য হয়। তাই প্রথম সত্যটির ব্যাপারে সজাগ করে দেবার প্রয়োজনবোধ করা হয়নি। কারণ শ্রোতা শুধুমাত্র যুক্তি শুনেই বুঝতে পারে, এ থেকে কি কথা প্রমাণ হয়। তবে দ্বিতীয় সত্যটির ব্যাপারে বিশেষভাবে সতর্ক করে দেয়া হয়েছে। কারণ এ নিদর্শনগুলো সম্পর্কে চিন্তা–ভাবনা করলেই নিজের রবের দরবারে হাযির হবার ব্যাপারটির ওপর বিশ্বাস জন্মাতে পারে।

উপরোক্ত নিদর্শনগুলো থেকে আখেরাতের প্রমাণ দু'ভাবে পাওয়া যায় ঃ

وَهُوَ الَّذِىْ مَدَّ الْاَرْضَ وَجَعَلَ فِيْهَا رَوَاسِىَ وَاَنْهٰرًا ؕ وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرٰتِ جَعَلَ فِيْهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ يُغْشِى الَّيْلَ النَّهَارَ ؕ اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ ۞ وَفِى الْاَرْضِ قِطَعٌ مُّتَجٰوِرٰتٌ وَّجَنّٰتٌ مِّنْ اَعْنَابٍ وَّزَرْعٌ وَّنَخِيْلٌ صِنْوَانٌ وَّغَيْرُ صِنْوَانٍ يُّسْقٰى بِمَآءٍ وَّاحِدٍ ۫ وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلٰى بَعْضٍ فِى الْاُكُلِ ؕ اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّعْقِلُوْنَ ۞

আর তিনিই এ ভূতলকে বিছিয়ে রেখেছেন, এর মধ্যে পাহাড়ের খুঁটি গেড়ে দিয়েছেন এবং নদী প্রবাহিত করেছেন। তিনিই সব রকম ফল সৃষ্টি করেছেন জোড়ায় জোড়ায় এবং তিনিই দিনকে রাত দিয়ে ঢেকে ফেলেন।[৮] এ সমস্ত জিনিসের মধ্যে বহুতর নিদর্শন রয়েছে তাদের জন্য যারা চিন্তা–ভাবনা করে।

আর দেখো, পৃথিবীতে রয়েছে পরস্পর সংলগ্ন আলাদা আলাদা ভূখণ্ড,[৯] রয়েছে আংগুর বাগান, শস্যক্ষেত, খেজুর গাছ—কিছু একাধিক কাণ্ডবিশিষ্ট আবার কিছু এক কাণ্ডবিশিষ্ট,[১০] সবই সিঞ্চিত একই পানিতে কিন্তু স্বাদের ক্ষেত্রে আমি করে দেই তাদের কোনটাকে বেশী ভালো এবং কোনটাকে কম ভালো। এসব জিনিসের মধ্যে যারা বুদ্ধিকে কাজে লাগায় তাদের জন্য রয়েছে বহুতর নিদর্শন।[১১]

এক ঃ যখন আমরা আকাশমণ্ডলীর গঠনাকৃতি এবং চন্দ্র ও সূর্যকে একটি নিয়মের অধীনে পরিচালনা করার বিষয়টি নিয়ে চিন্তা–ভাবনা করি তখনই আমাদের মন সাক্ষ দেয় যে, আল্লাহ এ বিশাল জ্যোতিষ্ক মণ্ডলী সৃষ্টি করেছেন এবং যাঁর অসীম শক্তি এ বিরাট বিরাট গ্রহ–নক্ষত্রকে মহাশূন্যে আবর্তিত করছে তাঁর পক্ষে মানব জাতিকে মৃত্যুর পর পুনর্বার সৃষ্টি করা মোটেই কঠিন ব্যাপার নয়।

দুই ঃ এ মহাশূন্য ব্যবস্থা থেকে আমরা একথারও সাক্ষ লাভ করি যে, এর স্রষ্টা একজন সর্বজ্ঞ এ পরিপূর্ণ জ্ঞানবান সত্তা। তিনি মানব জাতিকে বুদ্ধিমান সচেতন এবং স্বাধীন চিন্তা ও কর্ম শক্তি সম্পন্ন সৃষ্টি হিসেবে তৈরী করার এবং নিজের যমীনের অসংখ্য বস্তুনিচয়ের ওপর তাদেরকে কর্তৃত্ব ক্ষমতা দান করার পর তাদের জীবনকালের বিভিন্ন কাজের হিসেব নেবেন না, তাদের মধ্যে যারা জালেম তাদেরকে জুলুম–অত্যাচারের জন্য জিজ্ঞাসাবাদ করবেন না এবং মজলুমদের ফরিয়াদ শুনবেন না, তাদের সৎলোকদেরকে সৎকাজের পুরস্কার এবং অসৎলোকদেরকে অসৎকাজের জন্য শাস্তি দেবেন না এবং

তাদেরকে কখনো একথা জিজ্ঞেসই করবেন না যে, আমি তোমাদের হাতে যে মূল্যবান আমানত সোপর্দ করেছিলাম তাকে তোমরা কিভাবে ব্যবহার করেছো—একথা তাঁর পূর্ণজ্ঞান ও প্রজ্ঞার কারণে কখনো কল্পনাই করা যায় না। একজন অন্ধ ও কাণ্ডজ্ঞানহীন রাজা অবশ্যি নিজের রাজ্যের যাবতীয় কাজ-কারবার নিজের কর্মচারীদের হাতে সোপর্দ করে দিয়ে নিজের দায়িত্বের ব্যাপারে গাফেল হয়ে যেতে পারেন কিন্তু একজন জ্ঞানী ও সচেতন রাজার কাছ থেকে কখনো এ ধরনের ভ্রান্তি, অসতর্কতা ও গাফলতি আশা করা যেতে পারে না।

আকাশ সম্পর্কে এ ধরনের পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণের ফলে পরকালীণ জীবন যে সম্ভবপর শুধু এ ধারণাই আমাদের মনে সৃষ্টি হয় না বরং তা যে একদিন অবশ্যি শুরু হবে এ ব্যাপারে সুদৃঢ় বিশ্বাস জন্মে।

৮. মহাকাশের গ্রহ-নক্ষত্রের পর পৃথিবীর প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়। এখানেও আল্লাহর শক্তি ও জ্ঞানের নিদর্শন থেকে পূর্বোক্ত দু'টি চিরন্তন সত্যের (তাওহীদ ও আখেরাত) স্বপক্ষে যুক্তি প্রমাণ উপস্থাপন করা হয়। ইতিপূর্বে পিছনের আয়াতগুলোতে মহাকাশ জগতের নিদর্শনসমূহ থেকে এরি সপক্ষে দলীল-প্রমাণ উপস্থাপন করা হয়েছিল। এ দলীল-প্রমাণের সংক্ষিপ্তসার হচ্ছে নিম্নরূপ :

এক : মহাকাশের জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর সাথে পৃথিবীর সম্পর্ক, পৃথিবীর সাথে সূর্য ও চন্দ্রের সম্পর্ক, পৃথিবীর অসংখ্য সৃষ্টির প্রয়োজনের সাথে পাহাড়-পর্বত ও নদী-সাগরের সম্পর্ক—এসব জিনিস এ মর্মে সুস্পষ্টভাবে সাক্ষ দিচ্ছে যে, কোন পৃথক এক স্রষ্টা এদেরকে সৃষ্টি করেনি এবং বিভিন্ন স্বাধীন ক্ষমতাসম্পন্ন সত্তা এদেরকে পরিচালনা করছে না। যদি এমনটি হতো তাহলে এসব জিনিসের মধ্যে এত বেশী পারস্পরিক সম্পর্ক সামঞ্জস্য ও একাত্মতা সৃষ্টি হতো না এবং তা স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠিত থাকতেও পারতো না। পৃথক পৃথক স্রষ্টার জন্য এটা কেমন করে সম্ভবপর ছিল যে, তারা সবাই মিলে সমগ্র বিশ্ব-জাহানের সৃষ্টি ও পরিচালনার জন্য এমন পরিকল্পনা তৈরী করতেন, যার প্রত্যেকটি জিনিস পৃথিবী থেকে আকাশ পর্যন্ত একটার সাথে আর একটা মিলে যেতে থাকতো এবং কখনো তাদের স্বার্থের মধ্যে কোন প্রকার সংঘাত হতো না?

দুই : পৃথিবীর এ বিশাল গ্রহটির মহাশূন্যে ঝুলে থাকা, এর উপরিভাগে এত বড় বড় পাহাড় জেগে ওঠা, এর বুকের ওপর এ বিশালকায় নদী ও সাগরগুলো প্রবাহিত হওয়া, এর মধ্যে বিভিন্ন প্রকারের অসংখ্য বৃক্ষরাজির ফলে ফুলে সুশোভিত হওয়া এবং অত্যন্ত নিয়ম-শৃংখলাবদ্ধভাবে অনবরত রাত ও দিনের নিদর্শনের বিস্ময়করভাবে আবর্তিত হওয়া এসব জিনিস যে আল্লাহ এদেরকে সৃষ্টি করেছেন তাঁর শক্তিমত্তার সাক্ষ দিচ্ছে। এহেন অসীম শক্তিধর মহান সত্তাকে মানুষের মৃত্যুর পর পুনর্বার তাকে জীবন দান করতে অক্ষম মনে করা বুদ্ধি ও বিচক্ষণতার নয়, নিরেট নির্বুদ্ধিতার প্রমাণ।

তিন : পৃথিবীর ভৌগোলিক রূপকাঠামো, তার ওপর পর্বতমালা সৃষ্টি, পাহাড় থেকে নদী ও ঝরণাধারা প্রবাহিত হবার ব্যবস্থা, সকল প্রকার ফলের মধ্যে দু' ধরনের ফল সৃষ্টি এবং রাতের পরে দিন ও দিনের পরে রাতকে নিয়মিতভাবে আনার মধ্যে যে সীমাহীন প্রজ্ঞা, বিচক্ষণতা ও কল্যাণ নিহিত রয়েছে তা সরবে সাক্ষ দিয়ে যাচ্ছে যে, যে আল্লাহ

সৃষ্টির এ নকশা তৈরী করেছেন তিনি একজন পূর্ণ জ্ঞানী। এ সমস্ত জিনিসই এ সংবাদ পরিবেশন করে যে, এগুলো কোন সংকল্পবিহীন শক্তির কার্যক্রম এবং কোন উদ্দেশ্যবিহীন খেলোয়াড়ের খেলনা নয়। এর প্রত্যেকটি জিনিসের মধ্যে একজন জ্ঞানীর জ্ঞান এবং চূড়ান্ত পর্যায়ের পরিপক্ক প্রজ্ঞার সক্রিয়তা দৃষ্টিগোচর হয়। এসব কিছু দেখার পর শুধুমাত্র অজ্ঞ ও মূর্খই এ ধারণা করতে পারে যে, পৃথিবীতে মানুষকে সৃষ্টি করে এবং তাকে এমন সংঘাতমুখর ঘটনাপ্রবাহ সৃষ্টির সুযোগ দিয়ে তিনি তাকে কোন প্রকার হিসেব নিকেশ ছাড়া এমনিই মাটিতে মিশিয়ে দেবেন।

৯. অর্থাৎ সারা পৃথিবীকে তিনি একই ধরনের একটি ভূখণ্ড বানিয়ে রেখে দেননি। বরং তার মধ্যে সৃষ্টি করেছেন অসংখ্য ভূখণ্ড, এ ভূখণ্ডগুলো পরস্পর সংলগ্ন থাকা। সত্ত্বেও আকার-আকৃতি, রং, গঠন, উপাদান, বৈশিষ্ট, শক্তি ও যোগ্যতা এবং উৎপাদন ও রাসায়নিক বা খনিজ সম্পদে পরস্পরের থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন পর্যায়ে অবস্থান করছে। এ বিভিন্ন ভূখণ্ডের সৃষ্টি এবং তাদের মধ্যে নানা প্রকার বিভিন্নতার অস্তিত্ব এত বিপুল পরিমাণ জ্ঞান ও কল্যাণে পরিপূর্ণ যে, তা গণনা করে শেষ করা যেতে পারে না। অন্যান্য সৃষ্টির কথা বাদ দিয়ে কেবলমাত্র মানুষের স্বার্থকে সামনে রেখে যদি দেখা যায় তাহলে অনুমান করা যেতে পারে যে, মানুষের বিভিন্ন স্বার্থ ও চাহিদা এবং পৃথিবীর এ ভূখণ্ডগুলোর বৈচিত্রের মধ্যে যে সম্পর্ক ও সামঞ্জস্য পাওয়া যায় এবং এসবের বদৌলতে মানুষের সমাজ সংস্কৃতি বিকশিত ও সম্প্রসারিত হবার যে সুযোগ লাভ করে তা নিশ্চিতভাবেই কোন জ্ঞানী ও বিজ্ঞানময় সত্তার চিন্তা, তাঁর সুচিন্তিত পরিকল্পনা এবং বিজ্ঞতাপূর্ণ সংকল্পের ফলশ্রুতি। একে নিছক একটি আকস্মিক ঘটনা মনে করা বিরাট হঠকারিতা ছাড়া আর কিছুই নয়।

১০. কিছু কিছু খেজুর গাছের মূল থেকে একটি খেজুর গাছ বের হয় আবার কিছু কিছুর মূল থেকে একাধিক গাছ বের হয়।

১১. এ আয়াতে আল্লাহর তাওহীদ এবং তাঁর শক্তি ও জ্ঞানের নিদর্শনাবলী দেখানো ছাড়া আরো একটি সত্যের দিকেও সূক্ষ্ম ইশারা করা হয়েছে। এ সত্যটি হচ্ছে, আল্লাহ এ বিশ্ব-জাহানে কোথাও এক রকম অবস্থা রাখেননি। একই পৃথিবী কিন্তু এর ভূখণ্ডগুলোর প্রত্যেকের বর্ণ, আকৃতি ও বৈশিষ্ট আলাদা। একই জমি ও একই পানি, কিন্তু তা থেকে বিভিন্ন প্রকার ফল ও ফসল উৎপন্ন হচ্ছে। একই গাছ কিন্তু তার প্রত্যেকটি ফল একই জাতের হওয়া সত্ত্বেও তাদের আকৃতি, আয়তন ও অন্যান্য বৈশিষ্ট সম্পূর্ণ আলাদা। একই মূল থেকে দু'টি ভিন্ন গাছ বের হচ্ছে এবং তাদের প্রত্যেকেই নিজের একক বৈশিষ্টের অধিকারী। যে ব্যক্তি এসব বিষয় নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করবে সে কখনো মানুষের স্বভাব, প্রকৃতি, ঝোঁক-প্রবণতা ও মেজাজের মধ্যে এতবেশী পার্থক্য দেখে পেরেশান হবে না। যেমন এ সূরার সামনের দিকে গিয়ে বলা হয়েছে, যদি আল্লাহ চাইতেন তাহলে সকল মানুষকে একই রকম তৈরী করতে পারতেন কিন্তু যে জ্ঞান ও কৌশলের ভিত্তিতে আল্লাহ এ বিশ্ব-জাহান সৃষ্টি করেছেন তা সমতা, সাম্য ও একাত্মতা নয় বরং বৈচিত্র ও বিভিন্নতার প্রয়াসী। সবাইকে এক ধরনের করে সৃষ্টি করার পর তো এ অস্তিত্বের সমস্ত জীবন প্রবাহই অর্থহীন হয়ে যেতো।

وَإِنْ تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ أَإِذَا كُنَّا تُرَابًا أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ ۗ
أُولَٰئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ ۖ وَأُولَٰئِكَ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ ۖ
وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٥﴾ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ
بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ وَقَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمُ الْمَثُلَاتُ ۗ وَإِنَّ رَبَّكَ
لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَىٰ ظُلْمِهِمْ ۖ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٦﴾
وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ ۗ إِنَّمَا أَنْتَ
مُنْذِرٌ ۖ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ ﴿٧﴾

এখন যদি তুমি বিস্মিত হও, তাহলে লোকদের একথাটিই বিস্ময়কর : "মরে মাটিতে মিশে যাবার পর কি আমাদের আবার নতুন করে পয়দা করা হবে?" এরা এমনসব লোক যারা নিজেদের রবের সাথে কুফরী করেছে।[১২] এরা এমনসব লোক যাদের গলায় শেকল পরানো আছে।[১৩] এরা জাহান্নামী এবং চিরকাল জাহান্নামেই থাকবে।

এ লোকেরা ভালোর পূর্বে মন্দের জন্য তাড়াহুড়ো করছে।[১৪] অথচ এদের আগে (যারাই এ নীতি অবলম্বন করেছে তাদের ওপর আল্লাহর আযাবের) বহু শিক্ষণীয় দৃষ্টান্ত অতীত হয়ে গেছে। একথা সত্য, তোমার রব লোকদের বাড়াবাড়ি সত্ত্বেও তাদের প্রতি ক্ষমাশীল আবার একথাও সত্য যে, তোমার রব কঠোর শাস্তিদাতা।

যারা তোমার কথা মেনে নিতে অস্বীকার করেছে তারা বলে, "এ ব্যক্তির ওপর এর রবের পক্ষ থেকে কোন নিদর্শন অবতীর্ণ হয়নি কেন?"[১৫] —তুমিতো শুধুমাত্র একজন সতর্ককারী, আর প্রত্যেক জনগোষ্ঠীর জন্য রয়েছে একজন পথপ্রদর্শক।[১৬]

১২. অর্থাৎ তাদের আখেরাত অস্বীকার ছিল মূলত আল্লাহ, তাঁর শক্তিমত্তা ও জ্ঞান অস্বীকারের নামান্তর। তারা কেবল এতটুকুই বলতো না যে, আমাদের মাটিতে মিশে যাবার পর পুনর্বার পয়দা হওয়া অসম্ভব। বরং তাদের এ একই উক্তির মধ্যে এ চিন্তাও প্রচ্ছন্ন রয়েছে যে, (নাউযুবিল্লাহ) যে আল্লাহ আমাদের সৃষ্টি করেছেন তিনি শক্তিহীন, অক্ষম, দুর্ভাগ্যপীড়িত, অজ্ঞ ও বুদ্ধিহীন।

১৩. গলায় শেকল পরানো থাকা কয়েদী হবার আলামত। তাদের গলায় শেকল পরানো আছে বলে একথা বুঝানো হচ্ছে যে, তারা নিজেদের মূর্খতা, হঠকারিতা, নফসানী খাহেশাত ও বাপ–দাদার অন্ধ অনুকরণের শেকলে বাঁধা পড়ে আছে। তারা স্বাধীনভাবে চিন্তা–ভাবনা করতে পারে না। অন্ধ স্বার্থ ও গোষ্ঠীপ্রীতি তাদেরকে এমনভাবে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে রেখেছে যে, তারা আখেরাতকে মেনে নিতে পারে না, যদিও তা মেনে নেয়া পুরোপুরি যুক্তিসংগত। আবার অন্যদিকে এর ফলে তারা আখেরাত অস্বীকারের ওপর অবিচল রয়েছে, যদিও তা পুরোপুরি যুক্তিহীন।

১৪. মক্কার কাফেররা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতো, যদি তুমি সত্যিই নবী হয়ে থাকো এবং তুমি দেখছো আমরা তোমাকে অস্বীকার করছি, তাহলে তুমি আমাদের যে আযাবের ভয় দেখিয়ে আসছো তা এখন আমাদের ওপর আসছে না কেন? তার আসার ব্যাপারে অযথা বিলম্ব হচ্ছে কেন? কখনো তারা চ্যালেঞ্জের ভংগীতে বলতে থাকে :

رَبَّنَا عَجِّلْ لَّنَا قِطَّنَا قَبْلَ يَوْمِ الْحِسَابِ

"হে আমাদের রব। এখনই তুমি আমাদের হিসেব নিকেশ চুকিয়ে দাও। কিয়ামতের জন্য তাকে ঠেকিয়ে রেখো না।"

আবার কখনো বলতে থাকে :

اَللّٰهُمَّ اِنْ كَانَ هٰذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَاَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ اَوِائْتِنَا بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ–

"হে আল্লাহ! মুহাম্মাদ (সা) যে কথাগুলো পেশ করছে এগুলো যদি সত্য হয় এবং তোমারই পক্ষ থেকে হয় তাহলে আমাদের ওপর আকাশ থেকে পাথর বর্ষণ করো অথবা অন্য কোন যন্ত্রণাদায়ক আযাব নাযিল করো।"

এ আয়াতে কাফেরদের পূর্বোক্ত কথাগুলোর জবাব দিয়ে বলা হয়েছে : এ মূর্খের দল কল্যাণের আগে অকল্যাণ চেয়ে নিচ্ছে। আল্লাহর পক্ষ থেকে এদেরকে যে অবকাশ দেয়া হচ্ছে তার সুযোগ গ্রহণ করার পরিবর্তে এরা এ অবকাশকে দ্রুত খতম করে দেয়ার এবং এদের বিদ্রোহাত্মক কর্মনীতির কারণে এদেরকে অনতিবিলম্বে পাকড়াও করার দাবী জানাচ্ছে।

১৫. এখানে তারা এমন নিশানীর কথা বলতে চাচ্ছিল যা দেখে তারা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আল্লাহর রসূল হবার ওপর ঈমান আনতে পারে। তারা তাঁর কথাকে তার সত্যতার যুক্তির সাহায্যে বুঝতে প্রস্তুত ছিল না। তারা তাঁর পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন জীবনধারা ও চরিত্র থেকে শিক্ষা নিতে প্রস্তুত ছিল না। তাঁর শিক্ষার প্রভাবে তাঁর সাহাবীগণের জীবনে যে ব্যাপক ও শক্তিশালী নৈতিক বিপ্লব সাধিত হচ্ছিল তা থেকেও তারা কোন সিদ্ধান্তে পৌঁছুতে প্রস্তুত ছিল না। তাদের মুশরিকী ধর্ম এবং জাহেলী কল্পনা ও ভাববাদিতার ভ্রান্তি সুস্পষ্ট করার জন্য কুরআনে যেসব বুদ্ধিদীপ্ত যুক্তি–প্রমাণ উপস্থাপন

اَللّٰهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ اُنْثٰى وَمَا تَغِيْضُ الْاَرْحَامُ وَمَا تَزْدَادُ ؕ
وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهٗ بِمِقْدَارٍ ۝٨ عٰلِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْكَبِيْرُ
الْمُتَعَالِ ۝٩ سَوَآءٌ مِّنْكُمْ مَّنْ اَسَرَّ الْقَوْلَ وَمَنْ جَهَرَ بِهٖ وَمَنْ هُوَ
مُسْتَخْفٍ بِالَّيْلِ وَسَارِبٌ بِالنَّهَارِ ۝١٠ لَهٗ مُعَقِّبٰتٌ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ
وَمِنْ خَلْفِهٖ يَحْفَظُوْنَهٗ مِنْ اَمْرِ اللّٰهِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتّٰى
يُغَيِّرُوْا مَا بِاَنْفُسِهِمْ ؕ وَاِذَآ اَرَادَ اللّٰهُ بِقَوْمٍ سُوْٓءًا فَلَا مَرَدَّ لَهٗ ۚ وَمَا لَهُمْ
مِّنْ دُوْنِهٖ مِنْ وَّالٍ ۝١١ هُوَ الَّذِيْ يُرِيْكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَّطَمَعًا
وَّيُنْشِئُ السَّحَابَ الثِّقَالَ ۝١٢

২ রুকূ'

আল্লাহ প্রত্যেক গর্ভবতীর গর্ভ সম্পর্কে জানেন। যাকিছু তার মধ্যে গঠিত হয় তাও তিনি জানেন এবং যাকিছু তার মধ্যে কমবেশী হয় সে সম্পর্কেও তিনি খবর রাখেন।[১৭] তাঁর কাছে প্রত্যেক জিনিসের জন্য একটি পরিমাণ নির্দিষ্ট রয়েছে। তিনি অদৃশ্য ও দৃশ্যমান প্রত্যেক জিনিসের জ্ঞান রাখেন। তিনি মহান ও সর্বাবস্থায় সবার ওপর অবস্থান করেন। তোমাদের মধ্যে কোন ব্যক্তি জোরে কথা বলুক বা নীচু স্বরে এবং কেউ রাতের আঁধারে লুকিয়ে থাকুক বা দিনের আলোয় চলতে থাকুক, তাঁর জন্য সবই সমান। প্রত্যেক ব্যক্তির সামনে ও পেছনে তাঁর নিযুক্ত পাহারাদার লেগে রয়েছে, যারা আল্লাহর হুকুমে তার দেখাশুনা করছে।[১৮] আসলে আল্লাহ ততক্ষণ পর্যন্ত কোন জাতির অবস্থা বদলান না যতক্ষণ না তারা নিজেরা নিজেদের গুণাবলী বদলে ফেলে। আর আল্লাহ যখন কোন জাতিকে দুর্ভাগ্য কবলিত করার ফায়সালা করে ফেলেন তখন কারো রদ করায় তা রদ হতে পারে না এবং আল্লাহর মোকাবিলায় এমন জাতির কোন সহায় ও সাহায্যকারী হতে পারে না।[১৯]

তিনিই তোমাদের সামনে বিজলী চমকান, যা দেখে তোমাদের মধ্যে আশংকার সঞ্চার হয় আবার আশাও জাগে।

করা হচ্ছিল তারা সেগুলোর প্রতি কর্ণপাত করতে প্রস্তুত ছিল না। এসব বাদ দিয়ে তারা চাচ্ছিল তাদেরকে এমন কোন তেলেসমাতি দেখানো হোক যার মাধ্যমে তারা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে যাচাই করতে পারে।

১৬. এটি হচ্ছে তাদের দাবীর সংক্ষিপ্ত জবাব। তাদেরকে সরাসরি এ জবাব দেবার পরিবর্তে আল্লাহ তাঁর নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সম্বোধন করে এ জবাব দিয়েছেন। এর অর্থ হচ্ছে, হে নবী। তাদেরকে নিশ্চিন্ত করার জন্য কোন্ ধরনের তেলেসমাতি দেখানো হবে এ ব্যাপারটি নিয়ে তুমি কোন চিন্তা করো না। প্রত্যেককে নিশ্চিন্ত করা তোমার কাজ নয়। তোমার কাজ হচ্ছে কেবলমাত্র গাফলতির ঘুমে বিভোর লোকদেরকে জাগিয়ে দেয়া এবং ভুল পথে চলার পরিণাম সম্পর্কে তাদেরকে সতর্ক করা। প্রত্যেক যুগে প্রত্যেক জাতির মধ্যে একজন হেদায়াতকারী নিযুক্ত করে আমি এ দায়িত্ব সম্পাদন করেছি। এখন তোমাকেও এ দায়িত্ব সম্পাদনে নিয়োজিত করা হয়েছে। এরপর যার মন চায় চোখ খুলতে পারে এবং যার মন চায় গাফলতির মধ্যে ডুবে থাকতে পারে। এ সংক্ষিপ্ত জবাব দিয়ে আল্লাহ তাদের দাবীর দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নেন এবং তাদেরকে এ বলে সতর্ক করে দেন যে, তোমরা এমন কোন রাজ্যে বাস করছো না যেখানে কোন শাসন, শৃংখলা ও কর্তৃত্ব নেই। তোমাদের সম্পর্ক এমন এক আল্লাহর সাথে যিনি তোমাদের প্রত্যেক ব্যক্তিকে যখন সে তার মায়ের জঠরে আবদ্ধ ছিল তখন থেকেই জানেন এবং সারা জীবন তোমাদের প্রত্যেকটি কাজের প্রতি নজর রাখেন। তাঁর দরবারে তোমাদের ভাগ্য নির্ণীত হবে নির্ভেজাল আদল ও ইনসাফের ভিত্তিতে, তোমাদের প্রত্যেকের দোষ–গুণের প্রেক্ষিতে। পৃথিবী ও আকাশে তাঁর ফায়সালাকে প্রভাবিত করার ক্ষমতা কারোর নেই।

১৭. এর অর্থ হচ্ছে, মায়ের গর্ভাশয়ে ভ্রূণের অংগ–প্রত্যংগ, শক্তি–সামর্থ, যোগ্যতা ও মানসিক ক্ষমতার মধ্যে যাবতীয় হ্রাস–বৃদ্ধি আল্লাহর সরাসরি তত্ত্বাবধানে সাধিত হয়।

১৮. অর্থাৎ ব্যাপার শুধু এতটুকুতেই সীমাবদ্ধ নয় যে, আল্লাহ প্রত্যেক ব্যক্তিকে সব অবস্থায় নিজেই সরাসরি দেখছেন এবং তার সমস্ত গতি–প্রকৃতি ও কার্যক্রম সম্পর্কে অবগত রয়েছেন বরং আল্লাহর নিযুক্ত তত্ত্বাবধায়কও প্রত্যেক ব্যক্তির সাথে রয়েছেন এবং তার জীবনের সমস্ত কার্যক্রমের রেকর্ডও সংরক্ষণ করে চলছেন। এ সত্যটি বর্ণনা করার উদ্দেশ্য হচ্ছে এই যে, এমন অকল্পনীয় ক্ষমতার অধিকারী আল্লাহর সার্বভৌম কর্তৃত্বের অধীন থেকে যারা একথা মনে করে জীবন যাপন করে যে, তাদেরকে লাগামহীন উটের মতো দুনিয়ায় ছেড়ে দেয়া হয়েছে এবং তাদের কার্যকলাপের জন্য কারো কাছে জবাবদিহি করতে হবে না। তারা আসলে নিজরাই নিজেদের ধ্বংস ডেকে আনে।

১৯. অর্থাৎ এ ধরনের ভুল ধারণা পোষণ করো না যে, তোমরা যাই কিছু করতে থাকো না কেন আল্লাহর দরবারে এমন কোন শক্তিশালী পীর, ফকীর বা কোন পূর্ববর্তী–পরবর্তী মহাপুরুষ অথবা কোন জিন বা ফেরেশতা আছে যে তোমাদের নযরানার উৎকোচ নিয়ে তোমাদেরকে অসৎকাজের পরিণাম থেকে বাঁচাবে।

وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهٖ وَالْمَلٰٓئِكَةُ مِنْ خِيْفَتِهٖ ۚ وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيْبُ بِهَا مَنْ يَّشَآءُ وَهُمْ يُجَادِلُوْنَ فِى اللّٰهِ ۚ وَهُوَ شَدِيْدُ الْمِحَالِ ⑬ لَهٗ دَعْوَةُ الْحَقِّ ؕ وَالَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِهٖ لَا يَسْتَجِيْبُوْنَ لَهُمْ بِشَىْءٍ اِلَّا كَبَاسِطِ كَفَّيْهِ اِلَى الْمَآءِ لِيَبْلُغَ فَاهُ وَمَا هُوَ بِبَالِغِهٖ ؕ وَمَا دُعَآءُ الْكٰفِرِيْنَ اِلَّا فِىْ ضَلٰلٍ ⑭ وَلِلّٰهِ يَسْجُدُ مَنْ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ طَوْعًا وَّكَرْهًا وَّظِلٰلُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَالْاٰصَالِ ⑮

তিনিই পানিভরা মেঘ উঠান। মেঘের গর্জন তাঁর প্রশংসা সহকারে তাঁর পবিত্রতা বর্ণনা করে[২০] এবং ফেরেশতারা তাঁর ভয়ে কম্পিত হয়ে তাঁর তাস্‌বীহ করে।[২১] তিনি বজ্রপাত করেন এবং (অনেক সময়) তাকে যার ওপর চান, ঠিক সে যখন আল্লাহ সম্পর্কে বিতণ্ডায় লিপ্ত তখনই নিক্ষেপ করেন। আসলে তাঁর কৌশল বড়ই জবরদস্ত।[২২]

একমাত্র তাঁকেই ডাকা সঠিক।[২৩] আর অন্যান্য সত্তাসমূহ, আল্লাহকে বাদ দিয়ে যাদেরকে এ লোকেরা ডাকে, তারা তাদের প্রার্থনার কোন সাড়া দিতে পারে না। তাদেরকে ডাকা তো ঠিক এমনি ধরনের যেমন কোন ব্যক্তি পানির দিকে হাত বাড়িয়ে তার কাছে আবেদন জানায়, তুমি আমার মুখে পৌঁছে যাও, অথচ পানি তার মুখে পৌঁছতে সক্ষম নয়। ঠিক এমনিভাবে কাফেরদের দোয়াও একটি লক্ষভ্রষ্ট তীর ছাড়া আর কিছুই নয়। আল্লাহকেই সিজ্‌দা করছে পৃথিবী ও আকাশের প্রত্যেকটি বস্তু ইচ্ছায় ও অনিচ্ছায়[২৪] এবং প্রত্যেকটি বস্তুর ছায়া সকাল-সাঁঝে তাঁর সামনে নত হয়।[২৫]

২০. অর্থাৎ মেঘের গর্জন একথা প্রকাশ করে যে, যে আল্লাহ এ বায়ু পরিচালিত করেছেন, বাষ্প উঠিয়েছেন, ঘন মেঘরাশিকে একত্র করেছেন, এ বিদ্যুৎকে বৃষ্টির মাধ্যম বা উপলক্ষ বানিয়েছেন এবং এভাবে পৃথিবীর সৃষ্টিকুলের জন্য পানির ব্যবস্থা করেছেন তিনি যাবতীয় ভুল-ত্রুটি-অভাব মুক্ত, তিনি জ্ঞান ও শক্তির দিক দিয়ে পূর্ণতার অধিকারী। তাঁর গুণাবলী সকল প্রকার আবিলতা থেকে মুক্ত এবং নিজের প্রভুত্বের ক্ষেত্রে তাঁর কোন অংশীদার নেই। পশুর মতো নির্বোধ শ্রবণ শক্তির অধিকারীরা তো এ মেঘের মধ্যে শুধু গর্জনই শুনতে পায় কিন্তু বিচার বুদ্ধিসম্পন্ন সজাগ শ্রবণ শক্তির অধিকারীরা মেঘের গর্জনে তাওহীদের গুরুগম্ভীর বাণী শুনে থাকে।

قُلْ مَنْ رَّبُّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ قُلِ اللّٰهُ ؕ قُلْ اَفَاتَّخَذْتُمْ مِّنْ دُوْنِهٖۤ اَوْلِيَآءَ لَا يَمْلِكُوْنَ لِاَنْفُسِهِمْ نَفْعًا وَّلَا ضَرًّا ؕ قُلْ هَلْ يَسْتَوِى الْاَعْمٰى وَالْبَصِيْرُ ۙ اَمْ هَلْ تَسْتَوِى الظُّلُمٰتُ وَالنُّوْرُ ۚ اَمْ جَعَلُوْا لِلّٰهِ شُرَكَآءَ خَلَقُوْا كَخَلْقِهٖ فَتَشَابَهَ الْخَلْقُ عَلَيْهِمْ ؕ قُلِ اللّٰهُ خَالِقُ كُلِّ شَىْءٍ وَّهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ ۝١٦

এদেরকে জিজ্ঞেস করো, আকাশ ও পৃথিবীর রব কে? —বলো আল্লাহ![২৬] তারপর এদেরকে জিজ্ঞেস করো, আসল ব্যাপার যখন এই তখন তোমরা কি তাঁকে বাদ দিয়ে এমন মাবুদদেরকে নিজেদের কার্যসম্পাদনকারী বানিয়ে নিয়েছো যারা তাদের নিজেদের জন্যও কোন লাভ ও ক্ষতি করার ক্ষমতা রাখে না? বলো অন্ধ ও চক্ষুষ্মান কি সমান হয়ে থাকে?[২৭] আলো ও আঁধার কি এক রকম হয়?[২৮] যদি এমন না হয়, তাহলে তাদের বানানো শরীকরাও কি আল্লাহর মতো কিছু সৃষ্টি করেছে, যে কারণে তারাও সৃষ্টি ক্ষমতার অধিকারী বলে সন্দেহ হয়েছে?[২৯] — বলো, প্রত্যেকটি জিনিসের স্রষ্টা একমাত্র আল্লাহ। তিনি একক ও সবার ওপর পরাক্রমশালী।[৩০]

২১. আল্লাহর সার্বভৌম কর্তৃত্বের মহিমান্বিত প্রকাশে ফেরেশতাদের প্রকম্পিত হওয়া এবং তাঁর তাসবীহ ও প্রশংসা গীতি গাইতে থাকার কথা বিশেষভাবে এখানে উল্লেখ করার কারণ হচ্ছে এই যে, মুশরিকরা প্রত্যেক যুগে ফেরেশতাদেরকে দেবতা ও উপাস্য গণ্য করে এসেছে এবং আল্লাহর সার্বভৌম কর্তৃত্বে তাদেরকে শরীক মনে করে এসেছে। এ ভ্রান্ত ধারণার প্রতিবাদ করে বলা হয়েছে, সার্বভৌম কর্তৃত্বের ক্ষেত্রে তারা আল্লাহর সাথে শরীক নয় বরং তারা তাঁর অনুগত সেবক মাত্র এবং প্রভুর কর্তৃত্ব মহিমায় প্রকম্পিত হয়ে তারা তার প্রশংসা গীতি গাইছে।

২২. অর্থাৎ তাঁর কাছে অসংখ্য কৌশল রয়েছে। যে কোন সময় যে কারো বিরুদ্ধে যে কোন কৌশল তিনি এমন পদ্ধতিতে ব্যবহার করতে পারেন যে, আঘাত আসার এক মুহূর্ত আগেও সে জানতে পারে না কখন কোন্ দিক থেকে তার ওপর আঘাত আসছে। এ ধরনের একচ্ছত্র শক্তিশালী সত্তা সম্পর্কে যারা না ভেবেচিন্তে এমনি হাল্‌কাভাবে আজে–বাজে কথা বলে, কে তাদের বুদ্ধিমান বলতে পারে?

২৩. ডাকা মানে নিজের অভাব পূরণের উদ্দেশ্যে সাহায্যের জন্য ডাকা। এর মানে হচ্ছে, অভাব ও প্রয়োজন পূর্ণ এবং সংকটমুক্ত করার সব ক্ষমতা একমাত্র তাঁর হাতেই কেন্দ্রীভূত। তাই একমাত্র তাঁর কাছেই প্রার্থনা করা সঠিক ও যথার্থ সত্য বলে বিবেচিত।

২৪. সিজ্‌দা মানে আনুগত্য প্রকাশ করার জন্য ঝুঁকে পড়া, আদেশ পালন করা এবং পুরোপুরি মেনে নিয়ে মাথা নত করা। পৃথিবী ও আকাশের প্রত্যেকটি সৃষ্টি আল্লাহর আইনের অনুগত এবং তাঁর ইচ্ছার চুল পরিমাণও বিরোধিতা করতে পারে না—এ অর্থে তারা প্রত্যেকেই আল্লাহকে সিজদা করছে। মুমিন স্বেচ্ছায় ও সাগ্রহে তাঁর সামনে নত হয় কিন্তু কাফেরকে বাধ্য হয়ে নত হতে হয়। কারণ আল্লাহর প্রাকৃতিক আইনের বাইরে চলে যাওয়ার ক্ষমতা তার নেই।

২৫. ছায়ার নত হওয়ার ও সিজদা করার মানে হচ্ছে, বস্তুর ছায়ার সকাল-সাঁঝে পূর্ব ও পশ্চিম দিকে ঢলে পড়া এমন একটি আলামত যা থেকে বুঝা যায় যে, এসব জিনিস কারো হুকুমের অনুগত এবং কারোর আইনের অধীন।

২৬. উল্লেখ করা যেতে পারে, আল্লাহ পৃথিবী ও আকাশের রব একথা তারা নিজেরা মানতো। এ প্রশ্নের জবাবে তারা অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করতে পারতো না। কারণ একথা অস্বীকার করলে তাদের নিজেদের আকীদাকেই অস্বীকার করা হতো। কিন্তু নবী সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামের জিজ্ঞাসার পর তারা এর জবাব পাশ কাটিয়ে যেতে চাচ্ছিল। কারণ স্বীকৃতির পর তাওহীদকে মেনে নেয়া অপরিহার্য হয়ে উঠতো এবং এরপর শিরকের জন্য আর কোন যুক্তিসংগত বুনিয়াদ থাকতো না। তাই নিজেদের অবস্থানের দুর্বলতা অনুভব করেই তারা এ প্রশ্নের জবাবে নীরব হয়ে যেতো। এ কারণেই কুরআনের বিভিন্ন স্থানে আল্লাহ নবী সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলেন, ওদেরকে জিজ্ঞেস করো পৃথিবী ও আকাশের স্রষ্টা কে? বিশ্ব-জাহানের রব কে? কে তোমাদের রিযিক দিচ্ছেন? তারপর হুকুম দেন, তোমরা নিজেরাই বলো আল্লাহ এবং এরপর এভাবে যুক্তি পেশ করেন যে, আল্লাহই যখন এ সমস্ত কাজ করছেন তখন আর কে আছে যার তোমরা বন্দেগী করে আসছো?

২৭. অন্ধ বলে এমন ব্যক্তিকে বুঝানো হয়েছে যার সামনে বিশ্ব-জগতের চতুরদিকে আল্লাহর একত্বের চিহ্ন ও প্রমাণ ছড়িয়ে আছে কিন্তু সে তার মধ্য থেকে কোন একটি জিনিসও দেখছে না। আর চক্ষুষ্মান হচ্ছে এমন এক ব্যক্তি, যার দৃষ্টি বিশ্ব-জগতের প্রতিটি অণু-কণিকায় এবং প্রতিটি পত্র-পল্লবে একজন অসাধারণ কারিগরের অতুলনীয় কারিগরীর নিদর্শন প্রত্যক্ষ করে। আল্লাহর এ প্রশ্নের অর্থ হচ্ছে ঃ ওহে বুদ্ধিভ্রষ্টেরা। যদি তোমরা কিছুই দেখতে না পেয়ে থাকো তাহলে যাদের দেখার মতো চোখ আছে তারা কেমন করে নিজেদের চোখ বন্ধ করে নেবে? যে ব্যক্তি সত্যকে পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে সে কেমন করে দৃষ্টিশক্তিহীন লোকদের মতো আচরণ করবে এবং পথে বিপথে ঘুরে বেড়াবে?

২৮. আলো মানে সত্যজ্ঞানের আলো। নবী সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর অনুসারীরা এ সত্য জ্ঞানের আলো লাভ করেছিলেন। আর আঁধার মানে মূর্খতার আঁধার। নবীর অস্বীকারকারীরা এ আঁধারে পথ হারিয়ে ফেলেছিল। প্রশ্নের অর্থ হচ্ছে, যে ব্যক্তি আলো পেয়ে গেছে সে কেন নিজের প্রদীপ নিভিয়ে দিয়ে আঁধারের বুকে হোঁচট খেয়ে ফিরতে থাকবে? তোমাদের কাছে আলোর মর্যাদা না থাকলে না থাকতে পারে কিন্তু যে তার সন্ধান পেয়েছে, যে আলো ও আঁধারের পার্থক্য জেনে ফেলেছে এবং যে দিনের আলোয়

أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَالَتْ أَوْدِيَةٌ بِقَدَرِهَا فَاحْتَمَلَ السَّيْلُ زَبَدًا رَّابِيًا ۚ وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ ابْتِغَاءَ حِلْيَةٍ أَوْ مَتَاعٍ زَبَدٌ مِّثْلُهُ ۚ كَذَٰلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ ۚ فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً ۖ وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ ۚ كَذَٰلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ ﴿١٧﴾

আল্লাহ আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করেন এবং প্রত্যেক নদী–নালা নিজের সাধ্য অনুযায়ী তা নিয়ে প্রবাহিত হয়। তারপর যখন প্লাবন আসে তখন ফেনা পানির ওপরে ভাসতে থাকে।[৩১] *আর লোকেরা অলংকার ও তৈজসপত্রাদি নির্মাণের জন্য যেসব ধাতু গরম করে তার ওপরও ঠিক এমনি ফেনা ভেসে ওঠে।*[৩২] *এ উপমার সাহায্যে আল্লাহ হক ও বাতিলের বিষয়টি সুস্পষ্ট করে দেন। ফেনারাশি উড়ে যায় এবং যে বস্তুটি মানুষের জন্য উপকারী হয় তা যমীনে থেকে যায়। এভাবে আল্লাহ উপমার সাহায্যে নিজের কথা বুঝিয়ে থাকেন।*

সোজা পথ পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে সে কেমন করে আলো ত্যাগ করে আঁধারের মধ্যে পথ হাতড়ে বেড়াতে পারে?

২৯. এ প্রশ্নের অর্থ হচ্ছে, যদি দুনিয়ার কিছু জিনিস আল্লাহ সৃষ্টি করে থাকতেন এবং কিছু জিনিস অন্যেরা সৃষ্টি করতো আর কোন্‌টা আল্লাহর সৃষ্টি এবং কোন্‌টা অন্যদের এ পার্থক্য করা সম্ভব না হতো তাহলে তো সত্যিই শিরকের জন্য কোন যুক্তিসংগত ভিত্তি হতে পারতো। কিন্তু যখন এ মুশরিকরা নিজেরাই তাদের মাবুদদের একজনও একটি তৃণ এবং একটি চুলও সৃষ্টি করেনি বলে স্বীকার করে এবং যখন তারা একথাও স্বীকার করে যে, সৃষ্টিকর্মে এ বানোয়াট ইলাহ্‌দের সামান্যতমও অংশ নেই। তখন এ বানোয়াট মাবুদদেরকে স্রষ্টার ক্ষমতা, কর্তৃত্ব ও অধিকারে শামিল করা হলো কিসের ভিত্তিতে?

৩০. মূল আয়াতে 'কাহ্‌হার' শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। এর মানে হচ্ছে, এমন সত্তা যিনি নিজ শক্তিতে সবার ওপর হুকুম চালান এবং সবাইকে অধীনস্থ করে রাখেন। "আল্লাহ প্রত্যেকটি জিনিসের স্রষ্টা" একথাটি এমন একটি সত্য যাকে মুশরিকরাও স্বীকার করে নিয়েছিল এবং তারা কখনো এটা অস্বীকার করেনি। "তিনি একক ও মহাপরাক্রমশালী" একথাটি হচ্ছে মুশরিকদের ঐ স্বীকৃত সত্যের অনিবার্য ফল। প্রথম সত্যটি মেনে নেবার পর কোন জ্ঞান–বুদ্ধি সম্পন্ন ব্যক্তির পক্ষে একে অস্বীকার করা সম্ভবপর নয়। কারণ

لِلَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمُ الْحُسْنَىٰ ۚ وَالَّذِينَ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُ
لَوْ أَنَّ لَهُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَافْتَدَوْا بِهِ ۚ
أُولَٰئِكَ لَهُمْ سُوءُ الْحِسَابِ ۙ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ ۖ وَبِئْسَ الْمِهَادُ ﴿١٨﴾

যারা নিজেদের রবের দাওয়াত গ্রহণ করেছে তাদের জন্য কল্যাণ রয়েছে আর যারা তা গ্রহণ করেনি তারা যদি পৃথিবীর সমস্ত সম্পদের মালিক হয়ে যায় এবং এ পরিমাণ আরো সংগ্রহ করে নেয় তাহলেও তারা আল্লাহর পাকড়াও থেকে বাঁচার জন্য এ সমস্তকে মুক্তিপণ হিসেবে দিয়ে দিতে তৈরী হয়ে যাবে।[৩৩] এদের হিসেব নেয়া হবে নিকৃষ্টভাবে[৩৪] এবং এদের আবাস হবে জাহান্নাম, বড়ই নিকৃষ্ট আবাস।

যিনি প্রত্যেকটি জিনিসের স্রষ্টা নিসন্দেহে তিনি একক, অতুলনীয় ও সাদৃশ্যবিহীন। কারণ অন্য যা কিছু আছে সবই তাঁর সৃষ্টি। এ অবস্থায় কোন সৃষ্টি কেমন করে তার স্রষ্টার সত্তা, গুণাবলী, ক্ষমতা বা অধিকারে তাঁর সাথে শরীক হতে পারে? এভাবে তিনি নিসন্দেহে মহাপরাক্রমশালীও। কারণ সৃষ্টি তার স্রষ্টার অধীন হয়ে থাকবে, এটি সৃষ্টি–ধারণার অংগীভূত। সৃষ্টির ওপর স্রষ্টার যদি পূর্ণ কর্তৃত্ব ও দখল না থাকে তাহলে তিনি সৃষ্টিকর্মই বা করবেন কেমন করে? কাজেই যে ব্যক্তি আল্লাহকে স্রষ্টা বলে মানে তার পক্ষে এ দু'টি বুদ্ধিবৃত্তিক ও ন্যায়ানুগ ফলশ্রুতি অস্বীকার করা সম্ভবপর হয় না। কাজেই এরপরে কোন ব্যক্তি স্রষ্টাকে বাদ দিয়ে সৃষ্টির বন্দেগী করবে এবং মহাপরাক্রমশালীকে বাদ দিয়ে দুর্বল ও অধীনকে সংকট উত্তরণ করাবার জন্য আহবান জানাবে, একথা একেবারেই অযৌক্তিক প্রমাণিত হয়।

৩১. নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর অহীর মাধ্যমে যে জ্ঞান নাযিল করা হয়েছিল এ উপমায় তাকে বৃষ্টির সাথে তুলনা করা হয়েছে। আর ঈমানদার, সুস্থ ও ভারসাম্যপূর্ণ স্বাভাবিক বৃত্তির অধিকারী মানুষদেরকে এমনসব নদীনালার সাথে তুলনা করা হয়েছে যেগুলো নিজ নিজ ধারণক্ষমতা অনুযায়ী রহমতের বৃষ্টি ধারায় নিজদেরকে পরিপূর্ণ করে প্রবাহিত হতে থাকে। অন্যদিকে সত্য অস্বীকারকারী ও সত্য বিরোধীরা ইসলামী আন্দোলনের বিরুদ্ধে যে হৈ–হাংগামা ও উপদ্রব সৃষ্টি করেছিল তাকে এমন ফেনা ও আবর্জনারাশির সাথে তুলনা করা হয়েছে যা হামেশা বন্যা শুরু হবার সাথে সাথেই পানির উপরিভাগে উঠে আসতে থাকে।

৩২. অর্থাৎ নির্ভেজাল ধাতু গলিয়ে কাজে লাগাবার জন্য স্বর্ণকারের চূলা গরম করা হয়। কিন্তু যখনই এ কাজ করা হয় তখনই অবশ্যি ময়লা আবর্জনা ওপরে ভেসে ওঠে এবং এমনভাবে তা ঘূর্ণিত হতে থাকে যাতে কিছুক্ষণ পর্যন্ত উপরিভাগে শুধু আবর্জনারাশিই দৃষ্টিগোচর হতে থাকে।

৩৩. অর্থাৎ তখন তাদের ওপর এমন বিপদ আসবে যার ফলে তারা নিজেদের জান বাঁচাবার জন্য দুনিয়ার সমস্ত সম্পদ দিয়ে দেবার ব্যাপারে একটুও ইতস্তত করবে না।

أَفَمَن يَعْلَمُ أَنَّمَآ أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ ٱلْحَقُّ كَمَنْ هُوَ أَعْمَىٰٓ ۚ
إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُو۟لُوا۟ ٱلْأَلْبَٰبِ ﴿١٩﴾ ٱلَّذِينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ ٱللَّهِ
وَلَا يَنقُضُونَ ٱلْمِيثَٰقَ ﴿٢٠﴾ وَٱلَّذِينَ يَصِلُونَ مَآ أَمَرَ ٱللَّهُ بِهِۦٓ أَن يُوصَلَ
وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوٓءَ ٱلْحِسَابِ ﴿٢١﴾ وَٱلَّذِينَ صَبَرُوا۟
ٱبْتِغَآءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ وَأَقَامُوا۟ ٱلصَّلَوٰةَ وَأَنفَقُوا۟ مِمَّا رَزَقْنَٰهُمْ سِرًّا
وَعَلَانِيَةً وَيَدْرَءُونَ بِٱلْحَسَنَةِ ٱلسَّيِّئَةَ أُو۟لَٰٓئِكَ لَهُمْ عُقْبَى ٱلدَّارِ ﴿٢٢﴾

৩ রুকূ'

আচ্ছা তোমার রবের পক্ষ থেকে তোমার ওপর যে কিতাব নাযিল হয়েছে, তাকে যে ব্যক্তি সত্য মনে করে আর যে ব্যক্তি এ সত্যটির ব্যাপারে অন্ধ, তারা দু'জন সমান হবে, এটা কেমন করে সম্ভব?[৩৫] উপদেশ তো শুধু বিবেকবান লোকেরাই গ্রহণ করে।[৩৬] আর তাদের কর্মপদ্ধতি এমন হয় যে, তারা আল্লাহকে প্রদত্ত নিজেদের অংগীকার পালন করে এবং তাকে মজবুত করে বাঁধার পর ভেঙ্গে ফেলে না।[৩৭] তাদের নীতি হয়, আল্লাহ যেসব সম্পর্ক ও বন্ধন অক্ষুণ্ণ রাখার হুকুম দিয়েছেন[৩৮] সেগুলো তারা অক্ষুণ্ণ রাখে, নিজেদের রবকে ভয় করে এবং তাদের থেকে কড়া হিসেব না নেয়া হয় এই ভয়ে সন্ত্রস্ত থাকে। তাদের অবস্থা হয় এই যে, নিজেদের রবের সন্তুষ্টির জন্য তারা সবর করে,[৩৯] নামায কায়েম করে, আমার দেয়া রিযিক থেকে প্রকাশ্যে ও গোপনে খরচ করে এবং ভালো দিয়ে মন্দ দূরীভূত করে।[৪০] আখেরাতের গৃহ হচ্ছে তাদের জন্যই। অর্থাৎ এমন সব বাগান যা হবে তাদের চিরস্থায়ী আবাস।

৩৪. নিকৃষ্টভাবে হিসেব নেয়া অথবা কড়া হিসেব নেয়ার মানে হচ্ছে এই যে, মানুষের কোন ভুল-ভ্রান্তি ও ত্রুটি-বিচ্যুতি মাফ করা হবে না। তার কোন অপরাধের বিচার না করে তাকে এমনি ছেড়ে দেয়া হবে না।

কুরআন আমাদের জানায়, এ ধরনের হিসেব আল্লাহ তাঁর এমন বান্দাদের থেকে নেবেন যারা তাঁর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে দুনিয়ায় জীবন যাপন করেছে। বিপরীতপক্ষে যারা আল্লাহর প্রতি বিশ্বস্ত আচরণ করেছে এবং তাঁর প্রতি অনুগত থেকে জীবন যাপন করেছে তাদের থেকে "সহজ হিসেব" অর্থাৎ হাল্‌কা হিসেব নেয়া হবে। তাদের বিশ্বস্ততামূলক কার্যক্রমের মোকাবিলায় ত্রুটি-বিচ্যুতিগুলো মাফ করে দেয়া হবে। তাদের সামগ্রিক

কর্মনীতির সুকৃতিকে সামনে রেখে তাদের বহু ভুল-ভ্রান্তি উপেক্ষা করা হবে। হযরত আয়েশা (রা) থেকে আবু দাউদে যে হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে সেখানে এ বিষয়টির আরো সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা পাওয়া যাবে। হযরত আয়েশা (রা) বলেন ঃ আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল! আমার কাছে আল্লাহর কিতাবের সবচেয়ে ভয়াবহ আয়াত হচ্ছে সেই আয়াতটি যাতে বলা হয়েছে ঃ وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءً يُجْزَ بِهِ অর্থাৎ "যে ব্যক্তি কোন খারাপ কাজ করবে সে তার শাস্তি পাবে।" একথায় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, হে আয়েশা! তুমি কি জানো না, আল্লাহর বিশ্বস্ত ও অনুগত বান্দা দুনিয়ায় যে কষ্টই পেয়েছে, এমনকি তার শরীরে যদি কোন কাঁটাও ফুটে থাকে তাহলে তাকে তার কোন অপরাধের শাস্তি হিসেবে গণ্য করে দুনিয়াতেই তার হিসেব পরিষ্কার করে দেন? আখেরাতে তো যারই হিসেব শুরু হবে সে অবশ্যি শাস্তি পাবে। হযরত আয়েশা (রা) বললেন, তাহলে আল্লাহর এ উক্তির তাৎপর্য কি যাতে বলা হয়েছে—

فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا ؟

"যার আমলনামা ডান হাতে দেয়া হবে তার থেকে হাল্কা হিসেব নেয়া হবে।"

এর জবাবে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, এর অর্থ হচ্ছে, উপস্থাপনা (অর্থাৎ তার সৎকাজের সাথে সাথে অসৎকাজগুলোর উপস্থাপনা আল্লাহর সামনে) অবশ্যি হবে কিন্তু যাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে, তার ব্যাপারে জেনে রাখো, সে মারা পড়েছে।

৩৫. অর্থাৎ এ দু' ব্যক্তির নীতি দুনিয়ায় এক রকম হতে পারে না এবং আখেরাতে তাদের পরিণামও একই ধরনের হতে পারে না।

৩৬. অর্থাৎ আল্লাহর পাঠানো এ শিক্ষা এবং আল্লাহর রসূলের এ দাওয়াত যারা গ্রহণ করে তারা বুদ্ধিভ্রষ্ট হয় না বরং তারা হয় বিবেকবান, সতর্ক ও বিচক্ষণ ব্যক্তি। এ ছাড়া দুনিয়ায় তাদের জীবন ও চরিত্র যে রূপ ধারণ করে এবং আখেরাতে তারা যে পরিণাম ফল ভোগ করে পরবর্তী আয়াতগুলোতে তা বর্ণনা করা হয়েছে।

৩৭. এর অর্থ হচ্ছে সেই অনন্তকালীন অংগীকার যা সৃষ্টির শুরুতেই আল্লাহ সমস্ত মানুষের কাছ থেকে নিয়েছিলেন। তিনি অংগীকার নিয়েছিলেন, মানুষ একমাত্র তাঁর বন্দেগী করবে (বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন সূরা আ'রাফ ১৩৪ ও ১৩৫ টীকা)। প্রত্যেকটি মানুষের কাছ থেকে এ অংগীকার নেয়া হয়েছিল। প্রত্যেকের প্রকৃতির মধ্যে এটি নিহিত রয়েছে। যখনই আল্লাহর সৃজনী কর্মের মাধ্যমে মানুষ অস্তিত্ব লাভ করে এবং তাঁর প্রতিপালন কর্মকাণ্ডের আওতাধীনে সে প্রতিপালিত হতে থাকে তখনই এটি পাকাপোক্ত হয়ে যায়। আল্লাহর রিযিকের সাহায্যে জীবন যাপন করা, তাঁর সৃষ্ট প্রত্যেকটি বস্তুকে কাজে লাগানো এবং তাঁর দেয়া শক্তিগুলো ব্যবহার করা—এগুলো মানুষকে স্বতস্ফূর্তভাবে একটি বন্দেগীর অংগীকারে বেঁধে ফেলে। কোন সচেতন ও বিশ্বস্ত মানুষ এ অংগীকার ভেংগে ফেলার সাহস করতে পারে না। তবে হাঁ, অজান্তে কখনো সে কোন ভুল করে ফেলতে পারে, সেটা অবশ্যি ভিন্ন কথা।

৩৮. অর্থাৎ এমন সব সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সম্পর্ক, যেগুলো সঠিকভাবে প্রতিষ্ঠিত হলেই মানুষের সামগ্রিক জীবনের কল্যাণ ও সাফল্য নিশ্চিত হয়।

৩৯. অর্থাৎ নিজেদের প্রবৃত্তি ও আকাংখা নিয়ন্ত্রণ করে, নিজেদের আবেগ, অনুভূতি ও ঝোঁক প্রবণতাকে নিয়ম ও সীমার মধ্যে আবদ্ধ রাখে, আল্লাহর নাফরমানিতে বিভিন্ন স্বার্থলাভ ও ভোগ–লালসার চরিতার্থ হওয়ার সুযোগ দেখে পা পিছলে যায় না এবং আল্লাহর হুকুম মেনে চলার পথে যেসব ক্ষতি ও কষ্টের আশংকা দেখা দেয় সেসব বরদাশ্‌ত করে যেতে থাকে। এ দৃষ্টিতে বিচার করলে মুমিন আসলে পুরোপুরি একটি সবরের জীবন যাপন করে। কারণ সে আল্লাহর সন্তুষ্টির আশায় এবং আখেরাতের স্থায়ী পরিণাম ফলের পতি দৃষ্টি রেখে এ দুনিয়ায় আত্মসংযম করতে থাকে এবং সবরের সাথে মনের প্রতিটি পাপ প্রবণতার মোকাবিলা করে।

৪০. অর্থাৎ তারা মন্দের মোকাবিলায় মন্দ করে না বরং ভালো করে। তারা অন্যায়ের মোকাবিলা অন্যায়কে সাহায্য না করে ন্যায়কে সাহায্য করে। কেউ তাদের প্রতি যতই জুলুম করুক না কেন তার জবাবে তারা পাল্‌টা জুলুম করে না বরং ইনসাফ করে। কেউ তাদের বিরুদ্ধে যতই মিথ্যাচার করুক না কেন জবাবে তারা সত্যই বলে। কেউ তাদের সাথে যতই বিশ্বাস ভংগ করুক না কেন জবাবে তারা বিশ্বস্ত আচরণই করে থাকে। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিম্নোক্ত হাদীসটি এ অর্থই প্রকাশ করে ঃ

لاَ تَكُوْنُوْا اِمَّعَةً ، تَقُوْلُوْنَ اِنْ اَحْسَنَ النَّاسُ اَحْسَنَّا وَاِنْ ظَلَمُوْنَا ظَلَمْنَا وَلٰكِنْ وَطِّنُوْا اَنْفُسَكُمْ اِنْ اَحْسَنَ النَّاسُ اَنْ تُحْسِنُوْا وَاِنْ اَسَاؤُا فَلاَ تَظْلِمُوْا –

"তোমরা নিজেদের কার্যধারাকে অন্যের কর্মধারার অনুসারী করো না। একথা বলা ঠিক নয় যে লোকেরা ভালো করলে আমরা ভালো করবো এবং লোকেরা জুলুম করলে আমরাও জুলুম করবো। তোমরা নিজেদেরকে একটি নিয়মের অধীন করো। যদি লোকেরা সদাচার করে তাহলে তোমরাও সদাচার করো। আর যদি লোকেরা তোমাদের সাথে অসৎ আচরণ করে তাহলে তোমরা জুলুম করো না।"

রসূলুল্লাহর (সা) এ হাদীসটিও এ একই অর্থ প্রকাশ করে, যাতে বলা হয়েছে ঃ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, আল্লাহ আমাকে নয়টি বিষয়ের হুকুম দিয়েছেন। এর মধ্যে তিনি এ চারটি কথা বলেছেন ঃ কারোর প্রতি সন্তুষ্ট বা অসন্তুষ্ট যাই থাকি না কেন সর্বাবস্থায় আমি যেন ইনসাফের কথা বলি। যে আমার অধিকার হরণ করে আমি যেন তার অধিকার আদায় করি। যে আমাকে বঞ্চিত করবে আমি যেন তাকে দান করি। আর যে আমার প্রতি জুলুম করবে আমি যেন তাকে মাফ করে দেই। আর এ হাদীসটিও এ একই অর্থ প্রকাশ করে, যাতে বলা হয়েছে ঃ لا تخن من خانك অর্থাৎ "যে তোমার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে তুমি তার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করো না।" হযরত উমরের (রা) নিম্নোক্ত উক্তিটিও এ অর্থ প্রকাশ করে ঃ "যে ব্যক্তি তোমার প্রতি আচরণ করার ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করে না তুমি আল্লাহকে ভয় করে তার প্রতি আচরণ করো।"

جَنّٰتُ عَدْنٍ يَّدْخُلُوْنَهَا وَمَنْ صَلَحَ مِنْ اٰبَآئِهِمْ وَاَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيّٰتِهِمْ وَالْمَلٰٓئِكَةُ يَدْخُلُوْنَ عَلَيْهِمْ مِّنْ كُلِّ بَابٍ ۝ سَلٰمٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ ۝ وَالَّذِيْنَ يَنْقُضُوْنَ عَهْدَ اللّٰهِ مِنْۢ بَعْدِ مِيْثَاقِهٖ وَيَقْطَعُوْنَ مَآ اَمَرَ اللّٰهُ بِهٖٓ اَنْ يُّوْصَلَ وَيُفْسِدُوْنَ فِى الْاَرْضِ ۙ اُولٰٓئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوْٓءُ الدَّارِ ۝ اَللّٰهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَّشَآءُ وَيَقْدِرُ ؕ وَفَرِحُوْا بِالْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ؕ وَمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا فِى الْاٰخِرَةِ اِلَّا مَتَاعٌ ۝

তারা নিজেরা তার মধ্যে প্রবেশ করবে এবং তাদের বাপ–দাদারা ও স্ত্রী–সন্তানদের মধ্য থেকে যারা সৎকর্মশীল হবে তারাও তাদের সাথে সেখানে যাবে। ফেরেশতারা সব দিক থেকে তাদেরকে অভ্যর্থনা জানাবার জন্য আসবে এবং তাদেরকে বলবে ঃ "তোমাদের প্রতি শান্তি।[৪১] তোমরা দুনিয়ায় যেভাবে সবর করে এসেছো তার বিনিময়ে আজ তোমরা এর অধিকারী হয়েছো।"—কাজেই কতই চমৎকার এ আখেরাতের গৃহ! আর যারা আল্লাহর অংগীকারে মজবুতভাবে আবদ্ধ হবার পর তা ভেঙে ফেলে, আল্লাহ যেসব সম্পর্ক জোড়া দেবার হুকুম দিয়েছেন সেগুলো ছিন্ন করে এবং পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করে তারা লানতের অধিকারী এবং তাদের জন্য রয়েছে আখেরাতে বড়ই খারাপ আবাস।

আল্লাহ যাকে ইচ্ছা রিযিক সম্প্রসারিত করেন এবং যাকে চান মাপাজোকা রিযিক দান করেন।[৪২] এরা দুনিয়ার জীবনে উল্লসিত, অথচ দুনিয়ার জীবন আখেরাতের তুলনায় সামান্য সামগ্রী ছাড়া আর কিছুই নয়।

৪১. এর মানে কেবল এ নয় যে, ফেরেশতারা চারদিক থেকে এসে তাদেরকে সালাম করতে থাকবে বরং তারা তাদেরকে এ সুখবরও দেবে যে, এখন তোমরা এমন জায়গায় এসেছো যেখানে পরিপূর্ণ শান্তি ও নিরাপত্তা বিরাজমান। এখন তোমরা এখানে সবরকমের আপদ–বিপদ, কষ্ট, কাঠিন্য, কঠোর পরিশ্রম, শংকা ও আতংকমুক্ত। (আরো বেশী জানার জন্য দেখুন সূরা হিজ্র ২৯ টীকা)

وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ ۚ قُلْ إِنَّ اللَّهَ
يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ ﴿٢٧﴾ الَّذِينَ آمَنُوا
وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُم بِذِكْرِ اللَّهِ ۗ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ ﴿٢٨﴾
الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ طُوبَىٰ لَهُمْ وَحُسْنُ مَآبٍ ﴿٢٩﴾ كَذَٰلِكَ
أَرْسَلْنَاكَ فِي أُمَّةٍ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهَا أُمَمٌ لِّتَتْلُوَ عَلَيْهِمُ الَّذِي
أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَٰنِ ۚ قُلْ هُوَ رَبِّي لَا إِلَٰهَ
إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ مَتَابِ ﴿٣٠﴾

৪ রুকূ'

যারা (মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের রিসালাত মেনে নিতে) অস্বীকার করেছে তারা বলে, "এ ব্যক্তির কাছে এর রবের পক্ষ থেকে কোন নিদর্শন অবতীর্ণ হয়নি কেন?"[৪৩] বলো, আল্লাহ যাকে চান গোমরাহ করে দেন এবং তিনি তাকেই তাঁর দিকে আসার পথ দেখান যে তাঁর দিকে রুজু করে।[৪৪] তারাই এ ধরনের লোক যারা (এ নবীর দাওয়াত) গ্রহণ করেছে এবং আল্লাহর স্মরণে তাদের চিত্ত প্রশান্ত হয়। সাবধান হয়ে যাও। আল্লাহর স্মরণই হচ্ছে এমন জিনিস যার সাহায্যে চিত্ত প্রশান্তি লাভ করে। তারপর যারা সত্যের দাওয়াত মেনে নিয়েছে এবং সৎকাজ করেছে তারা সৌভাগ্যবান এবং তাদের জন্য রয়েছে শুভ পরিণাম।

হে মুহাম্মাদ! এহেন মাহাত্ম সহকারে আমি তোমাকে নবী বানিয়ে পাঠিয়েছি[৪৫] এমন এক জাতির মধ্যে যার আগে বহু জাতি অতিক্রান্ত হয়ে গেছে, যাতে তোমার কাছে আমি যে পয়গাম অবতীর্ণ করেছি তা তুমি এদেরকে শুনিয়ে দাও, এমন অবস্থায় যখন এরা নিজেদের পরম দয়াময় আল্লাহকে অস্বীকার করছে।[৪৬] এদেরকে বলে দাও, তিনিই আমার রব, তিনি ছাড়া আর কোন মাবুদ নেই, তাঁরই ওপর আমি ভরসা করেছি এবং তাঁরই কাছে আমাকে ফিরে যেতে হবে।

৪২. এ আয়াতের পটভূমি হচ্ছে, সাধারণ মূর্খ ও অজ্ঞদের মতো মক্কার কাফেররাও বিশ্বাস ও কর্মের সৌন্দর্য বা কদর্যতা দেখার পরিবর্তে ধনাঢ্যতা বা দারিদ্রের দৃষ্টিতে

মানুষের মূল্য ও মর্যাদা নিরূপণ করতো। তাদের ধারণা ছিল, যারা দুনিয়ায় প্রচুর পরিমাণ আরাম আয়েশের সামগ্রী লাভ করছে তারা যতই পথভ্রষ্ট ও অসৎকর্মশীল হোক না কেন তারা আল্লাহর প্রিয়। আর অভাবী ও দারিদ্র পীড়িতরা যতই সৎ হোক না কেন তারা আল্লাহর অভিশপ্ত। এ নীতির ভিত্তিতে তারা কুরাইশ সরদারদেরকে নবী সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামের গরীব সাথীদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ মনে করতো এবং বলতো, আল্লাহ কার সাথে আছেন তোমরা দেখে নাও। এ ব্যাপারে তাদেরকে সতর্ক করে বলা হচ্ছে, রিযিক কমবেশী হবার ব্যাপারটা আল্লাহর অন্য আইনের সাথে সংশ্লিষ্ট। সেখানে অন্যান্য অসংখ্য প্রয়োজন ও কল্যাণ–অকল্যাণের প্রেক্ষিতে কাউকে বেশী ও কাউকে কম দেয়া হয়। এটা এমন কোন মানদণ্ড নয় যার ভিত্তিতে মানুষের নৈতিক ও মানসিক সৌন্দর্য ও কদর্যতার ফায়সালা করা যেতে পারে। মানুষের মধ্যে কে চিন্তা ও কর্মের সঠিক পথ অবলম্বন করেছে এবং কে ভুল পথ, কে উন্নত ও সৎগুণাবলী অর্জন করেছে এবং কে অসৎগুণাবলী—এরি ভিত্তিতে মানুষে মানুষে মর্যাদার মূল পার্থক্য নির্ণীত হয় এবং তাদের সৌভাগ্য ও দুর্ভাগ্যের আসল মানদণ্ডও এটিই। কিন্তু মূর্খরা এর পরিবর্তে দেখে, কাকে ধন–দৌলত বেশী এবং কাকে কম দেয়া হয়েছে।

৪৩. এর আগে এ সূরার প্রথম রুকূ'র শেষ আয়াতে এ প্রশ্নের যে জবাব দেয়া হয়েছে তা এখানে সামনে রাখা দরকার। এখানে দ্বিতীয়বার তাদের একই আপত্তির কথা উল্লেখ করে অন্যভাবে তার জবাব দেয়া হচ্ছে।

৪৪. অর্থাৎ যে নিজেই আল্লাহর দিকে রুজু হয় না বরং তাঁর দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় তাকে জোর করে সত্য–সঠিক পথ দেখানো আল্লাহর রীতি নয়। এ ধরনের লোকেরা সত্য–সঠিক পথ পরিত্যাগ করে উদভ্রান্তের মতো যেসব ভুল পথে ঘুরে বেড়াতে চায় আল্লাহ তাদেরকে সেই সব পথে ঘুরে বেড়াবার সুযোগ দান করেন। একজন সত্য–সন্ধানীর জন্য যেসব কার্যকারণ সত্য পথলাভের সহায়ক হয়, একজন অসত্য ও ভ্রান্ত পথ প্রত্যাশী ব্যক্তির জন্য সেগুলো বিভ্রান্তি ও গোমরাহীর কারণে পরিণত করে দেয়া হয়। উজ্জ্বল প্রদীপ তার সামনে এলেও তা তাকে পথ দেখাবার পরিবর্তে তার চোখকে অন্ধ করে দেবার কাজ করে। আল্লাহ কর্তৃক কোন ব্যক্তিকে গোমরাহ করার অর্থ এটাই।

নিদর্শন দেখতে চাওয়ার জবাবে একথা বলা নজিরবিহীন বাকশৈলীর পরিচায়ক। তারা বলছিল, কোন নিদর্শন দেখাও, তাহলে আমরা তোমার কথা বিশ্বাস করতে পারি। জবাবে বলা হয়েছে, মূর্খের দল! তোমাদের সত্য পথ না পাওয়ার আসল কারণ এ নয় যে, তোমাদের সামনে কোন নিদর্শন নেই বরং এর কারণ হচ্ছে, তোমাদের মধ্যে সত্য পথ লাভের কোন আকাংখাই নেই। নিদর্শন তো চতুরদিকে অসংখ্য ছড়িয়ে আছে। কিন্তু সেগুলোর কোনটিই তোমাদের পথপ্রদর্শকে পরিণত হয় না। কারণ আল্লাহর পথে চলার ইচ্ছাই তোমাদের নেই। এখন যদি কোন নিদর্শন আসে তাহলে তা তোমাদের জন্য কেমন করে উপকারী হতে পারে? কোন নিদর্শন দেখানো হয়নি বলে তোমরা অভিযোগ করছো। কিন্তু যারা আল্লাহর পথের সন্ধান করে ফিরছে তারা নিদর্শন দেখতে পাচ্ছে এবং নিদর্শনসমূহ দেখেই তারা সত্য পথের সন্ধান লাভ করছে।

وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَىٰ ۗ بَل لِّلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا ۗ أَفَلَمْ يَيْأَسِ الَّذِينَ آمَنُوا أَن لَّوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَهَدَى النَّاسَ جَمِيعًا ۗ وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا تُصِيبُهُم بِمَا صَنَعُوا قَارِعَةٌ أَوْ تَحُلُّ قَرِيبًا مِّن دَارِهِمْ حَتَّىٰ يَأْتِيَ وَعْدُ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ ﴿٣١﴾

আর কী হতো, যদি এমন কোন কুরআন নাযিল করা হতো যার শক্তিতে পাহাড় চলতে থাকতো অথবা পৃথিবী বিদীর্ণ হতো কিংবা মৃত কবর থেকে বের হয়ে কথা বলতে থাকতো?[৪৭] (এ ধরনের নিদর্শন দেখিয়ে দেয়া তেমন কঠিন কাজ নয়) বরং সমস্ত ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহরই হাতে কেন্দ্রীভূত।[৪৮] তাহলে ঈমানদাররা কি (এখনো পর্যন্ত কাফেরদের চাওয়ার জবাবে কোন নিদর্শন প্রকাশের আশায় বসে আছে এবং তারা একথা জেনে) হতাশ হয়ে যায়নি যে, যদি আল্লাহ চাইতেন তাহলে সমগ্র মানব জাতিকে হেদায়াত দিয়ে দিতেন?[৪৯] যারা আল্লাহর সাথে কুফরীর নীতি অবলম্বন করে রেখেছে তাদের ওপর তাদের কৃতকর্মের দরুন কোন না কোন বিপর্যয় আসতেই থাকে অথবা তাদের ঘরের কাছেই কোথাও তা অবতীর্ণ হয়। এ ধারাবাহিকতা চলতেই থাকবে যে পর্যন্ত না আল্লাহর ওয়াদা পূর্ণ হয়ে যায়। অবশ্যি আল্লাহ নিজের ওয়াদার ব্যতিক্রম করেন না।

৪৫. অর্থাৎ তারা যে নিদর্শন চাচ্ছে তেমনি কোন নিদর্শন ছাড়াই।

৪৬. অর্থাৎ তাঁর বন্দেগী থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে আছে। তাঁর গুণাবলী, ক্ষমতা ও অধিকারে অন্যদেরকে তাঁর সাথে শরীক করছে। তাঁর দানের জন্য অন্যদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছে।

৪৭. এ আয়াতটির অর্থ উপলব্ধি করার জন্য লক্ষ রাখতে হবে যে, এখানে কাফেরদেরকে নয় বরং মুসলমানদেরকে সম্বোধন করা হয়েছে। মুসলমানরা কাফেরদের পক্ষ থেকে বার বার এসব নিদর্শন দেখাবার দাবী শুনতো। ফলে তাদের মন অস্থির হয়ে উঠতো। তারা মনে করতো, আহা, যদি এদেরকে এমন কোন নিদর্শন দেখিয়ে দেয়া হতো যার ফলে এরা মেনে নিতো, তাহলে কতই না ভালো হতো। তারপর যখন তারা অনুভব করতো, এ ধরনের কোন নিদর্শন না আসার কারণে কাফেররা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নবুওয়াত সম্পর্কে লোকদের মনে সন্দেহ সৃষ্টির সুযোগ পাচ্ছে তখন তাদের এ অস্থিরতা আরো বেড়ে যেতো। তাই মুসলমানদেরকে বলা হচ্ছে, যদি কুরআনের কোন

وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّنْ قَبْلِكَ فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِيْنَ كَفَرُوْا ثُمَّ
أَخَذْتُهُمْ ۖ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ ﴿٣٢﴾ أَفَمَنْ هُوَ قَائِمٌ عَلٰى كُلِّ نَفْسٍ
بِمَا كَسَبَتْ ۚ وَجَعَلُوْا لِلّٰهِ شُرَكَاءَ ۗ قُلْ سَمُّوْهُمْ ۗ أَمْ تُنَبِّئُوْنَهٗ بِمَا
لَا يَعْلَمُ فِي الْأَرْضِ أَمْ بِظَاهِرٍ مِّنَ الْقَوْلِ ۗ بَلْ زُيِّنَ لِلَّذِيْنَ كَفَرُوْا
مَكْرُهُمْ وَصُدُّوْا عَنِ السَّبِيْلِ ۗ وَمَنْ يُّضْلِلِ اللّٰهُ فَمَا لَهٗ مِنْ هَادٍ ﴿٣٣﴾
لَهُمْ عَذَابٌ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَلَعَذَابُ الْاٰخِرَةِ أَشَقُّ ۚ وَمَا لَهُمْ
مِّنَ اللّٰهِ مِنْ وَّاقٍ ﴿٣٤﴾

৫ রুকূ'

তোমার আগেও অনেক রসূলকে বিদ্রূপ করা হয়েছে। কিন্তু আমি সবসময় অমান্যকারীদেরকে ঢিল দিয়ে এসেছি এবং শেষ পর্যন্ত তাদেরকে পাকড়াও করেছি। তাহলে দেখো আমার শাস্তি কেমন কঠোর ছিল।

তবে কি যিনি প্রত্যেক ব্যক্তির উপার্জনের প্রতি নজর রাখেন[৫০] (তাঁর মোকাবিলায় এ দুঃসাহস করা হচ্ছে যে)[৫১] লোকেরা তাঁর কিছু শরীক ঠিক করে রেখেছে? হে নবী! এদেরকে বলো, (যদি তারা সত্যিই আল্লাহর বানানো শরীক হয়ে থাকে তাহলে) তাদের পরিচয় দাও, তারা কারা? না কি তোমরা আল্লাহকে এমন একটি নতুন খবর দিচ্ছো যার অস্তিত্ব পৃথিবীতে তাঁর অজানাই রয়ে গেছে? অথবা তোমরা এমনি যা মুখে আসে বলে দাও?[৫২] আসলে যারা সত্যের দাওয়াত মেনে নিতে অস্বীকার করেছে তাদের জন্য তাদের প্রতারণাসমূহকে[৫৩] সুসজ্জিত করে দেয়া হয়েছে এবং তাদেরকে সত্য–সঠিক পথ থেকে নিবৃত্ত করা হয়েছে।[৫৪] তারপর আল্লাহ যাকে গোমরাহীতে লিপ্ত করেন তাকে পথ দেখাবার কেউ নেই। এ ধরনের লোকদের জন্য দুনিয়ার জীবনেই রয়েছে আযাব এবং আখেরাতের আযাব এর চেয়েও বেশী কঠিন। তাদেরকে আল্লাহর হাত থেকে বাঁচাবার কেউ নেই।

সূরার সাথে এমন ধরনের নিদর্শনাদি অকস্মাত দেখিয়ে দেয়া হতো তাহলে কি তোমরা মনে করো যে, সত্যিই এরা ঈমান আনতো? তোমরা কি এদের সম্পর্কে এ সুধারণা পোষণ করো যে, এরা সত্য গ্রহণের জন্য একেবারে তৈরী হয়ে বসে আছে, শুধুমাত্র

একটি নিদর্শন দেখিয়ে দেবার কাজ বাকি রয়ে গেছে? যারা কুরআনের শিক্ষাবলীতে, বিশ্ব–জগতের নিদর্শনসমূহের মধ্যে, নবীর পবিত্র–পরিচ্ছন্ন জীবনে, সাহাবায়ে কেরামের বিপ্লবমুখর জীবনধারায় কোন সত্যের আলো দেখতে পাচ্ছে না, তোমরা কি মনে করো তারা পাহাড়ের গতিশীল হওয়া, মাটি ফেটে চৌচির হয়ে যাওয়া এবং কবর থেকে মৃতদের বের হয়ে আসার মত অলৌকিক ঘটনাবলীতে কোন আলোর সন্ধান পাবে?

৪৮. নিদর্শনসমূহ না দেখাবার আসল কারণ এ নয় যে, আল্লাহর এগুলো দেখাবার শক্তি নেই বরং আসল কারণ হচ্ছে, এ পদ্ধতিকে কাজে লাগানো আল্লাহর উদ্দেশ্য বিরোধী। কারণ আসল উদ্দেশ্য হেদায়াত লাভ করা, নবীর নবুওয়াতের স্বীকৃতি আদায় করা নয়। আর চিন্তা ও অন্তরদৃষ্টির সংশোধন ছাড়া হেদায়াত লাভ সম্ভব নয়।

৪৯. জ্ঞান ও উপলব্ধি ছাড়া নিছক একটি অসচেতন ঈমানই যদি উদ্দেশ্য হতো তাহলে এ জন্য নিদর্শনাদি দেখাবার কষ্টের কি প্রয়োজন ছিল? আল্লাহ সমস্ত মানুষকে মুসলমান হিসেবে পয়দা করে দিলেই তো এ উদ্দেশ্য সফল হতে পারতো।

৫০. অর্থাৎ যিনি ব্যক্তিগতভাবে প্রত্যেকটি লোকের অবস্থা জানেন। কোন সৎলোকের সৎকাজ এবং অসৎলোকের অসৎকাজ যার দৃষ্টির আড়ালে নেই।

৫১. দুঃসাহস হচ্ছে এই যে, তাঁর সমকক্ষ ও প্রতিপক্ষ দাঁড় করানো হচ্ছে, তাঁর সত্তা, গুণাবলী ও অধিকারে তাঁর সৃষ্টিকে শরীক করা হচ্ছে এবং তাঁর সার্বভৌম কর্তৃত্বের অধীনে অবস্থান করে লোকেরা মনে করছে আমরা যা ইচ্ছা—করবো, আমাদের জিজ্ঞাসাবাদ করার কেউ নেই।

৫২. অর্থাৎ তোমরা যে তাঁর শরীক দাঁড় করাচ্ছো এ ব্যাপারে তিন ধরনের অবস্থা সম্ভবপরঃ

এক ঃ আল্লাহ কোন নির্দিষ্ট সত্তাকে তাঁর গুণাবলী, ক্ষমতা বা অধিকারে শরীক গণ্য করেছেন বলে তোমাদের কাছে কোন প্রামাণ্য ঘোষণা এসেছে কি? যদি এসে থাকে তাহলে মেহেরবানী করে বলো তারা কারা এবং তাদেরকে আল্লাহর সাথে শরীক করার সংবাদ তোমরা পেয়েছো কিসের মাধ্যমে?

দুই ঃ আল্লাহ নিজেই জানেন না পৃথিবীতে কিছু সত্তা তাঁর অংশীদার হয়ে গেছে এবং এখন তোমরা তাঁকে এ খবর দিতে যাচ্ছো যদি এ ব্যাপারই হয়ে থাকে তাহলে স্পষ্টভাবে নিজেদের এ ভূমিকার কথা স্বীকার করো। তারপর দুনিয়ায় কতজন নির্বোধ তোমাদের এ উদ্ভট মতবাদের অনুসারী থাকে তা আমিও দেখে নেবো।

তিন ঃ কিন্তু যদি এ দু'টি অবস্থার কোনটি সম্ভবপর না হয়ে থাকে তাহলে তৃতীয় যে অবস্থাটি থাকে সেটি হচ্ছে এই যে, কোন প্রকার যুক্তি প্রমাণ ছাড়াই তোমরা যাকে ইচ্ছা তাকেই আল্লাহর আত্মীয় মনে করে নাও, যাকে ইচ্ছা তাকেই পরম দাতা ও ফরিয়াদ শ্রবণকারী গণ্য করো এবং যার সম্পর্কে ইচ্ছা দাবী করে দাও যে, অমুক এলাকার রাজা অমুক সাহেব এবং অমুক কাজটি অমুক সাহেবের সাহায্য–সহায়তায় সম্পন্ন হয়।

৫৩. এ শিরককে প্রতারণা বলার একটি কারণ হচ্ছে এই যে, আসলে যেসব নক্ষত্র, ফেরেশতা, আত্মা বা মহামানবকে আল্লাহর গুণাবলী ও ক্ষমতার অধিকারী গণ্য করা হয়েছে

مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ ۖ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ۖ أُكُلُهَا دَائِمٌ وَظِلُّهَا ۚ تِلْكَ عُقْبَى الَّذِينَ اتَّقَوا ۖ وَّعُقْبَى الْكَافِرِينَ النَّارُ ﴿٣٥﴾ وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَفْرَحُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ ۖ وَمِنَ الْأَحْزَابِ مَن يُنكِرُ بَعْضَهُ ۚ قُلْ إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ وَلَا أُشْرِكَ بِهِ ۚ إِلَيْهِ أَدْعُو وَإِلَيْهِ مَآبِ ﴿٣٦﴾ وَكَذَٰلِكَ أَنزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا ۚ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُم بَعْدَمَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا وَاقٍ ﴿٣٧﴾

যারা আল্লাহকে ভয় করে তাদের জন্য যে জান্নাতের ওয়াদা করা হয়েছে তার অবস্থা হচ্ছে এই যে, তার পাদদেশে নদী প্রবাহিত হচ্ছে, তার ফলসমূহ চিরস্থায়ী এবং তার ছায়ার বিনাশ নেই।' এ হচ্ছে মুত্তাকীদের পরিণাম। অন্যদিকে সত্য অমান্যকারীদের পরিণাম হচ্ছে জাহান্নামের আগুন।

হে নবী! যাদেরকে আমি আগে কিতাব দিয়েছিলাম তারা তোমার প্রতি আমি যে কিতাব নাযিল করেছি তাতে আনন্দিত। আর বিভিন্ন দলে এমন কিছু লোক আছে যারা এর কোন কোন কথা মানে না। তুমি পরিষ্কার বলে দাও, "আমাকে তো শুধুমাত্র আল্লাহর বন্দেগী করার হুকুম দেয়া হয়েছে এবং তাঁর সাথে কাউকে শরীক করা থেকে নিষেধ করা হয়েছে। কাজেই আমি তাঁরই দিকে আহবান জানাচ্ছি এবং তাঁরই কাছে আমার প্রত্যাবর্তন।"[৫৫] এ হেদায়াতের সাথে আমি এ আরবী ফরমান তোমার প্রতি নাযিল করেছি। এখন তোমার কাছে যে জ্ঞান এসে গেছে তা সত্ত্বেও যদি তুমি লোকদের খেয়াল খুশীর তাবেদারী করো তাহলে আল্লাহর মোকাবিলায় তোমার কোন সহায়ও থাকবে না, আর কেউ তাঁর পাকড়াও থেকেও তোমাকে বাঁচাতে পারবে না।

এবং যাদেরকে আল্লাহর বিশেষ অধিকারে শরীক করা হয়েছে, তাদের কেউই কখনো এসব গুণ, অধিকার ও ক্ষমতার দাবী করেনি এবং কখনো লোকদেরকে এ শিক্ষা দেয়নি যে, তোমরা আমাদের সামনে পূজা-অর্চনার অনুষ্ঠানাদি পালন করো, আমরা তোমাদের আকাংখা পূর্ণ করে দেবো। কিছু ধূর্ত লোক সাধারণ মানুষের ওপর নিজেদের প্রভুত্বের দাপট

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً ۚ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ۗ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ ﴿٣٨﴾ يَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ ۖ وَعِندَهُ أُمُّ الْكِتَابِ ﴿٣٩﴾ وَإِن مَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ ﴿٤٠﴾

৬ রুকূ'

তোমার আগেও আমি অনেক রসূল পাঠিয়েছি এবং তাদেরকে স্ত্রী ও সন্তান সন্ততি দিয়েছি।[৫৬] আর আল্লাহর অনুমতি ছাড়া নিজেই কোন নিদর্শন এনে দেখাবার শক্তি কোন রসূলেরও ছিল না।[৫৭] প্রত্যেক যুগের জন্য একটি কিতাব রয়েছে। আল্লাহ যা চান নিশ্চিহ্ন করে দেন এবং যা চান কায়েম রাখেন। উম্মুল কিতাব তাঁর কাছেই আছে।[৫৮]

হে নবী! আমি এদেরকে যে অশুভ পরিণামের ভয় দেখাচ্ছি চাই তার কোন অংশ আমি তোমার জীবিতাবস্থায় তোমাকে দেখিয়ে দেই অথবা তা প্রকাশ হবার আগেই তোমাকে উঠিয়ে নিই—সর্বাবস্থায় তোমার কাজই হবে শুধুমাত্র পয়গাম পৌঁছিয়ে দেয়া আর হিসেব নেয়া হলো আমার কাজ।[৫৯]

চালাবার এবং তাদের উপার্জনে অংশ নেবার উদ্দেশ্যে কিছু বানোয়াট ইলাহ তৈরী করে নিয়েছে। লোকদেরকে তাদের ভক্তশ্রেণীতে পরিণত করেছে এবং নিজেদেরকে কোন না কোনভাবে তাদের প্রতিনিধি হিসেবে দাঁড় করিয়ে আপন আপন স্বার্থোদ্ধারের কাজ শুরু করে দিয়েছে।

শিরককে প্রতারণা বলার দ্বিতীয় কারণটি হচ্ছে এই যে, আসলে এটি একটি আত্মপ্রতারণা এবং এমন একটি গোপন দরজা যেখান দিয়ে মানুষ বৈষয়িক স্বার্থ-পূজা, নৈতিক বিধিনিষেধ থেকে বাঁচা এবং দায়িত্বহীন জীবন যাপন করার জন্য পলায়নের পথ বের করে।

তৃতীয় যে কারণটির ভিত্তিতে মুশরিকদের কর্মপদ্ধতিকে প্রতারণা বলা হয়েছে তা পরে আসছে।

৫৪. মানুষ যখন একটি জিনিসের মোকাবিলায় অন্য একটি জিনিস গ্রহণ করে তখন মানসিকভাবে নিজেকে নিশ্চিন্ত করার এবং নিজের নির্ভুলতা ও সঠিক পথ অবলম্বনের ব্যাপারে লোকদেরকে নিশ্চয়তা দান করার জন্য নিজের গৃহীত জিনিসকে সকল প্রকার যুক্তি-প্রমাণ পেশ করে সঠিক প্রমাণ করার চেষ্টা করে এবং নিজের প্রত্যাখ্যাত জিনিসটির বিরুদ্ধে সব রকম যুক্তি-প্রমাণ পেশ করতে থাকে। এটাই মানুষের প্রকৃতি। এ কারণে

বলা হয়েছে ঃ যখন তারা সত্যের আহবান মেনে নিতে অস্বীকার করেছে তখন প্রকৃতির আইন অনুযায়ী তাদের জন্য তাদের পথভ্রষ্টতাকে এবং এ পথভ্রষ্টতার ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকার জন্য তাদের প্রতারণাকে সুদৃশ্য ও সুসজ্জিত করে দেয়া হয়েছে এবং এ প্রাকৃতিক রীতি অনুযায়ী তাদের সত্য সঠিক পথে আসা থেকে বিরত রাখা হয়েছে।

৫৫. এ সময় বিরোধীদের পক্ষ থেকে যে একটি বিশেষ কথা বলা হচ্ছিল এটি তার জবাব। তারা বলতো, এ ব্যক্তি নিজের দাবী অনুযায়ী যদি সত্যিসত্যিই সেই একই শিক্ষা নিয়ে এসে থাকেন যা ইতিপূর্বেকার সকল নবী এনেছিলেন, তাহলে আগের নবীদের অনুসারী ইহুদী ও খৃষ্টানরা অগ্রবর্তী হয়ে এঁকে অভ্যর্থনা জানাচ্ছে না কেন? এর জবাবে বলা হচ্ছে, তাদের মধ্য থেকে কেউ এতে খুশী এবং কেউ অখুশী, কিন্তু হে নবী! কেউ খুশী হোক বা অখুশী, তুমি পরিষ্কার বলে দাও, আমাকে তো আল্লাহর পক্ষ থেকে এ শিক্ষা দান করা হয়েছে এবং আমি সর্বাবস্থায় এর অনুসারী থাকবো।

৫৬. নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিরুদ্ধে যেসব আপত্তি উত্থাপন করা হতো এটি তার মধ্য থেকে আর একটি আপত্তির জবাব। তারা বলতো, এ আবার কেমন নবী, যার স্ত্রী–সন্তানাদিও আছে! নবী–রসূলদের যৌন কামনার সাথে কোন সম্পর্ক থাকতে পারে না কি?

৫৭. এটিও একটি আপত্তির জবাব। বিরোধীরা বলতো, মূসা 'সূর্য করোজ্জ্বল হাত' ও 'লাঠি' এনেছিলেন, ঈসা মসীহ অন্ধদের দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে দিতেন এবং কুষ্ঠরোগীদেরকে রোগমুক্ত করতে পারতেন। সালেহ উটনীর নিদর্শন দেখিয়েছিলেন। তুমি কি নিদর্শন নিয়ে এসেছো? এর জবাবে বলা হয়েছে, যে নবী যে জিনিসই দেখিয়েছেন নিজের ক্ষমতা বা শক্তির জোরে দেখাননি। আল্লাহ যে সময় যার মাধ্যমে যে জিনিস প্রকাশ করা সংগত মনে করেছেন তা প্রকাশিত হয়েছে। এখন যদি আল্লাহ প্রয়োজন মনে করেন তাহলে যা তিনি চাইবেন দেখাবেন। নবী নিজে কখনো এমন খোদায়ী ক্ষমতার দাবী করেননি যার ভিত্তিতে তোমরা তাঁর কাছে নিদর্শন দেখাবার দাবী করতে পারো।

৫৮. এটিও বিরোধীদের একটি আপত্তির জবাব। তারা বলতো, ইতিপূর্বে যেসব কিতাব এসেছে সেগুলোর উপস্থিতিতে আবার নতুন কিতাবের কি প্রয়োজন ছিল? তুমি বলছো, সেগুলো বিকৃত হয়ে গেছে, এখন সেগুলো নাকচ করে দেয়া হয়েছে এবং তার পরিবর্তে এ নতুন কিতাবের অনুসারী হবার হুকুম দেয়া হয়েছে। কিন্তু আল্লাহর কিতাব কেমন করে বিকৃত হতে পারে? আল্লাহ তার হেফাজত করেননি কেন? আর আল্লাহর কিতাব কেমন করে নাকচ হতে পারে? তুমি বলছো, এটি সেই আল্লাহর কিতাব যিনি তাওরাত ও ইঞ্জীল নাযিল করেছিলেন। কিন্তু এ কি ব্যাপার, তোমার কোন কোন পদ্ধতি দেখছি তাওরাতের বিধানের বিরোধী? যেমন কোন কোন জিনিস তাওরাত হারাম ঘোষণা করেছে কিন্তু তুমি সেগুলো হালাল মনে করে খাও। এসব আপত্তির জবাব পরবর্তী সূরাগুলোয় বেশী বিস্তারিত আকারে দেয়া হয়েছে। এখানে এগুলোর একটি সংক্ষিপ্ত ও পূর্ণাংগ জবাব দিয়ে শেষ করে দেয়া হয়েছে।

"উম্মুল কিতাব" মানে আসল কিতাব অর্থাৎ এমন উৎসমূল যা থেকে সমস্ত আসমানী কিতাব উৎসারিত হয়েছে।

أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ نَنقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا ۚ وَاللَّهُ يَحْكُمُ لَا مُعَقِّبَ
لِحُكْمِهِ ۚ وَهُوَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ﴿٤١﴾ وَقَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلِلَّهِ الْمَكْرُ
جَمِيعًا ۖ يَعْلَمُ مَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ ۗ وَسَيَعْلَمُ الْكُفَّارُ لِمَنْ عُقْبَى
الدَّارِ ﴿٤٢﴾ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا ۚ قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا
بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ ﴿٤٣﴾

এরা কি দেখে না আমি এ ভূখণ্ডের ওপর এগিয়ে চলছি এবং এর গণ্ডী চতুরদিক থেকে সংকুচিত করে আনছি?[৬০] আল্লাহ রাজত্ব করছেন, তাঁর সিদ্ধান্ত পুনরবিবেচনা করার কেউ নেই এবং তাঁর হিসেব নিতে একটুও দেরী হয় না। এদের আগে যারা অতিক্রান্ত হয়েছে তারাও বড় বড় চক্রান্ত করেছিল[৬১] কিন্তু আসল সিদ্ধান্তকর কৌশল তো পুরোপুরি আল্লাহর হাতে রয়েছে। তিনি জানেন কে কি উপার্জন করছে এবং শীঘ্রই এ সত্য অস্বীকারকারীরা দেখে নেবে কার পরিণাম ভালো হয়।

এ অস্বীকারকারীরা বলে, তুমি আল্লাহর প্রেরিত নও। বলো, "আমার ও তোমাদের মধ্যে আল্লাহর সাক্ষ যথেষ্ট এবং তারপর আসমানী কিতাবের জ্ঞান রাখে এমন প্রত্যেক ব্যক্তির সাক্ষ।"[৬২]

৫৯. অর্থ হচ্ছে, যারা তোমার এ সত্যের দাওয়াতকে মিথ্যা বলেছে তাদের পরিণাম কি হয় এবং কবে তা প্রকাশ হয় তা চিন্তা করার প্রয়োজন তোমার নেই। তোমার ওপর যে কাজের দায়িত্ব দেয়া হয়েছে পূর্ণ একাগ্রতার সাথে তা পালন করে যেতে থাকো এবং ফায়সালা আমার হাতে ছেড়ে দাও। এখানে বাহ্যত নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সম্বোধন করা হলেও মূলত তাঁর বিরোধীদেরকে শুনানোই উদ্দেশ্য। তারা চ্যালেঞ্জের ভংগিতে বার বার তাঁকে বলতো, তুমি আমাদের যে বিপর্যয় ও ধ্বংসের হুমকি দিয়ে আসছো তা আসছে না কেন?

৬০. অর্থাৎ তোমার বিরোধীরা কি দেখছে না ইসলামের প্রভাব আরব ভূখণ্ডের সর্বত্র দিনের পর দিন ছড়িয়ে পড়ছে? চতুরদিক থেকে তার বেষ্টনী সংকীর্ণতর হয়ে আসছে? এটা এদের বিপর্যয়ের আলামত নয় তো আবার কি?

"আমি এ ভূখণ্ডে এগিয়ে চলছি"—আল্লাহর একথা বলার একটি সূক্ষ্ম তাৎপর্য রয়েছে। যেহেতু হকের দাওয়াত আল্লাহর পক্ষ থেকে হয় এবং এ দাওয়াত যারা পেশ করে আল্লাহ

তাদের সাথে থাকেন, তাই কোন দেশে এ দাওয়াত ছড়িয়ে পড়াকে আল্লাহ এভাবে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি নিজেই ঐ দেশে এগিয়ে চলছেন।

৬১. সত্যের কণ্ঠ রুদ্ধ করার জন্য মিথ্যা, প্রতারণা ও জুলুমের অস্ত্র ব্যবহার করা হচ্ছে, এটা আজ কোন নতুন কথা নয়। অতীতে বারবার এমনি ধরনের কৌশল অবলম্বন করে সত্যের দাওয়াতকে পরাস্ত করার প্রচেষ্টা চালানো হয়েছে।

৬২. অর্থাৎ আসমানী কিতাবের জ্ঞান রাখে এমন প্রত্যেক ব্যক্তি একথার সাক্ষ দেবে যে, যাকিছু আমি পেশ করছি তা ইতিপূর্বে আগত নবীগণের শিক্ষার পুনরাবৃত্তি ছাড়া আর কিছুই নয়।

ইব্‌রাহীম

১৪

নামকরণ

৩৫ নং আয়াতে উল্লেখিত وَاِذْ قَالَ اِبْرٰهِيْمُ رَبِّ اجْعَلْ هٰذَا الْبَلَدَ اٰمِنًا বাক্যাংশ থেকে এ সূরার নাম গৃহীত হয়েছে। এ নামকরণের মানে এ নয় যে, এ সূরায় হযরত ইব্‌রাহীমের জীবন বৃত্তান্ত বর্ণনা করা হয়েছে। বরং অধিকাংশ সূরার নামের মতো এখানেও আলামত হিসেবে এ নাম ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ এটি এমন একটি সূরা যেখানে ইব্‌রাহীম আলাইহিস সালামের কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

নাযিলের সময়-কাল

সূরাটির সাধারণ বর্ণনা পদ্ধতি মক্কার শেষ যুগের সূরাগুলোর মতো। তাই এটি সূরা রা'আদের নিকটবর্তী কালে অবতীর্ণ বলে মনে হয়। বিশেষ করে ১৩নং আয়াতের وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لِرُسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِنْ اَرْضِنَا اَوْ لَتَعُوْدُنَّ فِىْ مِلَّتِنَا (এবং অস্বীকারকারীরা নিজেদের রসূলদের বললো, তোমাদের ফিরে আসতে হবে আমাদের ধর্মীয় জাতিসত্তার মধ্যে, অন্যথায় আমরা তোমাদের বের করে দেবো আমাদের দেশ থেকে) শব্দাবলী থেকে পরিষ্কার ইংগিত পাওয়া যায় যে, সে সময় মক্কায় মুসলমানদের ওপর জুলুম–নিপীড়ন চরম পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছিল। মক্কাবাসীরা অতীতের কাফের জাতিগুলোর মতো তাদের দেশের মুমিন সমাজকে দেশ থেকে উৎখাত করার জন্য উঠে পড়ে লেগেছিল। এ জন্য অতীতে তাদের মতো যেসব জাতি একই কর্মনীতি অবলম্বন করেছিল তাদেরকে যে ধরনের হুমকি দেয়া হয়েছিল তাদেরকেও সেই একই হুমকি দেয়া হয়। অতীতের কাফের জাতিসমূহকে হুমকি দেয়া হয়েছিল, لَنُهْلِكَنَّ الظّٰلِمِيْنَ (আমি জালেমদেরকে ধ্বংস করে ছাড়বো)। অন্যদিকে মুমিনদেরকে তাদের পূর্ববর্তীদের মতো একই সান্ত্বনা দেয়া হয়। তাদেরকে বলা হয় ঃ لَنُسْكِنَنَّكُمُ الْاَرْضَ مِنْۢ بَعْدِهِمْ অর্থাৎ এ জালেমদেরকে খতম করার পর আমি এ ভূখণ্ডে তোমাদের বসতি স্থাপন করাবো।

এভাবে শেষ রুকূ'র আলোচ্য বিষয় থেকেও অনুমান করা যায় যে, এ সূরাটি মক্কার শেষ যুগের সাথে সম্পর্ক রাখে।

কেন্দ্রীয় বিষয়বস্তু ও মূল বক্তব্য

যারা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের রিসালাত মেনে নিতে অস্বীকার করছিল এবং তাঁর দাওয়াতকে ব্যর্থ করে দেবার জন্য সব রকমের নিকৃষ্টতম প্রতারণা ও চক্রান্ত

চালিয়ে যাচ্ছিল তাদের প্রতি উপদেশ ও সতর্কবাণী এ সূরার কেন্দ্রীয় বক্তব্য। কিন্তু উপদেশের তুলনায় এ সূরায় সতর্কীকরণ, তিরস্কার, হুমকি ও ভীতি প্রদর্শনের ভাবধারাই বেশী উচ্চকিত। এর কারণ, এর আগের সূরাগুলোতে বুঝাবার কাজটা পুরোপুরি এবং সুন্দরভাবে সম্পন্ন করা হয়েছে। এরপরও কুরাইশ কাফেরদের হঠকারিতা, হিংসা, বিদ্বেষ, প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি, অনিষ্টকর ক্রিয়াকর্ম ও জুলুম-নির্যাতন দিনের পর দিন বেড়ে যাচ্ছিল।

الٓرٰ قف كِتٰبٌ اَنْزَلْنٰهُ اِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ ۙ بِاِذْنِ رَبِّهِمْ اِلٰى صِرَاطِ الْعَزِيْزِ الْحَمِيْدِ ۝١ اللّٰهِ الَّذِيْ لَهٗ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ؕ وَوَيْلٌ لِّلْكٰفِرِيْنَ مِنْ عَذَابٍ شَدِيْدِ ۝٢ الَّذِيْنَ يَسْتَحِبُّوْنَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا عَلَى الْاٰخِرَةِ وَيَصُدُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَيَبْغُوْنَهَا عِوَجًا ؕ اُولٰٓئِكَ فِيْ ضَلٰلٍۭ بَعِيْدٍ ۝٣

আলিফ লাম্ র। হে মুহাম্মাদ। এটি একটি কিতাব, তোমার প্রতি এটি নাযিল করেছি, যাতে তুমি লোকদেরকে অন্ধকার থেকে বের করে আলোর মধ্যে নিয়ে আসো তাদের রবের প্রদত্ত সুযোগ ও সামর্থের ভিত্তিতে, এমন এক আল্লাহর পথে[১] যিনি প্রবল প্রতাপান্বিত ও আপন সত্তায় আপনি প্রশংসিত[২] এবং পৃথিবী ও আকাশের যাবতীয় বস্তুর মালিক।

আর কঠিন ধ্বংসকর শাস্তি রয়েছে তাদের জন্য যারা সত্য গ্রহণ করতে অস্বীকার করে, যারা দুনিয়ার জীবনকে আখেরাতের ওপর প্রাধান্য দেয়[৩] যারা লোকদেরকে আল্লাহর পথ থেকে রুখে দিচ্ছে এবং চাচ্ছে এ পথটি (তাদের আকাংখা অনুযায়ী) বাঁকা হয়ে যাক।[৪] ভ্রষ্টতায় এরা অনেক দূর এগিয়ে গেছে।

১. অন্ধকার থেকে বের করে আলোর মধ্যে আনার মানে হচ্ছে, শয়তানের পথ থেকে সরিয়ে আল্লাহর পথে নিয়ে আসা। অন্য কথায়, যে ব্যক্তি আল্লাহর পথে নেই সে আসলে অজ্ঞতা ও মূর্খতার অন্ধকারে বিভ্রান্তের মতো পথ হাতড়ে মরছে। সে নিজেকে যতই উন্নত চিন্তার অধিকারী এবং জ্ঞানের আলোকে যতই উদ্ভাসিত মনে করুক না কেন তাতে আসল অবস্থার কোন পরিবর্তন হয় না। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি আল্লাহর পথের সন্ধান পেয়েছে, গ্রামীণ এলাকার একজন অশিক্ষিত লোক হলেও সে আসলে জ্ঞানের আলোর রাজ্যে পৌঁছে গেছে।

তারপর এই যে, বলা হয়েছে "যাতে তুমি এদেরকে স্বীয় রবের প্রদত্ত সুযোগ ও সামর্থের ভিত্তিতে আল্লাহর পথে নিয়ে এসো" এ উক্তির মধ্যে আসলে এদিকে ইংগিত করা হয়েছে যে, কোন প্রচারক, তিনি নবী হলেও, সঠিক পথ দেখিয়ে দেয়া ছাড়া তিনি আর বেশী কিছু করতে পারেন না। কাউকে এ পথে নিয়ে আসার ক্ষমতা তাঁর নেই। এটা পুরোপুরি আল্লাহর দেয়া সুযোগ ও সামর্থের ওপর নির্ভর করে। আল্লাহ কাউকে সুযোগ দিলে সে হেদায়াত লাভ করতে পারে। নয়তো নবীর মতো সফল ও পূর্ণ শক্তিধর প্রচারকও নিজের সকল শক্তি নিয়োগ করেও তাকে হেদায়াত দান করতে পারেন না। আর আল্লাহর সুযোগ দান সম্পর্কে বলা যায়, এর একটি স্বতন্ত্র বিধান রয়েছে। কুরআনের বিভিন্ন জায়গায় এটি সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। এ থেকে পরিষ্কার জানা যায়, আল্লাহর পক্ষ থেকে হেদায়াত লাভের সুযোগ একমাত্র সেই ব্যক্তি পায় যে নিজেই হেদায়াতের প্রত্যাশী হয়, জিদ, হঠকারিতা ও হিংসা–বিদ্বেষমুক্ত থাকে, নিজের প্রবৃত্তি ও কামনা–বাসনার দাস হয় না, পরিষ্কার খোলা চোখে দেখে সজাগ ও সতর্ক কানে শোনে, মুক্ত সুস্থ ও পরিষ্কার মস্তিষ্কে চিন্তা করে এবং যুক্তিসংগত কথাকে কোন প্রকার পক্ষপাতিত্বের আশ্রয় না নিয়ে মেনে নেয়।

২. মূল আয়াতে বলা হয়েছে 'হামীদ'। হামীদ শব্দটি 'মাহমুদ' (প্রশংসিত)–এর সমার্থক হলেও উভয় শব্দের মধ্যে একটি সূক্ষ্ম পার্থক্য রয়েছে। কাউকে "মাহমুদ" তখনই বলা হবে যখন তার প্রশংসা করা হয়েছে বা হয়। কিন্তু "হামীদ" বললে বুঝা যাবে কেউ তার প্রশংসা করুক বা না করুক সে নিজেই প্রশংসার অধিকারী ও যোগ্য। এখানে প্রশংসিত, প্রশংসার যোগ্য ও প্রশংসা লাভের হকদার ইত্যাদি শব্দের মাধ্যমে এ শব্দটির পূর্ণ অর্থ প্রকাশ হয় না। তাই আমি এর অনুবাদ করেছি 'আপন সত্তায় আপনি প্রশংসিত' শব্দাবলীর মাধ্যমে।

৩. অথবা অন্য কথায় যারা শুধুমাত্র দুনিয়ার স্বার্থ ও লাভের কথাই চিন্তা করে, আখেরাতের কোন পরোয়া করে না। যারা বৈষয়িক লাভ, স্বাদ ও আরাম–আয়েশের বিনিময়ে আখেরাতের ক্ষতি কিনে নিতে পারে কিন্তু আখেরাতের সাফল্য ও সমৃদ্ধির বিনিময়ে দুনিয়ার কোন ক্ষতি, কষ্ট ও বিপদ এমনকি কোন স্বাদ থেকে বঞ্চিত হওয়াও বরদাশত করতে পারে না। যারা দুনিয়া ও আখেরাত উভয়ের পর্যালোচনা করে ধীর ও সুস্থ মস্তিষ্কে দুনিয়াকে বেছে নিয়েছে এবং আখেরাতের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে, তার স্বার্থ যেসব ক্ষেত্রে দুনিয়ার স্বার্থের সাথে সংঘর্ষশীল হবে সেসব ক্ষেত্রে তাকে ত্যাগ করে যেতে থাকবে।

৪. অর্থাৎ তারা আল্লাহর ইচ্ছার অনুগত হয়ে থাকতে চায় না। বরং আল্লাহর দীনকে নিজেদের ইচ্ছার অনুগত করে রাখতে চায়। নিজেদের প্রত্যেকটি ভাবনা–চিন্তা, মতবাদ ও ধারণা–অনুমানকে তারা নিজেদের আকীদা–বিশ্বাসের অন্তরভুক্ত করে এবং এমন কোন আকীদাকে নিজেদের চিন্তারাজ্যে অবস্থান করতে দেয় না যা তাদের ভাবনার সাথে খাপ খায় না। তারা চায় আল্লাহর দীন তাদের অনুসৃত প্রত্যেকটি রীতি–নীতি, আচার–আচরণ ও অভ্যাসকে বৈধতার ছাড়পত্র দিক এবং তাদের কাছে এমন কোন পদ্ধতির অনুসরণের দাবী না জানাক যা তারা পছন্দ করে না। এরা নিজেদের প্রবৃত্তি ও শয়তানের অনুসরণে যেদিকে মুখ ফিরায়, আল্লাহর দীনও যেন এদের গোলাম হয়ে ঠিক সেদিকেই মুখ ফিরায়।

وَمَآ اَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُوْلٍ اِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهٖ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ ؕ فَيُضِلُّ اللّٰهُ
مَنْ يَّشَآءُ وَيَهْدِيْ مَنْ يَّشَآءُ ؕ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ④ وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا
مُوْسٰى بِاٰيٰتِنَآ اَنْ اَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ ۙ وَذَكِّرْهُمْ
بِاَيّٰىمِ اللّٰهِ ؕ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُوْرٍ ⑤ وَاِذْ قَالَ
مُوْسٰى لِقَوْمِهِ اذْكُرُوْا نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ اِذْ اَنْجٰىكُمْ مِّنْ اٰلِ
فِرْعَوْنَ يَسُوْمُوْنَكُمْ سُوْٓءَ الْعَذَابِ وَيُذَبِّحُوْنَ اَبْنَآءَكُمْ وَيَسْتَحْيُوْنَ
نِسَآءَكُمْ ؕ وَفِيْ ذٰلِكُمْ بَلَآءٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ عَظِيْمٌ ۠

আমি নিজের বাণী পৌঁছাবার জন্য যখনই কোন রসূল পাঠিয়েছি, সে তার নিজের সম্প্রদায়েরই ভাষায় বাণী পৌঁছিয়েছে, যাতে সে তাদেরকে খুব ভালো করে পরিষ্কারভাবে বুঝাতে পারে।[৫] তারপর আল্লাহ যাকে চান তাকে পথভ্রষ্ট করেন এবং যাকে চান হেদায়াত দান করেন।[৬] তিনি প্রবল পরাক্রান্ত ও জ্ঞানী।[৭]

আমি এর আগে মূসাকেও নিজের নিদর্শনাবলী সহকারে পাঠিয়েছিলাম। তাকেও আমি হুকুম দিয়েছিলাম, নিজের সম্প্রদায়কে অন্ধকার থেকে বের করে আলোকের মধ্যে নিয়ে এসো এবং তাদেরকে ইতিহাসের[৮] শিক্ষণীয় ঘটনাবলী শুনিয়ে উপদেশ দাও। এ ঘটনাবলীর মধ্যে বিরাট নিদর্শন[৯] রয়েছে এমন প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য যে সবর করে ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে।[১০]

স্মরণ করো যখন মূসা তার সম্প্রদায়কে বললো, "আল্লাহর সেই অনুগ্রহের কথা স্মরণ করো যা তিনি তোমাদের প্রতি করেছেন। তিনি তোমাদের ফিরাউনী সম্প্রদায়ের কবল থেকে মুক্ত করেছেন, যারা তোমাদের ওপর ভয়াবহ নির্যাতন চালাতো, তোমাদের ছেলেদের হত্যা করতো এবং তোমাদের মেয়েদের জীবিত রাখতো। এর মধ্যে তোমাদের রবের পক্ষ থেকে তোমাদের জন্য মহা পরীক্ষা ছিল।

সে যেন কোথাও এদেরকে বাধা না দেয় বা সমালোচনা না করে এবং কোথাও এদেরকে নিজের পথের দিকে ফিরিয়ে নেবার চেষ্টা না করে। আল্লাহ তাদের কাছে এ ধরনের দীন পাঠালেই তারা তা মানতে প্রস্তুত।

৫. এর দু'টি অর্থ হয় ঃ এক, আল্লাহ যে সম্প্রদায়ের মধ্যে যে নবী পাঠিয়েছেন তার ওপর তার ভাষায়ই নিজের বাণী অবতীর্ণ করেছেন। এর উদ্দেশ্য ছিল, সংশ্লিষ্ট সম্প্রদায় যেন তা ভালোভাবে বুঝতে পারে এবং পরবর্তী পর্যায়ে তারা এ ধরনের কোন ওজর পেশ করতে না পারে যে, আপনার পাঠানো শিক্ষা তো আমরা বুঝতে পারিনি কাজেই কেমন করে তার প্রতি ঈমান আনতে পারতাম। দুই, আল্লাহ কখনো নিছক অলৌকিক ক্ষমতা দেখাবার জন্য আরব দেশে নবী পাঠিয়ে তাদের মুখ দিয়ে জাপানী বা চৈনিক ভাষায় নিজের কালাম শুনাননি। এ ধরনের তেলেসমাতি দেখিয়ে লোকদের অভিনবত্ব প্রিয়তাকে পরিতৃপ্ত করার তুলনায় আল্লাহর দৃষ্টিতে শিক্ষা ও উপদেশ দান এবং বুঝিয়ে বলা ও সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করাই বেশী গুরুত্বের অধিকারী। এ উদ্দেশ্যে কোন জাতিকে তার নিজের ভাষায়, যে ভাষা সে বোঝে, পয়গাম পৌছানো প্রয়োজন।

৬. অর্থাৎ সমগ্র জাতি যে ভাষা বোঝে নবী সে ভাষায় তার সমগ্র প্রচার কার্য পরিচালনা ও উপদেশ দান করা সত্ত্বেও সবাই হেদায়াত লাভ করে না। কারণ কোন বাণী কেবলমাত্র সহজবোধ্য হলেই যে, সকল শ্রোতা তা মেনে নেবে এমন কোন কথা নেই। সঠিক পথের সন্ধান লাভ ও পথভ্রষ্ট হওয়ার মূল সূত্র রয়েছে আল্লাহর হাতে। তিনি যাকে চান নিজের বাণীর সাহায্যে সঠিক পথে পরিচালিত করেন এবং যার জন্য চান এ একই বাণীকে তার জন্য পথভ্রষ্টতার উপকরণে পরিণত করেন।

৭. অর্থাৎ লোকেরা নিজে নিজেই সৎপথ লাভ করবে বা পথভ্রষ্ট হয়ে যাবে, এটা সম্ভব নয়। কারণ তারা পুরোপুরি স্বাধীন নয়। বরং আল্লাহর কর্তৃত্বের অধীন। কিন্তু আল্লাহ নিজের এ কর্তৃত্বকে অন্ধের মতো প্রয়োগ করেন না। কোন যুক্তিসংগত কারণ ছাড়াই তিনি যাকে ইচ্ছা হেদায়াত দান করবেন এবং যাকে ইচ্ছা অযথা পথভ্রষ্ট করবেন এটা তাঁর রীতি নয়। কর্তৃত্বশীল ও বিজয়ী হওয়ার সাথে সাথে তিনি জ্ঞানী এবং প্রাজ্ঞও। তাঁর কাছ থেকে কোন ব্যক্তি যুক্তিসংগত কারণেই হেদায়াত লাভ করে। আর যে ব্যক্তিকে সঠিক পথ থেকে বঞ্চিত করে ভ্রষ্টতার মধ্যে ছেড়ে দেয়া হয় সে নিজেই নিজের ভ্রষ্টতাপ্রীতির কারণে এহেন আচরণলাভের অধিকারী হয়।

৮. আরবী ভাষায় পারিভাষিক অর্থে ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর স্মারককে "আইয়াম" বলা হয়। "আইয়ামুল্লাহ" বলতে মানুষের ইতিহাসের এমন সব গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় বুঝায় যেখানে আল্লাহ অতীতের জাতিসমূহ ও বড় বড় ব্যক্তিত্বকে তাদের কর্মকাণ্ড অনুযায়ী শাস্তি বা পুরস্কার দিয়েছেন।

৯. অর্থাৎ এসব ঐতিহাসিক ঘটনার মধ্যে এমন সব নিদর্শন রয়েছে যার মাধ্যমে এক ব্যক্তি আল্লাহর একত্বের সত্যতা ও নির্ভুলতার প্রমাণ পেতে পারে। এ সংগে এ সত্যের পক্ষেও অসংখ্য সাক্ষ-প্রমাণ সংগ্রহ করতে পারে যে, প্রতিদানের বিধান একটি বিশ্বজনীন আইন, তা পুরোপুরি হক ও বাতিলের তাত্ত্বিক ও নৈতিক পার্থক্যের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত এবং তার দাবী পূরণ করার জন্য অন্য একটি জগত অর্থাৎ পরকালীন জগত অপরিহার্য। তাছাড়া এ ঘটনাবলীর মধ্যে এমনসব নিদর্শনও রয়েছে যার সাহায্যে কোন ব্যক্তি বাতিল বিশ্বাস ও মতবাদের ভিত্তিতে জীবনের ইমারত তৈরী করার অশুভ পরিণামের সন্ধান লাভ করতে এবং তা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে।

وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ ۖ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ ۝ وَقَالَ مُوسَىٰ إِن تَكْفُرُوا أَنتُمْ وَمَن فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا فَإِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ حَمِيدٌ ۝ أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَأُ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ ۛ وَالَّذِينَ مِن بَعْدِهِمْ ۛ لَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا اللَّهُ ۚ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَرَدُّوا أَيْدِيَهُمْ فِي أَفْوَاهِهِمْ وَقَالُوا إِنَّا كَفَرْنَا بِمَا أُرْسِلْتُم بِهِ وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ ۝

২ রুকূ'

আর স্মরণ করো, তোমাদের রব এই বলে সতর্ক করে দিয়েছিলেন যে, যদি কৃতজ্ঞ থাকো[১১] তাহলে আমি তোমাদের আরো বেশী দেবো আর যদি নিয়ামতের প্রতি অকৃতজ্ঞ হও তাহলে আমার শাস্তি বড়ই কঠিন।[১২] আর মূসা বললো, "যদি তোমরা কুফরী করো এবং পৃথিবীর সমস্ত অধিবাসীও কাফের হয়ে যায় তাহলে আল্লাহর কিছুই আসে যায় না এবং তিনি আপন সত্তায় আপনি প্রশংসিত।[১৩]

তোমাদের কাছে কি[১৪] তোমাদের পূর্বে অতিক্রান্ত জাতিগুলোর বৃত্তান্ত পৌঁছেনি? নূহের জাতি, আদ, সামূদ এবং তাদের পরে আগমনকারী বহু জাতি, যাদের সংখ্যা একমাত্র আল্লাহ জানেন? তাদের রসূলরা যখন তাদের কাছে দ্ব্যর্থহীন কথা ও সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলী নিয়ে আসেন তখন তারা নিজেদের মুখে হাত চাপা দেয়[১৫] এবং বলে, "যে বার্তা সহকারে তোমাদের পাঠানো হয়েছে আমরা তা মানি না এবং তোমরা আমাদের যে জিনিসের দাওয়াত দিচ্ছো তার ব্যাপারে আমরা যুগপৎ উদ্বেগ ও সংশয়ের মধ্যে আছি।[১৬]

১০. অর্থাৎ এ নিদর্শনসমূহ তো যথাস্থানে আছে। কিন্তু একমাত্র তারাই এ থেকে লাভবান হতে পারে যারা আল্লাহর পরীক্ষায় ধৈর্য ও অবিচলতার সাথে এগিয়ে চলে এবং আল্লাহর নিয়ামতসমূহকে যথাযথভাবে অনুভব করে তাদের জন্য যথার্থ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে। নীচমনা, সংকীর্ণচেতা ও কৃতঘ্ন স্বভাবের লোকেরা যদি এ নিদর্শনগুলো উপলব্ধি করেও তাহলে তাদের এ নৈতিক দুর্বলতা তাদেরকে সেই উপলব্ধি দ্বারা লাভবান হতে দেয় না।

১১. অর্থাৎ যদি আমার নিয়ামতসমূহের অধিকার ও মর্যাদা চিহ্নিত করে সেগুলোকে সঠিকভাবে ব্যবহার করো, আমার বিধানের মোকাবিলায় অহংকারে মত্ত হতে ও বিদ্রোহ করতে উদ্বুদ্ধ না হও এবং আমার অনুগ্রহের অবদান স্বীকার করে নিয়ে আমার বিধানের অনুগত থাকো।

১২. এ বিষয়বস্তু সম্বলিত ভাষণ বাইবেলের 'দ্বিতীয় বিবরণ' পুস্তকে বিস্তারিতভাবে উদ্ধৃত হয়েছে। এ ভাষণে হযরত মূসা (আ) তাঁর ইন্তিকালের কয়েকদিন আগে বনী ইসরাঈলকে তাদের ইতিহাসের সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। তারপর মহান আল্লাহ তাঁর মাধ্যমে বনী ইসরাঈলের নিকট তাওরাতের যেসব বিধান পাঠিয়েছিলেন তিনি সেগুলোরও পুনরাবৃত্তি করেছেন। এরপর একটি সুদীর্ঘ ভাষণ দিয়েছেন। এ ভাষণে তিনি বলেছেন, যদি তারা তাদের রবের হুকুম মেনে চলে তাহলে তাদেরকে কিভাবে পুরস্কৃত করা হবে আর যদি নাফরমানির পথ অবলম্বন করে তাহলে কেমন কঠোর শাস্তি দেয়া হবে। এ ভাষণটি দ্বিতীয় বিবরণের ৪, ৬, ৮, ১০, ১১ ও ২৮ থেকে ৩০ অধ্যায় পর্যন্ত ছড়িয়ে রয়েছে। এর কোন কোন স্থান অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী ও শিক্ষণীয়। উদাহরণ স্বরূপ এর কিছু অংশ এখানে উদ্ধৃত করছি। এ থেকে সমগ্র ভাষণটির ব্যাপারে একটা ধারণা করা যাবে।

> "হে ইসরায়েল শুন ; আমাদের সদাপ্রভু একই সদাপ্রভু ; আর তুমি তোমার সমস্ত হৃদয়, তোমার সমস্ত প্রাণ, ও তোমার সমস্ত শক্তি দিয়া আপন সদাপ্রভুকে প্রেম করিবে। আর এই যে সকল কথা আমি অদ্য তোমাকে আজ্ঞা করি, তাহা তোমার হৃদয়ে থাকুক। আর তোমরা প্রত্যেকে আপন আপন সন্তানগণকে এ সকল যত্নপূর্বক শিক্ষা দিবে এবং গৃহে বসিবার কিম্বা পথে চলিবার সময়ে এবং শয়ন কিংবা গাত্রোত্থানকালে ঐ সমস্তের বিষয়ে কথোপকথন করিবে।" (২:৪-৭)

> "এখন হে ঈসরায়েল, তোমার সদাপ্রভু তোমার কাছে কি চাহেন? কেবল এই, যেন তুমি আপন সদাপ্রভূকে ভয় করো, তাঁহার সকল পথে চল ও তাঁহাকে প্রেম কর এবং তোমার সমস্ত হৃদয় ও তোমার সমস্ত প্রাণের সহিত তোমার সদাপ্রভুর সেবা কর, অদ্য আমি তোমার মংগলার্থে সদাপ্রভুর যে যে আজ্ঞা ও বিধি তোমাকে দিতেছি, সেই সকল যেন পালন কর। দেখ স্বর্গ এবং পৃথিবী ও তন্মধ্যস্থ যাবতীয় বস্তু তোমার সদাপ্রভুর।" (১০:১২-১৪)

> "আমি তোমাকে অদ্য যে সকল আজ্ঞা আদেশ করিতেছি, যত্নপূর্বক সেই সকল পালন করিবার জন্য যদি তুমি আপন সদাপ্রভুর রবে মনোযোগ সহকারে কর্ণপাত কর, তবে তোমার সদাপ্রভু পৃথিবীস্থ সমস্ত জাতির উপরে তোমাকে উন্নত করিবেন; আর তোমার সদাপ্রভুর রবে কর্ণপাত করিলে এ সকল আশীর্বাদ তোমার উপর বর্তিবে ও তোমাকে আশ্রয় করিবে। তুমি নগরে আশীর্বাদযুক্ত হইবে ও ক্ষেত্রে আশীর্বাদযুক্ত হইবে।..........তোমার যে শত্রুগণ তোমার ওপর আক্রমণ চালায় তাহাদিগকে সদাপ্রভু তোমার সম্মুখে আঘাত করাইবেন......... সদাপ্রভু আজ্ঞা করিয়া তোমার গোলাঘর সম্বন্ধে ও তুমি যে কোন কার্যে হস্তক্ষেপ কর তৎসম্বন্ধে আশীর্বাদকে তোমার সহচর করিবেন;..........সদাপ্রভু আপন দিব্যানুসারে তোমাকে আপন পবিত্র

প্রজ্ঞা বলিয়া স্থাপন করিবেন ; কেবল তোমার সদাপ্রভুর আজ্ঞা পালন ও তাহার পথে গমন করিতে হইবে। আর পৃথিবীর সমস্ত জাতি দেখিতে পাইবে যে, তোমার উপরে সদা প্রভুর নাম কীর্তিত হইয়াছে এবং তাহারা তোমা হইতে ভীত হইবে।.......এবং তুমি অনেক জাতিকে ঋণ দিবে, কিন্তু আপনি ঋণ লইবে না। আর সদাপ্রভু তোমাকে মস্তক স্বরূপ করিবেন, পুচ্ছ স্বরূপ করিবেন না; তুমি অবনত না হইয়া কেবল উন্নত হইবে।" (২৮ঃ১-১৩)

"কিন্তু যদি তুমি আপন ঈশ্বর সদাপ্রভুর রবে কর্ণপাত না কর, আমি অদ্য তোমাকে যে সকল আজ্ঞা ও বিধি আদেশ করিতেছি, যত্নপূর্বক সেই সকল পালন না কর, তবে এ সমস্ত অভিশাপ তোমার প্রতি বর্তিবে ও তোমাকে আশ্রয় করিবে। তুমি নগরে শাপগ্রস্ত হইবে ও ক্ষেত্রে শাপগ্রস্ত হইবে।....... .... যে কোন কার্যে তুমি হস্তক্ষেপ কর, সেই কার্যে সদাপ্রভু তোমার উপর অভিশাপ, উদ্বেগ ও ভর্ৎসনা প্রেরণ করিবেন। ....তুমি যে দেশ অধিকার করিতে যাইতেছ, সেই দেশ হইতে যাবৎ উচ্ছিন্ন না হও, তাবৎ সদাপ্রভু তোমাকে মহামারীর আশ্রয় করিবেন।...................তোমার মস্তকের উপরিস্থিত আকাশ পিত্তল ও নিম্নস্থিত ভূমি লৌহস্বরূপ হইবে।..........সদাপ্রভু তোমার শত্রুদের সম্মুখে তোমাকে পরাজিত করাইবেন; তুমি একপথ দিয়া তাহাদের বিরুদ্ধে যাইবে, কিন্তু সাত পথ দিয়া তাহাদের সম্মুখ হইতে পলায়ন করিবে।....... তোমার সাথে কন্যার বিবাহ হইবে, কিন্তু অন্য পুরুষ তাহার সহিত সংগম করিবে। তুমি গৃহ নির্মাণ করিবে, কিন্তু তাহাতে বাস করিতে পাইবে না; দ্রাক্ষাক্ষেত্র প্রস্তুত করিবে, কিন্তু তাহার ফল ভোগ করিবে না। তোমার গরু তোমার সম্মুখে জবাই হইবে, ...সদাপ্রভু তোমার বিরুদ্ধে যে শত্রুগণকে পাঠাইবেন, তুমি ক্ষুধায়, তৃষ্ণায়, উলংগতায় ও সকল বিষয়ের অভাব ভোগ করিতে করিতে তাহাদের দাসত্ব করিবে ; এবং যে পর্যন্ত তিনি তোমার বিনাশ না করেন, সে পর্যন্ত শত্রুরা তোমার গ্রীবাতে লৌহের জোয়াল দিয়া রাখিবে।.......................আর সদাপ্রভু তোমাকে পৃথবীর এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত সমগ্র জাতির মধ্যে ছিন্ন ভিন্ন করিবেন।" (২৮ঃ১৫-১৬)

১৩. এখানে হযরত মূসা (আ) ও তাঁর জাতির ইতিহাসের প্রতি এ সংক্ষিপ্ত ইংগিত করার একটি বিশেষ উদ্দেশ্য রয়েছে। তা হচ্ছে, মক্কাবাসীদেরকে একথা জানানো যে, আল্লাহ যখন কোন জাতির প্রতি অনুগ্রহ করেন এবং এর জবাবে সংশ্লিষ্ট জাতি বিশ্বাসঘাতকতা ও বিদ্রোহ করে তখন এ ধরনের জাতির এমন মারাত্মক ও ভয়াবহ পরিণামের সম্মুখীন হতে হয় যার সম্মুখীন আজ তোমাদের চোখের সামনে বনী ইসরাঈলরা হচ্ছে। কাজেই তোমরাও কি আল্লাহর নিয়ামত ও তাঁর অনুগ্রহের জওয়াবে অকৃতজ্ঞ মনোভাব প্রদর্শন করে নিজেদের এ একই পরিণাম দেখতে চাও?

এ প্রসংগে একথাও মনে রাখতে হবে যে, আল্লাহ তাঁর যে নিয়ামতের কদর করার জন্য এখানে কুরাইশদের কাছে দাবী জানাচ্ছেন তা বিশেষভাবে তাঁর এ নিয়ামতটি যে, তিনি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে তাদের মধ্যে পয়দা করেছেন এবং তাঁর মাধ্যমেই তাদের কাছে এমন মহিমান্বিত শিক্ষা পাঠিয়েছেন যে সম্পর্কে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বারবার কুরাইশদেরকে বলতেন–

قَالَتْ رُسُلُهُمْ اَفِي اللّٰهِ شَكٌّ فَاطِرِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ يَدْعُوْكُمْ لِيَغْفِرَ لَكُمْ مِّنْ ذُنُوْبِكُمْ وَيُؤَخِّرَكُمْ اِلٰٓى اَجَلٍ مُّسَمًّى ؕ قَالُوْٓا اِنْ اَنْتُمْ اِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا ؕ تُرِيْدُوْنَ اَنْ تَصُدُّوْنَا عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ اٰبَآؤُنَا فَاْتُوْنَا بِسُلْطٰنٍ مُّبِيْنٍ ۝١٠ قَالَتْ لَهُمْ رُسُلُهُمْ اِنْ نَّحْنُ اِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ يَمُنُّ عَلٰى مَنْ يَّشَآءُ مِنْ عِبَادِهٖ ؕ وَمَا كَانَ لَنَآ اَنْ نَّاْتِيَكُمْ بِسُلْطٰنٍ اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِ ؕ وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُوْنَ ۝١١ وَمَا لَنَآ اَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللّٰهِ وَقَدْ هَدٰىنَا سُبُلَنَا ؕ وَلَنَصْبِرَنَّ عَلٰى مَآ اٰذَيْتُمُوْنَا ؕ وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُوْنَ ۝١٢

তাদের রসূলরা বলে, "আল্লাহর ব্যাপারে কি সন্দেহ আছে, যিনি আকাশ ও পৃথিবীর স্রষ্টা?[১৭] তিনি তোমাদের ডাকছেন তোমাদের গুনাহ মাফ করার এবং একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত তোমাদের অবকাশ দেয়ার জন্য।[১৮] তারা জবাব দেয়, "তোমরা আমাদের মতো মানুষ ছাড়া আর কিছুই নও।[১৯] বাপ–দাদাদের থেকে যাদের ইবাদাত চলে আসছে তোমরা তাদের ইবাদাত থেকে আমাদের ফেরাতে চাও। ঠিক আছে তাহলে আনো কোন সুস্পষ্ট প্রমাণ।[২০] তাদের রসূলরা তাদেরকে বলে, "যথার্থই আমরা তোমাদের মতো মানুষ ছাড়া আর কিছুই নই। কিন্তু আল্লাহ তাঁর বান্দাদের মধ্য থেকে যাকে ইচ্ছা অনুগ্রহ করেন।[২১] আর তোমাদের কোন প্রমাণ এনে দেবো, এ ক্ষমতা আমাদের নেই। প্রমাণ তো আল্লাহরই অনুমতিক্রমে আসতে পারে এবং ঈমানদারদের আল্লাহরই ওপর ভরসা রাখা উচিত। আর আমরা আল্লাহরই ওপর ভরসা করবো না কেন, যখন আমাদের জীবনের পথে তিনি আমাদের পথ দেখিয়েছেন? তোমরা আমাদের যে যন্ত্রণা দিচ্ছো তার ওপর আমরা সবর করবো এবং ভরসাকারীদের ভরসা আল্লাহরই ওপর হওয়া উচিত।"

كَلِمَةٌ وَّاحِدَةٌ تُعْطُوْنِيْهَا تَمْلِكُوْنَ بِهَا الْعَرَبَ وَتَدِيْنُ لَكُمُ الْعَجَمُ –

"আমার একটি মাত্র কথা মেনে নাও। আরব ও আজম সব তোমাদের করতলগত হয়ে যাবে।"

১৪. হযরত মূসার (আ) ভাষণ ওপরে শেষ হয়ে গেছে। এখন সরাসরি মক্কার কাফেরদেরকে সম্বোধন করা হচ্ছে।

১৫. এ শব্দগুলোর ব্যাখ্যার ব্যাপারে তাফসীরকারদের মধ্যে বেশ কিছু মতবিরোধ দেখা গেছে। বিভিন্ন জন বিভিন্ন অর্থ বর্ণনা করেছেন। আমাদের মতে এর সবচেয়ে নিকটবর্তী অর্থ তাই হতে পারে যা প্রকাশ করার জন্য আমরা বলে থাকি, 'কানে হাত চাপা দিয়েছে' বা 'মুখে হাত চাপা দিয়েছে।' কারণ পরবর্তী বাক্যের বক্তব্যের মধ্যে পরিষ্কার অস্বীকৃতি ও এ সাথে হতবাক হয়ে যাওয়ার ভাব প্রকাশ পেয়েছে এবং এর মধ্যে কিছু ক্রোধের ভাবধারাও মিশে আছে।

১৬. অর্থাৎ এমন সংশয় যার ফলে প্রশান্তি বিদায় নিয়েছে। সত্যের দাওয়াতের বৈশিষ্ট হচ্ছে এই যে, এ দাওয়াত যখন শুরু হয় তখন তার কারণে চতুরদিকে অবশ্যি একটা ব্যাকুলতা, হৈ চৈ ও চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়ে যায় ঠিকই এবং অস্বীকার ও বিরোধিতাকারীরাও ঠাণ্ডা মাথায় চিন্তা–ভাবনা করে পূর্ণ প্রশান্তির সাথে তা অস্বীকার বা তার বিরোধিতা করতে পারে না। তারা যত প্রবলভাবেই তাকে প্রত্যাখ্যান করুক এবং যতই শক্তি প্রয়োগ করে তার বিরোধিতা করুক না কেন দাওয়াতের সত্যতা, তার ন্যায়–সংগত যুক্তিসমূহ, তার সুস্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীন কথা, তার মনোমুগ্ধ কর ভাষা, তার আহবায়কের নিখুঁত চরিত্র, তার প্রতি বিশ্বাসীদের জীবনধারায় সূচিত সুস্পষ্ট বিপ্লব এবং তাদের নিজেদের সত্য কথা অনুযায়ী পরিচ্ছন্ন কার্যাবলী—এসব জিনিস মিলেমিশে অতীব কট্টর বিরোধীর মনেও এক অস্থিরতার তরংগ সৃষ্টি করে দেয়। সত্যের আহবায়কদেরকে যারা অস্থির ও ব্যাকুল করে দেয় তারা নিজেরাও স্থিরতা ও মানসিক প্রশান্তি থেকে বঞ্চিত হয়।

১৭. রসূলদের একথা বলার কারণ হচ্ছে এই যে, প্রত্যেক যুগের মুশরিকরা আল্লাহর অস্তিত্ব মানতো এবং আল্লাহ পৃথিবী ও আকাশের স্রষ্টা একথাও স্বীকার করতো। এরি ভিত্তিতে রসূলগণ বলেছেন, এরপর তোমাদের সন্দেহ থাকে কিসে? আমরা যে জিনিসের দিকে তোমাদের দাওয়াত দিচ্ছি তা এ ছাড়া আর কিছুই নয় যে, পৃথিবী ও আকাশের স্রষ্টা আল্লাহ তোমাদের বন্দেগীলাভের যথার্থ হকদার। এরপরও কি আল্লাহর ব্যাপারে তোমাদের সন্দেহ আছে?

১৮. নির্দিষ্ট সময় মানে ব্যক্তির মৃত্যুকালও হতে পারে আবার কিয়ামতও হতে পারে। জাতিসমূহের উত্থান ও পতনের ব্যাপারে বলা যেতে পারে, আল্লাহর কাছে তাদের উত্থান–পতনের সময়–কাল নির্দিষ্ট হওয়ার বিষয়টি তাদের গুণগত অবস্থার ওপর নির্ভরশীল। একটি ভালো জাতি যদি তাদের কর্মকাণ্ডের মধ্যে বিকৃতির সৃষ্টি করে তাহলে তার কর্মের অবকাশ কমিয়ে দেয়া হয় এবং তাকে ধ্বংস করে ফেলা হয়। আর একটি ভ্রষ্ট জাতি যদি নিজেদের অসৎগুণাবলীকে শুধরে নিয়ে সৎগুণাবলীতে পরিবর্তিত করে তাহলে তার কর্মের অবকাশ বাড়িয়ে দেয়া হয়। এমনকি তা কিয়ামত পর্যন্তও দীর্ঘায়িত হতে পারে। এ বিষয়বস্তুর দিকেই সূরা রা'আদের ১১ আয়াতে ইংগিত করে। আল্লাহ বলেছেন, আল্লাহ কোন জাতির অবস্থার ততক্ষণ পরিবর্তন ঘটান না যতক্ষণ না সে নিজের গুণাবলীর পরিবর্তন করে।

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُم مِّنْ أَرْضِنَا
أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا ۖ فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ ﴿١٣﴾
وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِن بَعْدِهِمْ ۚ ذَٰلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي
وَخَافَ وَعِيدِ ﴿١٤﴾ وَاسْتَفْتَحُوا وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ ﴿١٥﴾ مِّن
وَرَائِهِ جَهَنَّمُ وَيُسْقَىٰ مِن مَّاءٍ صَدِيدٍ ﴿١٦﴾ يَتَجَرَّعُهُ وَلَا يَكَادُ يُسِيغُهُ
وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِن كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ ۖ وَمِن وَرَائِهِ عَذَابٌ
غَلِيظٌ ﴿١٧﴾

৩ রুকূ'

শেষ পর্যন্ত অস্বীকারকারীরা তাদের রসূলদের বলে দিল, "হয় তোমাদের ফিরে আসতে হবে আমাদের মিল্লাতে[২২] আর নয়তো আমরা তোমাদের বের করে দেবো আমাদের দেশ থেকে।" তখন তাদের রব তাদের কাছে অহী পাঠালেন, "আমি এ জালেমদের ধ্বংস করে দেবো এবং এদের পর পৃথিবীতে তোমাদের প্রতিষ্ঠিত করবো।[২৩] এটা হচ্ছে তার পুরস্কার, যে আমার সামনে জবাবদিহি করার ভয় করে এবং আমার শাস্তির ভয়ে ভীত।" তারা ফায়সালা চেয়েছিল (ফলে এভাবে তাদের ফায়সালা হলো) এবং প্রত্যেক উদ্ধত সত্যের দুশমন ব্যর্থ মনোরথ হলো।[২৪] এরপর সামনে তার জন্য রয়েছে জাহান্নাম। সেখানে তাকে পান করতে দেয়া হবে গলিত পুঁজের মতো পানি, যা সে জবরদস্তি গলা দিয়ে নামাবার চেষ্টা করবে এবং বড় কষ্টে নামাতে পারবে। মৃত্যু সকল দিক দিয়ে তার ওপর ছেয়ে থাকবে কিন্তু তার মৃত্যু হবে না এবং সামনের দিকে একটি কঠোর শাস্তি তাকে ভোগ করতে হবে।

১৯. তাদের কথার অর্থ ছিল এই যে, তোমাকে আমরা সব দিক দিয়ে আমাদের মত একজন মানুষই দেখছি। তুমি পানাহার করো, নিদ্রা যাও, তোমার স্ত্রী ও সন্তানাদি আছে, তোমার মধ্যে ক্ষুধা, পিপাসা, রোগ, শোক, ঠাণ্ডা ও গরমের তথা সব জিনিসের অনুভূতি আছে। এসব ব্যাপারে এবং সব ধরনের মানবিক দুর্বলতার ক্ষেত্রে আমাদের সাথে তোমার সাদৃশ্য রয়েছে। তোমার মধ্যে এমন কোন অসাধারণত্ব দেখছি না যার ভিত্তিতে আমরা এ

কথা মেনে নিতে পারি যে, তুমি আল্লাহর কাছে পৌঁছে গিয়েছো, আল্লাহ তোমার সাথে কথা বলেন এবং ফেরেশতারা তোমার কাছে আসে।

২০. অর্থাৎ এমন কোন প্রমাণ যা আমরা চোখে দেখি এবং হাত দিয়ে স্পর্শ করি। যে প্রমাণ দেখে আমরা বিশ্বাস করতে পারি যে, যথার্থই আল্লাহ তোমাকে পাঠিয়েছেন এবং তুমি এই যে বাণী এনেছো তা আল্লাহর বাণী।

২১. অর্থাৎ নিসন্দেহে আমি তো মানুষই। তবে আল্লাহ সত্যের তত্বজ্ঞান ও পূর্ণ অন্তরদৃষ্টি দান করে তোমাদের মধ্য থেকে আমাকে বাছাই করে নিয়েছেন। এখানে আমার সামর্থের কোন ব্যাপার নেই। এ তো আল্লাহর পূর্ণ ইখতিয়ারের ব্যাপার। তিনি নিজের বান্দাদের মধ্য থেকে যাকে যা ইচ্ছা দেন। আমার কাছে যা কিছু এসেছে তা আমি তোমাদের কাছে পাঠাতে বলতে পারি না এবং আমার কাছে যে সত্যের দ্বার উন্মুক্ত হয়ে গেছে তা থেকে আমি নিজের চোখ বন্ধ করে নিতেও পারি না।

২২. এর মানে এ নয় যে, নবুওয়াতের মর্যাদায় সমাসীন হবার আগে নবীগণ নিজেদের পথভ্রষ্ট সম্প্রদায়ের মিল্লাত বা ধর্মের অন্তরভুক্ত হতেন। বরং এর মানে হচ্ছে, নবুওয়াত লাভের পূর্বে যেহেতু তাঁরা এক ধরনের নীরব জীবন যাপন করতেন, কোন ধর্ম প্রচার করতেন না এবং প্রচলিত কোন ধর্মের প্রতিবাদও করতেন না তাই তাঁদের সম্প্রদায় মনে করতো তাঁরা তাদেরই ধর্মের অন্তরভুক্ত রয়েছেন। তারপর নবুওয়াতের কাজ শুরু করে দেয়ার পর তাঁদের বিরুদ্ধে দোষারোপ করা হতো যে, তাঁরা বাপ-দাদার ধর্ম ত্যাগ করেছেন। অথচ নবুওয়াত লাভের আগেও তাঁরা কখনো মুশরিকদের ধর্মের অন্তরভুক্ত ছিলেন না। যার ফলে তাঁদের বিরুদ্ধে ধর্মচ্যুতির অভিযোগ করা যেতে পারে।

২৩. অর্থাৎ ভীত হয়ো না, এরা বলছে, তোমরা এ দেশে থাকতে পারবে না কিন্তু আমি বলছি, এখন আর এরা এ দেশে থাকতে পারবে না। এখন যারা তোমাকে মানবে তারাই এখানে থাকবে।

২৪. মনে রাখা দরকার, এখানে এ ঐতিহাসিক ধারা বিবরণীর আকারে আসলে মক্কার কাফেরদের কথার জবাব দেয়া হচ্ছে, যা তারা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতো। আপাতদৃষ্টিতে অতীতের নবীগণ এবং তাঁদের সম্প্রদায়ের ঘটনাবলী উল্লেখ করা হচ্ছে, কিন্তু তা প্রযুক্ত হচ্ছে এ সূরা নাযিলের সময় যেসব ঘটনা ঘটে চলছিল তার ওপর। এ স্থানে মক্কার কাফেরদেরকে বরং আরবের মুশরিকদেরকে যেন পরিষ্কার ভাষায় সতর্ক করে দেয়া হয়েছে যে, তোমাদের ভবিষ্যত এখন নির্ভর করবে তোমরা মুহাম্মাদী দাওয়াতের মোকাবিলায় যে মনোভাব ও কর্মনীতি অবলম্বন করবে তার ওপর। যদি এ দাওয়াত গ্রহণ করো তাহলে আরব ভূখণ্ডে থাকতে পারবে আর যদি তা প্রত্যাখ্যান করো তাহলে এখান থেকে তোমাদের নাম-নিশানা মুছে যাবে। কার্যত ঐতিহাসিক ঘটনাবলী একথাটিকে একটি প্রমাণিত সত্যে পরিণত করে দিয়েছে। এ ভবিষ্যত বাণীর পর পুরো পনের বছর পার হতে না হতেই দেখা গেলো সমগ্র আরব ভূখণ্ডে একজন মুশরিকেরও অস্তিত্ব নেই।

مَثَلُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِرَبِّهِمْ اَعْمَالُهُمْ كَرَمَادِ ِۨاشْتَدَّتْ بِهِ الرِّيْحُ فِيْ يَوْمٍ عَاصِفٍ ؕ لَا يَقْدِرُوْنَ مِمَّا كَسَبُوْا عَلٰى شَيْءٍ ؕ ذٰلِكَ هُوَ الضَّلٰلُ الْبَعِيْدُ ﴿۱۸﴾ اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ بِالْحَقِّ ؕ اِنْ يَّشَاْ يُذْهِبْكُمْ وَيَاْتِ بِخَلْقٍ جَدِيْدٍ ﴿۱۹﴾ وَّمَا ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ بِعَزِيْزٍ ﴿۲۰﴾ وَبَرَزُوْا لِلّٰهِ جَمِيْعًا فَقَالَ الضُّعَفٰٓؤُا لِلَّذِيْنَ اسْتَكْبَرُوْٓا اِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ اَنْتُمْ مُّغْنُوْنَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ اللّٰهِ مِنْ شَيْءٍ ؕ قَالُوْا لَوْ هَدٰىنَا اللّٰهُ لَهَدَيْنٰكُمْ ؕ سَوَآءٌ عَلَيْنَآ اَجَزِعْنَآ اَمْ صَبَرْنَا مَا لَنَا مِنْ مَّحِيْصٍ ﴿۲۱﴾

যারা তাদের রবের সাথে কুফরী করলো তাদের কার্যক্রমের উপমা হচ্ছে এমন ছাই–এর মতো, যাকে একটি ঝনঝাক্ষুব্ধ দিনের প্রবল বাতাস উড়িয়ে দিয়েছে। তারা নিজেদের কৃতকর্মের কোনই ফল লাভ করতে পারবে না।[২৫] এটিই চরম বিভ্রান্তি। তুমি কি দেখছো না, আল্লাহ আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টিকে সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত করেছেন?[২৬] তিনি চাইলে তোমাদের নিয়ে যান এবং একটি নতুন সৃষ্টি তোমাদের স্থলাভিসিক্ত হয়। এমনটি করা তাঁর জন্য মোটেই কঠিন নয়।[২৭]

আর এরা যখন সবাই একত্রে আল্লাহর সামনে উন্মুক্ত হয়ে যাবে,[২৮] সে সময় এদের মধ্য থেকে যারা দুনিয়ায় দুর্বল ছিল তারা যারা নিজেদেরকে বড় বলে জাহির করতো তাদেরকে বলবে, "দুনিয়ায় আমরা তোমাদের অনুসারী ছিলাম, এখন কি তোমরা আল্লাহর আযাব থেকে আমাদের বাঁচাবার জন্যও কিছু করতে পারো? তারা জবাব দেবে, "আল্লাহ যদি আমাদের মুক্তিলাভের কোন পথ দেখাতেন তাহলে আমরা নিশ্চয়ই তোমাদেরও দেখিয়ে দিতাম। এখন তো সব সমান, কান্নাকাটি করো বা সবর করো—সর্বাবস্থায় আমাদের বাঁচার কোন পথ নেই।"[২৯]

২৫. অর্থাৎ যারা নিজেদের রবের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা, অবিশ্বস্ততা, অবাধ্যতা, স্বেচ্ছাচারমূলক আচরণ, নাফরমানী ও বিদ্রোহাত্মক কর্মপন্থা অবলম্বন করলো এবং নবীগণ যে আনুগত্য ও বন্দেগীর পথ অবলম্বন করার দাওয়াত নিয়ে আসেন তা গ্রহণ

করতে অস্বীকার করলো, তাদের সমগ্র জীবনের কর্মকাণ্ড এবং সারা জীবনের সমস্ত আমল শেষ পর্যন্ত এমনি অর্থহীন প্রমাণিত হবে যেমন একটি ছাই–এর স্তূপ, দীর্ঘদিন ধরে এক জায়গায় জমা হতে হতে তা এক সময় একটি বিরাট পাহাড়ে পরিণত হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু মাত্র একদিনের ঘূর্ণিঝড়ে তা এমনভাবে উড়ে গেলো যে তার প্রত্যেকটি কণা পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলো। তাদের চাকচিক্যময় সভ্যতা, বিপুল ঐতিহ্যবাহী সংস্কৃতি, বিস্ময়কর শিল্প–কল–কারখানা, মহা প্রতাপশালী রাষ্ট্র, বিশালায়তন বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ এবং তাদের জ্ঞান–বিজ্ঞান, শিল্প–সাহিত্য, চারুকলা–ভাস্কর্য–স্থাপত্যের বিশাল ভাণ্ডার, এমনকি তাদের ইবাদাত–বন্দেগী, বাহ্যিক সৎকার্যাবলী এবং দান ও জনকল্যাণমূলক এমন সব কাজ–কর্ম যেগুলোর জন্য তারা দুনিয়ায় গর্ব করে বেড়ায়, সবকিছুই শেষ পর্যন্ত ছাই–এর স্তূপে পরিণত হবে। কিয়ামতের দিনের ঘূর্ণিঝড় এ ছাই–এর স্তূপকে সম্পূর্ণরূপে নিশ্চিহ্ন করে দেবে এবং আখেরাতের জীবনে আল্লাহর মীযানে রেখে সামান্যতম ওজন পাওয়ার জন্য তার একটি কণাও তাদের কাছে থাকবে না।

২৬. ইতিপূর্বে যে বক্তব্য উপস্থাপন করা হয়েছিল এটি হচ্ছে তার সপক্ষে যুক্তি।.এর মানে হচ্ছে, একথা শুনে তোমরা অবাক হচ্ছো কেন? তোমরা কি দেখছো না এ যমীন ও আসমানের বিরাট সৃষ্টি কারখানা মিথ্যার ওপর নয় বরং সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত? এখানে যে জিনিসটি সত্য ও যথার্থতার ওপর প্রতিষ্ঠিত হয় না বরং নিছক একটি ধারণা–অনুমানের ওপর যার ভিত রাখা হয় সেটি কখনো স্থায়িত্ব লাভ করতে পারে না। তার প্রতিষ্ঠা ও মজবুতী—লাভের কোন সম্ভাবনা থাকে না। তার ওপর ভরসা করে যে ব্যক্তি কাজ করে সে কখনো নিজের ভরসার ক্ষেত্রে সফলকাম হতে পারে না। যে ব্যক্তি পানির ওপর নকশা কাটে এবং বালির বাঁধ নির্মাণ করে, সে যদি মনে করে, তার এ নক্‌শা স্থায়ী হবে এবং এ বাঁধ কায়েম থাকবে তাহলে তার এ আশা কখনো পূর্ণ হতে পারে না। কারণ পানির প্রকৃতিই এমন যে তাতে কোন নক্‌শা টিকে থাকে না এবং বাঁধের জন্য যে মজবুত বুনিয়াদের প্রয়োজন তা সরবরাহ করার ক্ষমতা বালির নেই। কাজেই সত্যতা ও বাস্তবতাকে উপেক্ষা করে যে ব্যক্তি মিথ্যা আশা–আকাংখার ওপর কর্মের ভিত্ গড়ে তোলে তার ব্যর্থতা অনিবার্য। একথা যদি তোমরা বুঝতে পেরে থাকো তাহলে একথা শুনে তোমরা অবাক হচ্ছো কেন যে, আল্লাহর এ বিশ্ব–জাহানে যে ব্যক্তি নিজেকে আল্লাহর ইবাদাত ও আনুগত্য মুক্ত মনে করে কাজ করবে অথবা আল্লাহ ছাড়া অন্য কারোর সার্বভৌম ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব মেনে নিয়ে (যার আসলে কোন সার্বভৌম ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব নেই) জীবন যাপন করবে তার জীবনের সমস্ত কাজ নষ্ট হয়ে যাবে? যখন মানুষ এখানে যথার্থই স্বাধীন নয় এবং আল্লাহ ছাড়া অন্য কারোর বান্দাও নয় তখন এ মিথ্যা ও অবাস্তব কল্পনার ওপর নিজের সমগ্র চিন্তা ও কর্মের ভিত্তি স্থাপনকারী মানুষ যদি তোমাদের মতে পানির ওপর নকশা অংকনকারী নির্বোধের পরিণাম না ভোগে তাহলে তার জন্য তোমরা আর কোন্ ধরনের পরিণাম আশা করো"?

২৭. দাবীর সপক্ষে যুক্তি পেশ করার সাথে সাথেই উপদেশ হিসেবে এ বাক্য উচ্চারণ করা হয়েছে এবং এ সাথে ওপরের দ্ব্যর্থহীন কথা শুনে মানুষের মনে যে সন্দেহ সৃষ্টি হতে পারে তা দূর করার ব্যবস্থাও এতে রয়েছে। কেউ জিজ্ঞেস করতে পারে এ আয়াতগুলোতে

وَقَالَ الشَّيْطٰنُ لَمَّا قُضِيَ الْاَمْرُ اِنَّ اللّٰهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ وَوَعَدْتُّكُمْ فَاَخْلَفْتُكُمْ ؕ وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيْكُمْ مِّنْ سُلْطٰنٍ اِلَّاۤ اَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِيْ ۚ فَلَا تَلُوْمُوْنِيْ وَلُوْمُوْۤا اَنْفُسَكُمْ ؕ مَاۤ اَنَا بِمُصْرِخِكُمْ وَمَاۤ اَنْتُمْ بِمُصْرِخِيَّ ؕ اِنِّيْ كَفَرْتُ بِمَاۤ اَشْرَكْتُمُوْنِ مِنْ قَبْلُ ؕ اِنَّ الظّٰلِمِيْنَ لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ﴿٢٢﴾

৪ রুকূ'

আর যখন সবকিছুর মীমাংসা হয়ে যাবে তখন শয়তান বলবে, "সত্যি বলতে কি আল্লাহ তোমাদের সাথে যে ওয়াদা করেছিলেন তা সব সত্যি ছিল এবং আমি যেসব ওয়াদা করেছিলাম তার মধ্য থেকে একটিও পুরা করিনি।[৩০] তোমাদের ওপর আমার তো কোন জোর ছিল না, আমি তোমাদের আমার পথের দিকে আহবান জানানো ছাড়া আর কিছুই করিনি এবং তোমরা আমার আহবানে সাড়া দিয়েছিলে।[৩১] এখন আমার নিন্দাবাদ করো না, নিজেরাই নিজেদের নিন্দাবাদ করো। এখানে না আমি তোমাদের অভিযোগের প্রতিকার করতে পারি আর না তোমরা আমার। ইতিপূর্বে তোমরা যে আমাকে আল্লাহর সার্বভৌম ক্ষমতা ও কর্তৃত্বে শরীক করেছিলে[৩২] তার সাথে আমার কোন সম্পর্ক নেই, এ ধরনের জালেমদের জন্য তো যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি অবধারিত।

যে কথা বলা হয়েছে তাই যদি সত্য হয়ে থাকে তাহলে প্রত্যেক মিথ্যাপূজারী ও দুষ্কৃতকারী ধ্বংস হয় না কেন? এর জবাব হচ্ছে, হে নির্বোধ! তুমি কি মনে করো তাকে ধ্বংস করা আল্লাহর জন্য তেমন কোন কঠিন কাজ? অথবা আল্লাহর সাথে তার কোন আত্মীয়তা আছে যে কারণে তার দুষ্কৃতি সত্ত্বেও নিছক স্বজন প্রীতির বশে বাধ্য হয়ে আল্লাহ তাকে অব্যাহতি দিয়েছেন? যদি এমনটি না হয়ে থাকে এবং তুমি নিজে জানো এমন কোন ব্যাপার নেই তাহলে তোমার অবশ্যি বুঝা উচিত, একটি মিথ্যাপূজারী ও দুষ্কৃতকারী জাতি সবসময় তাকে সরিয়ে দেয়ার এবং তার জায়গায় অন্য কোন জাতিকে কাজ করার সুযোগ দেয়ার আশংকা করে থাকে। এ আশংকার বাস্তবে রূপ নিতে দেরী হয়ে থাকলে আদতে আশংকার কোন অস্তিত্বই নেই এ ধরনের বিভ্রান্তির নেশায় মত্ত হয়ে যাওয়া উচিত নয়। অবকাশের প্রত্যেকটি মুহূর্তকে মূল্যবান মনে করো এবং নিজের মিথ্যা চিন্তা ও কর্ম ব্যবস্থার অস্থায়িত্ব অনুভব করে তাকে দ্রুত স্থায়ী বুনিয়াদের ওপর প্রতিষ্ঠিত করো।

২৮. মূল শব্দ 'বারাযা'। 'বারাযা' মানে শুধু বের হয়ে সামনে আসা এবং উপস্থাপিত হওয়া নয় বরং এর মধ্যে প্রকাশ হয়ে যাওয়া এবং খুলে যাওয়ার অর্থও রয়েছে। তাই আমি এর অনুবাদ করেছি সামনে উন্মুক্ত হয়ে যাবে। প্রকৃতপক্ষে বান্দা তো সবসময় তার রবের সামনে উন্মুক্ত রয়েছে। কিন্তু কিয়ামতের দিন নিজের রবের সামনে পেশ হওয়ার সময় যখন সবাই আল্লাহর আদালতে হাযির হবে তখন তারা নিজেরাও জানবে যে, তারা সকল বিচারপতির শ্রেষ্ঠ বিচারপতি এবং শেষ বিচার দিনের সর্বময় কর্তার সামনে একেবারে অনাবৃত হয়ে দাঁড়িয়ে আছে এবং তাদের কোন কাজ বরং কোন চিন্তাও হৃদয়ের গহন কোণে লুকানো কোন ইচ্ছাও তাঁর কাছে গোপন নেই।

২৯. এটি এমন সব লোকের জন্য সতর্কবাণী যারা দুনিয়ায় চোখ বন্ধ করে অন্যের পেছনে চলে অথবা নিজেদের দুর্বলতাকে প্রমাণ হিসেবে পেশ করে শক্তিশালী জালেমদের আনুগত্য করে। তাদের জানানো হচ্ছে, আজ যারা তোমাদের নেতা, কর্মকর্তা ও শাসক হয়ে আছে আগামীকাল এদের কেউই তোমাদেরকে আল্লাহর আযাব থেকে সামান্যতম নিষ্কৃতিও দিতে পারবে না। কাজেই আজই ভেবে নাও, তোমরা যাদের পেছনে ছুটে চলছো অথবা যাদের হুকুম মেনে চলছো তারা নিজেরাই কোথায় যাচ্ছে এবং তোমাদের কোথায় নিয়ে যাবে।

৩০. অর্থাৎ আল্লাহ সত্যবাদী ছিলেন এবং আমি ছিলাম মিথ্যেবাদী তোমাদের এতটুকুন অভিযোগ ও দোষারোপ যে পুরোপুরি সত্যি এতে কোন সন্দেহ নেই। একথা আমি অস্বীকার করছি না। তোমরা দেখতেই পাচ্ছো, আল্লাহর প্রত্যেকটি প্রতিশ্রুতি ও হুমকি অক্ষরে অক্ষরে সত্য প্রমাণিত হয়েছে। অন্যদিকে আমি তোমাদের যেসব আশ্বাস দিয়েছিলাম, যেসব লাভের লোভ দেখিয়েছিলাম, যেসব সুদৃশ্য আশা–আকাংখার জালে তোমাদের ফাঁসিয়েছিলাম এবং সর্বাগ্রে তোমাদের মনে যে বিশ্বাস স্থাপন করিয়েছিলাম যে, ওসব আখেরাত টাখেরাত বলে কিছুই নেই, ওগুলো নিছক প্রতারণা ও গাল–গল্প, আর যদি সত্যিই কিছু থেকে থাকে, তাহলে অমুক বুযুর্গের বদৌলতে তোমরা সোজা উদ্ধার পেয়ে যাবে, কাজেই তাদের খেদমতে নযরানা ও অর্থ–উপাচারের উৎকোচ প্রদান করতে থাকো এবং তারপর যা মন চায় তাই করে যেতে থাকো আমি তোমাদের এই যেসব কথা নিজে এবং আমার এজেন্টদের মাধ্যমে বলেছিলাম, এগুলো সবই ছিল নিছক প্রতারণা।

৩১. অর্থাৎ আপনারা যদি এ মর্মে কোন প্রমাণ দেখাতে পারেন যে, আপনারা নিজেরা সত্য–সঠিক পথে চলতে চাচ্ছিলেন এবং আমি জবরদস্তি আপনাদের হাত ধরে আপনাদেরকে ভুল পথ থেকে টেনে নিয়েছিলাম তাহলে অবশ্যি তা দেখান। এর যা শাস্তি হয় আমি মাথা পেতে নেবো। কিন্তু আপনারা নিজেরাও স্বীকার করবেন, আসল ঘটনা তা নয়। আমি হকের আহবানের মোকাবিলায় বাতিলের আহবান আপনাদের সামনে পেশ করেছি। সত্যের মোকাবিলায় মিথ্যার দিকে আপনাদেরকে ডেকেছি। সৎকাজের মোকাবিলায় অসৎকাজ করার জন্য আপনাদেরকে আহবান জানিয়েছি। এর বেশী আর কিছুই করিনি। আমার কথা মানা না মানার পূর্ণ স্বাধীনতা আপনাদের ছিল। আপনাদেরকে বাধ্য করার কোন ক্ষমতা আমার ছিল না। এখন আমার এ দাওয়াতের জন্য নিসন্দেহে আমি নিজে দায়ী ছিলাম এবং এর শাস্তিও আমি পাচ্ছি। কিন্তু আপনারা যে এ দাওয়াতে সাড়া

وَأُدْخِلَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ جَنّٰتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا
الْأَنْهٰرُ خٰلِدِينَ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ ۖ تَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلٰمٌ ﴿٢٣﴾ أَلَمْ تَرَ
كَيْفَ ضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ
وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ ﴿٢٤﴾ تُؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا ۗ
وَيَضْرِبُ اللّٰهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٢٥﴾ وَمَثَلُ كَلِمَةٍ
خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ اجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ مَا لَهَا مِنْ قَرَارٍ ﴿٢٦﴾

অপরদিকে যারা দুনিয়ায় ঈমান এনেছে এবং যারা সৎকাজ করেছে তাদেরকে এমন বাগীচায় প্রবেশ করানো হবে যার পাদদেশে নদী প্রবাহিত হবে। সেখানে তারা তাদের রবের অনুমতিক্রমে চিরকাল বসবাস করবে। সেখানে তাদেরকে অভ্যর্থনা জানানো হবে শান্তি ও নিরাপত্তার মোবারকবাদ সহকারে।[৩৩] তুমি কি দেখছো না আল্লাহ কালেমা তাইয়েবার[৩৪] উপমা দিয়েছেন কোন্ জিনিসের সাহায্যে? এর উপমা হচ্ছে যেমন একটি ভালো জাতের গাছ, যার শিকড় মাটির গভীরে প্রোথিত এবং শাখা–প্রশাখা আকাশে পৌঁছে গেছে।[৩৫] প্রতি মুহূর্তে নিজের রবের হুকুমে সে ফলদান করে।[৩৬] এ উপমা আল্লাহ এ জন্য দেন যাতে লোকেরা এর সাহায্যে শিক্ষা লাভ করতে পারে। অন্যদিকে অসৎ বাক্যের[৩৭] উপমা হচ্ছে, একটি মন্দ গাছ, যাকে ভূপৃষ্ঠ থেকে উপড়ে দূরে নিক্ষেপ করা হয়, যার কোন স্থায়িত্ব নেই।[৩৮]

দিয়েছেন, এর দায়ভার কেমন করে আমার ঘাড়ে চাপাতে চাচ্ছেন? নিজেদের ভুল নির্বাচন এবং নিজেদের ক্ষমতার অসৎ ব্যবহারের দায়ভার পুরোপুরি আপনাদের বহন করতে হবে।

৩২. এখানে আবার বিশ্বাসগত শিরকের মোকাবিলায় শিরকের একটি স্বতন্ত্র ধারা অর্থাৎ কর্মগত শিরকের অস্তিত্বের একটি প্রমাণ পাওয়া যায়। একথা সুস্পষ্ট, বিশ্বাসগত দিক দিয়ে শয়তানকে কেউই আল্লাহর সার্বভৌম ক্ষমতা ও কর্তৃত্বে শরীক করে না এবং কেউ তার পূজা, আরাধনা ও বন্দেগী করে না। সবাই তাকে অভিশাপ দেয়। তবে তার আনুগত্য ও দাসত্ব এবং চোখ বুজে বা খুলে তার পদ্ধতির অনুসরণ অবশ্যি করা হচ্ছে। এটিকেই এখানে শিরক বলা হয়েছে। কেউ বলতে পারেন, এটা তো শয়তানের উক্তি, আল্লাহ এটা উদ্ধৃত করেছেন মাত্র। কিন্তু আমরা বলবো, প্রথমত তার বক্তব্য যদি ভুল হতো তাহলে আল্লাহ নিজেই তার প্রতিবাদ করতেন। দ্বিতীয়ত কুরআনে কর্মগত শিরকের শুধু এ একটিমাত্র দৃষ্টান্ত নেই বরং পূর্ববর্তী সূরাগুলোয় এর একাধিক প্রমাণ পাওয়া গেছে

এবং সামনের দিকে আরো পাওয়া যাবে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, ইহুদী ও খৃষ্টানদের বিরুদ্ধে এ অভিযোগ ঃ তারা আল্লাহ ছাড়া নিজেদের "আহবার" (উলামা) ও "রাহিব"দেরকে (সংসার বিরাগী সন্যাসী) রব হিসেবে গ্রহণ করেছে। [আত্ তাওবা ঃ ৩১] জাহেলিয়াতের আচার অনুষ্ঠান উদ্ভাবনকারীদের সম্পর্কে একথা বলা ঃ তাদের অনুসারীরা তাদেরকে আল্লাহর সাথে শরীক করে নিয়েছে। [আল আন'আম ঃ ১৩৭] প্রবৃত্তির কামনা বাসনার পূজারীদের সম্পর্কে বলা ঃ তারা নিজেদের প্রবৃত্তির কামনা বাসনাকে ইলাহ বানিয়ে নিয়েছে। (আল ফুরকান ঃ ৪৩) নাফরমান বান্দাদের সম্পর্কে এ উক্তি ঃ তারা শয়তানের ইবাদাত করতে থেকেছে। (ইয়াসীন ঃ ৬০) মানুষের গড়া আইন অনুযায়ী জীবন যাপনকারীদেরকে এ বলে ভর্ৎসনা করা ঃ আল্লাহর অনুমতি ছাড়া যারা তাদের জন্য শরীয়াত প্রণয়ন করেছে তারা হচ্ছে তাদের "শরীক"। (আশ্–শূরা ঃ ২১) এগুলো সব কি কর্মগত শিরকের নজীর নয়? এ নজীরগুলো থেকে একথা পরিষ্কার জানা যায় যে, কোন ব্যক্তি আকীদাগতভাবে কোন গাইরুল্লাহকে আল্লাহর সার্বভৌমত্বে শরীক করলো, শিরকের শুধুমাত্র এ একটিই আকৃতি নেই। এর আর একটি আকৃতিও আছে। সেটি হচ্ছে, আল্লাহর অনুমোদন ছাড়াই অথবা আল্লাহর বিধানের বিপরীত কোন গাইরুল্লাহর অনুসরণ ও আনুগত্য করতে থাকা। এ ধরনের অনুসারী বা আনুগত্যকারী যদি নিজের নেতার বা যার আনুগত্য করছে তার ওপর লানত বর্ষণ করা অবস্থায়ও কার্যত এ আনুগত্যের নীতি অবলম্বন করে তাহলে কুরআনের দৃষ্টিতে সে তাকে আল্লাহর সার্বভৌম ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের শরীক করছে। শরীয়াতের দৃষ্টিতে আকীদাগত মুশরিকদের জন্য যে বিধান তাদের জন্য সেই একই বিধান না হলেও তাতে কিছু আসে যায় না। (আরো বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন সূরা আন'আমের ৮৭ ও ১০৭ টীকা এবং সূরা আল কাহাফের ৫০ টীকা)।

৩৩. মূল শব্দ تَحِيَّةٌ এর শাব্দিক অর্থ হচ্ছে, দীর্ঘায়ুর জন্য দোয়া। কিন্তু পারিভাষিক অর্থে আরবী ভাষায় এ শব্দটিকে সম্বর্ধনা ও অভ্যর্থনা সূচক শব্দ বা স্বাগত বচন হিসেবে বলা হয়ে থাকে। লোকেরা পরস্পর মুখোমুখি হলে সবার আগে একজন অন্যজনের উদ্দেশ্যে এ শব্দটিই উচ্চারণ করে। আমাদের ভাষায় এর সমার্থক শব্দ হচ্ছে , "সালাম" বা "সালাম কালাম"। কিন্তু প্রথম শব্দটি ব্যবহার করলে অনুবাদ যথাযথ হয় না এবং দ্বিতীয় শব্দটি হাল্‌কা হয়ে যায়। তাই আমি এর অনুবাদে "অভ্যর্থনা" শব্দ ব্যবহার করেছি।

تحيتهم শব্দের মানে এও হতে পারে যে, তাদের মধ্যে পারস্পরিক অভ্যর্থনার পদ্ধতি এ হবে। আবার এ মানেও হতে পারে যে, তাদের অভ্যর্থনা এভাবে হবে। তাছাড়া سلام শব্দের মধ্যে নিরাপত্তার দোয়ার অর্থ রয়েছে এবং নিরাপত্তার জন্য মোবারকবাদও রয়েছে। পরিবেশ ও পরিস্থিতির সাথে সামঞ্জস্য রেখে আমি এখানে অনুবাদে উল্লেখিত অর্থ গ্রহণ করেছি।

৩৪. "কালেমা তাইয়েবা"র শাব্দিক অর্থ "পবিত্র কথা।" কিন্তু এ শব্দের মাধ্যমে যে তাৎপর্য গ্রহণ করা হয়েছে তা হচ্ছে, এমন সত্য কথা এবং এমন পরিচ্ছন্ন বিশ্বাস যা পুরোপুরি সত্য ও সরলতার ওপর প্রতিষ্ঠিত। এ উক্তি ও আকীদা কুরআন মজীদের দৃষ্টিতে অপরিহার্যভাবে এমন একটি কথা ও বিশ্বাস হতে পারে যার মধ্যে রয়েছে তাওহীদের স্বীকৃতি, নবীগণ ও আসমানী কিতাবসমূহের স্বীকৃতি এবং আখেরাতের স্বীকৃতি। কারণ কুরআন এ বিষয়গুলোকেই মৌলিক সত্য হিসেবে পেশ করে।

৩৫. অন্য কথায় এর অর্থ হলো, পৃথিবী থেকে আকাশ পর্যন্ত সমগ্র বিশ্ব ব্যবস্থা যেহেতু এমন একটি সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত যার স্বীকৃতি একজন মুমিন তার কালেমা তাইয়েবার মধ্যে দিয়ে থাকে, তাই কোন স্থানের প্রাকৃতিক আইন–এর সাথে সংঘর্ষ বাধায় না, কোন বস্তুর আসল, স্বভাব ও প্রাকৃতিক গঠন একে অস্বীকার করে না এবং কোথাও কোন প্রকৃত সত্য ও সততা এর সাথে বিরোধ করে না। তাই পৃথিবী ও তার সমগ্র ব্যবস্থা তার সাথে সহযোগিতা করে এবং আকাশ তথা সমগ্র মহাশূন্য জগত তাকে স্বাগত জানায়।

৩৬. অর্থাৎ সেটি একটি ফলদায়ক ও ফলপ্রসূ কালেমা। কোন ব্যক্তি বা জাতি তার ভিত্তিতে জীবন ব্যবস্থা গড়ে তুললে প্রতি মুহূর্তে সে তার সুফল লাভ করতে থাকে। সেটি চিন্তাধারায় পরিপক্কতা ও পরিচ্ছন্নতা, স্বভাবে প্রশান্তি, মেজাজে ভারসাম্য, এ জীবন ধারায় মজবুতী, চরিত্রে পবিত্রতা, আত্মায় প্রফুল্লতা ও স্নিগ্ধতা, শরীরে পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতা, আচরণে মাধুর্য, ব্যবহার ও লেনদেনে সততা, কথাবার্তায় সত্যবাদিতা, ওয়াদা ও অংগীকারে দৃঢ়তা, সামাজিক জীবন যাপনে সদাচার, কৃষ্টিতে ঔদার্য ও মহত্ব, সভ্যতায় ভারসাম্য, অর্থনীতিতে আদল ও ইনসাফ, রাজনীতিতে বিশ্বস্ততা, যুদ্ধে সৌজন্য, সন্ধিতে আন্তরিকতা এবং চুক্তি ও অংগীকারে বিশ্বস্ততা সৃষ্টি করে। সেটি এমন একটি পরশ পাথর যার প্রভাব কেউ যথাযথভাবে গ্রহণ করলে খাঁটি সোনায় পরিণত হয়।

৩৭. এটি কালেমা তাইয়েবার বিপরীত শব্দ। যদিও প্রতিটি সত্য বিরোধী ও মিথ্যা কথার ওপর এটি প্রযুক্ত হতে পারে তবুও এখানে এ থেকে এমন প্রতিটি বাতিল আকীদা বুঝায়, যার ভিত্তিতে মানুষ নিজের জীবন ব্যবস্থা গড়ে তোলে। এ বাতিল আকীদা নাস্তিক্যবাদ, নিরীশ্বরবাদ, ধর্মদ্রোহিতা, অবিশ্বাস, শিরক, পৌত্তলিকতা অথবা এমন কোন চিন্তাধারাও হতে পারে, যা নবীদের মাধ্যমে আসেনি।

৩৮. অন্য কথায় এর অর্থ হলো, বাতিল আকীদা যেহেতু সত্য বিরোধী তাই প্রাকৃতিক আইন কোথাও তার সাথে সহযোগিতা করে না। বিশ্ব–জগতের প্রতিটি অণুকণিকা তাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে। পৃথিবী ও আকাশের প্রতিটি বস্তু তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানায়। জমিতে তার বীজ বপন করার চেষ্টা করলে জমি সবসময় তাকে উদগীরণ করার জন্য তৈরী থাকে। আকাশের দিকে তার শাখা প্রশাখা বেড়ে উঠতে থাকলে আকাশ তাদেরকে নিচের দিকে ঠেলে দেয়। পরীক্ষার খাতিরে মানুষকে যদি নির্বাচন করার স্বাধীনতা ও কর্মের অবকাশ না দেয়া হতো তাহলে এ অসৎজাতের গাছটি কোথাও গজিয়ে উঠতে পারতো না। কিন্তু যেহেতু মহান আল্লাহ আদম সন্তানকে নিজের স্বাধীন ইচ্ছা ও প্রবণতা অনুযায়ী কাজ করার সুযোগ দান করেছেন, তাই যেসব নির্বোধ লোক প্রাকৃতিক আইনের বিরুদ্ধে লড়ে এ গাছ লাগাবার চেষ্টা করে তাদের শক্তি প্রয়োগের ফলে জমি একে সামান্য কিছু জায়গা দিয়েও দেয়, বাতাস ও পানি থেকে সে কিছু না কিছু খাদ্য পেয়েই যায় এবং শূন্যও তার ডালপালা ছড়াবার জন্য অনিচ্ছাকৃতভাবে কিছু জায়গা তাকে দিতে প্রস্তুত হয়ে যায়। কিন্তু যতদিন এ গাছ বেঁচে থাকে ততদিন তিতা, বিস্বাদ ও বিষাক্ত ফল দিতে থাকে এবং অবস্থার পরিবর্তনের সাথে সাথেই আকস্মিক ঘটনাবলীর এক ধাক্কাই তাকে সমূলে উৎপাটিত করে।

পৃথিবীর ধর্মীয়, নৈতিক, চিন্তাগত ও তামাদ্দুনিক ইতিহাস অধ্যয়নকারী প্রত্যেক ব্যক্তিই কালেমায়ে তাইয়েবা তথা ভালো কথা এবং মন্দ কথার এ পার্থক্য সহজে অনুভব

يُثَبِّتُ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَفِي الْاٰخِرَةِ ۚ وَيُضِلُّ اللّٰهُ الظّٰلِمِيْنَ ۙ وَيَفْعَلُ اللّٰهُ مَا يَشَآءُ ﴿٢٧﴾

ঈমানদারদেরকে আল্লাহ একটি শাশ্বত বাণীর ভিত্তিতে দুনিয়া ও আখেরাত উভয় স্থানে প্রতিষ্ঠা দান করেন[৩৯] আর জালেমদেরকে আল্লাহ পথভ্রষ্ট করেন।[৪০] আল্লাহ যা চান তাই করেন।

করতে পারে। সে দেখবে, ইতিহাসের শুরু থেকে আজ পর্যন্ত ভালো কথা একই থেকেছে। কিন্তু মন্দ কথা সৃষ্টি হয়েছে অসংখ্য। ভালো কথাকে কখনো শিকড়শুদ্ধ উপড়ে ফেলা যায়নি। কিন্তু মন্দ কথার তালিকা হাজারো মৃত কথার নামে ভরে আছে। এমনকি তাদের অনেকের অবস্থা হচ্ছে এই যে, আজ ইতিহাসের পাতা ছাড়া আর কোথাও তাদের নাম নিশানাও পাওয়া যায় না। স্ব স্ব যুগে যেসব কথার প্রচণ্ড দাপট ছিল আজ সে সব কথা উচ্চারিত হলে মানুষ এই ভেবে অবাক হয়ে যায় যে, একদিন এমন পর্যায়ের নির্বুদ্ধিতাও মানুষ করেছিল।

তারপর ভালো কথাকে যখনই যে জাতি বা ব্যক্তি যেখানেই গ্রহণ করে সঠিক অর্থে প্রয়োগ করেছে সেখানেই তার সমগ্র পরিবেশ তার সুবাসে আমোদিত হয়েছে। তার বরকতে শুধুমাত্র সেই ব্যক্তি বা জাতিই সমৃদ্ধ হয়নি বরং তার আশপাশের জগতও সমৃদ্ধ হয়েছে। কিন্তু কোন মন্দ কথা যেখানেই ব্যক্তি বা সমাজ জীবনে শিকড় গেড়েছে সেখানেই তার দুর্গন্ধে সমগ্র পরিবেশ পূতিগন্ধময় হয়ে উঠেছে এবং তার কাঁটার আঘাত থেকে তার মান্যকারীরা নিরাপদ থাকেনি এবং এমন কোন ব্যক্তিও নিরাপদ থাকতে পারেনি যে তার মুখোমুখি হয়েছে।

এ প্রসংগে একথা উল্লেখ্য যে, এখানে উপমার মাধ্যমে ১৮ আয়াতে যে বিষয়টি বর্ণনা করা হয়েছিল সেটিই বুঝিয়ে দেয়া হয়েছে। ১৮ আয়াতে বলা হয়েছিল, "নিজের রবের সাথে যারা কুফরী করে তাদের দৃষ্টান্ত এমন ছাই–এর মতো যাকে ঝনুঝা বিক্ষুব্ধ দিনের প্রবল বাতাস উড়িয়ে দিয়েছে।" এ একই বিষয়বস্তু ইতিপূর্বে সূরা 'আর রা'দ'–এর ১৭ আয়াতে অন্যভাবে বন্যা ও গলিত ধাতুর উপমার সাহায্যে বর্ণনা করা হয়েছে।

৩৯. অর্থাৎ 'এ কালেমার বদৌলতে তারা দুনিয়ায় একটি স্থায়ী দৃষ্টিভংগী, একটি শক্তিশালী ও সুগঠিত চিন্তাধারা এবং একটি ব্যাপকভিত্তিক মতবাদ ও জীবন দর্শন লাভ করে। জীবনের সকল জটিল গ্রন্থীর উন্মোচনে এবং সকল সমস্যার সমাধানে তা এমন এক চাবির কাজ করে যা দিয়ে সকল তালা খোলা যায়। তার সাহায্যে চরিত্র মজবুত এবং নৈতিক বৃত্তিগুলো সুগঠিত হয়। তাকে কালের আবর্তন একটুও নড়াতে পারে না। তার সাহায্যে জীবন যাপনের এমন কতগুলো নিরেট মূলনীতি পাওয়া যায় যা একদিকে তাদের হৃদয়ে প্রশান্তি ও মস্তিষ্কে নিশ্চিন্ততা এনে দেয় এবং অন্যদিকে তাদেরকে প্রচেষ্টা ও কর্মের পথে দিশেহারা হয়ে ঘুরে বেড়াবার দ্বারে দ্বারে ঠোকর খাওয়ার এবং অস্থিরতার শিকার হওয়ার হাত থেকে বাঁচায়। তারপর যখন তারা মৃত্যুর সীমানা পার হয়ে পরলোকের

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَتَ اللَّهِ كُفْرًا وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ
الْبَوَارِ ﴿٢٨﴾ جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا ۖ وَبِئْسَ الْقَرَارُ ﴿٢٩﴾ وَجَعَلُوا لِلَّهِ أَندَادًا
لِّيُضِلُّوا عَن سَبِيلِهِ ۗ قُلْ تَمَتَّعُوا فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى النَّارِ ﴿٣٠﴾
قُل لِّعِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا يُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ
سِرًّا وَعَلَانِيَةً مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ يَوْمٌ لَّا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خِلَالٌ ﴿٣١﴾

৫ রুকূ'

তুমি দেখেছো তাদেরকে, যারা আল্লাহর নিয়ামত লাভ করলো এবং তাকে কৃতঘ্নতায় পরিণত করলো আর (নিজেদের সাথে) নিজেদের সম্প্রদায়কেও ধ্বংসের আবর্তে ঠেলে দিল—অর্থাৎ জাহান্নাম, যার মধ্যে তাদেরকে ঝলসানো হবে এবং তা নিকৃষ্টতম আবাস—এবং আল্লাহর কিছু সমকক্ষ বানিয়ে নিল, যাতে তারা তাদেরকে আল্লাহর পথ থেকে ভ্রষ্ট করে দেয়। এদেরকে বলো, ঠিক আছে, মজা ভোগ করে নাও, শেষ পর্যন্ত তোমাদের তো ফিরে যেতে হবে দোজখের মধ্যেই।

হে নবী! আমার যে বান্দারা ঈমান এনেছে তাদেরকে বলে দাও, তারা যেন নামায কায়েম করে এবং যা কিছু আমি তাদেরকে দিয়েছি তা থেকে প্রকাশ্যে ও গোপনে (সৎপথে) ব্যয় করে[৪১] —সেই দিন আসার আগে যেদিন না বেচা-কেনা হবে আর না হতে পারবে বন্ধু বাৎসল্য।[৪২]

সীমান্তে পা রাখে তখন সেখানে তারা বিস্ময়াভিভূত, হতবাক ও পেরেশান হয় না। কারণ সেখানে তাদের প্রত্যাশা অনুযায়ী সবকিছু হতে থাকে। সে জগতে তারা এমনভাবে প্রবেশ করতে থাকে যেন সেখানকার আচার-অনুষ্ঠান ও রীতিনীতি সম্পর্কে তারা পূর্বাহ্নেই অবহিত ছিল। সেখানে এমন কোন পর্যায় উপস্থাপিত হয় না যে সম্পর্কে তাদের পূর্বাহ্নে খবর দেয়া হয়নি এবং যে জন্য তারা পূর্বেই প্রস্তুতি পর্ব সম্পন্ন করে রাখেনি। তাই সেখানে প্রত্যেক মনযিলই তারা দৃঢ়পদে অতিক্রম করে যায়। পক্ষান্তরে কাফের ব্যক্তি মৃত্যুর পরপরই নিজের প্রত্যাশার সম্পূর্ণ বিপরীত অকস্মাত এক ভিন্ন অবস্থার মুখোমুখি হয়। তার অবস্থা মুমিন থেকে সম্পূর্ণ আলাদা হয়।

৪০. অর্থাৎ যেসব জালেম কালেমায়ে তাইয়েবা বাদ দিয়ে কোন মন্দ কালেমার অনুসরণ করে আল্লাহ তাদের বুদ্ধিবৃত্তি ও মন-মানসকে দিশেহারা করে দেন এবং তাদের প্রচেষ্টাবলীর মধ্যে বিশৃংখলা সৃষ্টি করেন। তারা কোন দিক দিয়েও চিন্তা ও কর্মের সঠিক পথে পাড়ি জমাতে পারে না। তাদের কোন তীরও সঠিক লক্ষ্যস্থলে লাগে না।

اَللّٰهُ الَّذِیْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَاَنْزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً
فَاَخْرَجَ بِهٖ مِنَ الثَّمَرٰتِ رِزْقًا لَّكُمْ ۚ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِیَ
فِی الْبَحْرِ بِاَمْرِهٖ ۚ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْاَنْهٰرَ ﴿٣٢﴾ وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ
وَالْقَمَرَ دَآئِبَیْنِ ۚ وَسَخَّرَ لَكُمُ الَّیْلَ وَالنَّهَارَ ﴿٣٣﴾ وَاٰتٰىكُمْ مِّنْ كُلِّ
مَا سَاَلْتُمُوْهُ ؕ وَاِنْ تَعُدُّوْا نِعْمَتَ اللّٰهِ لَا تُحْصُوْهَا ؕ اِنَّ الْاِنْسَانَ
لَظَلُوْمٌ كَفَّارٌ ﴿٣٤﴾

আল্লাহ তো তিনিই,[৪৩] *যিনি এ পৃথিবী ও আকাশ সৃষ্টি করেছেন এবং আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করেছেন, তারপর তার মাধ্যমে তোমাদের জীবিকা দান করার জন্য নানা প্রকার ফল উৎপন্ন করেছেন। যিনি নৌযানকে তোমাদের জন্য অনুগত করে দিয়েছেন, যাতে তাঁর হুকুমে তা সাগরে বিচরণ করে এবং নদী সমূহকে তোমাদের জন্য বশীভূত করে দিয়েছেন। যিনি সূর্য ও চন্দ্রকে তোমাদের অনুগত করে দিয়েছেন, তারা অবিরাম চলছে এবং রাত ও দিনকে তোমাদের জন্য অনুগত করে দিয়েছেন।*[৪৪] *যিনি এমন সবকিছু তোমাদের দিয়েছেন যা তোমরা চেয়েছো*[৪৫] *যদি তোমরা আল্লাহর নিয়ামতসমূহ গণনা করতে চাও তাহলে তাতে সক্ষম হবে না। আসলে মানুষ বড়ই বে-ইনসাফ ও অকৃতজ্ঞ।*

৪১. এর মানে হচ্ছে, মুমিনদের মনোভাব ও কর্মনীতি কাফেরদের মনোভাব ও কর্মনীতি থেকে আলাদা হওয়া উচিত। ওরা তো নিয়ামত অস্বীকারকারী। অন্যদিকে এদের হতে হবে কৃতজ্ঞ। আর এ কৃতজ্ঞতার বাস্তব রূপ ফুটিয়ে তোলার জন্য এদের নামায কায়েম এবং আল্লাহর পথে অর্থ ব্যয় করতে হবে।

৪২. অর্থাৎ সেখানে কোন কিছুর বিনিময়ে নাজাত কিনে নেয়া যাবে না এবং আল্লাহর পাকড়াও থেকে বাঁচাবার জন্য কারো বন্ধুত্ব কাজে লাগবে না।

৪৩. অর্থাৎ সেই আল্লাহ, যাঁর নিয়ামত অস্বীকার করা হচ্ছে, যাঁর বন্দেগী ও আনুগত্য থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়া হচ্ছে, যাঁর সাথে জোর করে অংশীদার বানিয়ে দেয়া হচ্ছে। তিনিই তো সেই আল্লাহ, এসব এবং ওসব যাঁর দান, যাঁর দানের কোন সীমা-পরিসীমা নেই।

৪৪. "তোমাদের জন্য অনুগত করে দিয়েছেন"কে সাধারণত লোকেরা ভুল করে "তোমাদের অধীন করে দিয়েছেন"-এর অর্থে গ্রহণ করে থাকেন। তারপর এ বিষয়বস্তু

وَإِذْ قَالَ إِبْرٰهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هٰذَا الْبَلَدَ اٰمِنًا وَّاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَنْ
نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ ﴿٣٥﴾ رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ ۚ فَمَنْ
تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي ۚ وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٣٦﴾ رَبَّنَا إِنِّي
أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ ۙ
رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلٰوةَ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ
وَارْزُقْهُمْ مِّنَ الثَّمَرٰتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ ﴿٣٧﴾

৬ রুকূ’

স্মরণ কর সেই সময়ের কথা যখন ইবরাহীম দোয়া করেছিল,[৪৬] "হে আমার রব! এ শহরকে[৪৭] নিরাপত্তার শহরে পরিণত করো এবং আমার ও আমার সন্তানদেরকে মূর্তিপূজা থেকে বাঁচাও। হে আমার রব! এ মূর্তিগুলো অনেককে ভ্রষ্টতার মধ্যে ঠেলে দিয়েছে,[৪৮] (হয়তো আমার সন্তানদেরকেও এরা পথভ্রষ্ট করতে পারে, তাই তাদের মধ্য থেকে) যে আমার পথে চলবে সে আমার অন্তরগত আর যে আমার বিপরীত পথ অবলম্বন করবে, সে ক্ষেত্রে অবশ্যি তুমি ক্ষমাশীল ও মেহেরবান।[৪৯] হে আমাদের রব! আমি একটি তৃণ পানিহীন উপত্যকায় নিজের বংশধরদের একটি অংশকে তোমার পবিত্র গৃহের কাছে এনে বসবাস করিয়েছি। পরওয়ারদিগার! এটা আমি এ জন্য করেছি যে, এরা এখানে নামায কায়েম করবে। কাজেই তুমি লোকদের মনকে এদের প্রতি আকৃষ্ট করো এবং ফলাদি দিয়ে এদের আহারের ব্যবস্থা করো,[৫০] হয়তো এরা শোকরগুজার হবে।

সম্বলিত আয়াত থেকে বিভিন্ন অদ্ভুত ধরনের অর্থ বের করে থাকেন। এমন কি কোন কোন লোক এ থেকে এ ধারণা করে নিয়েছেন যে, পৃথিবী ও আকাশ জয় করা হচ্ছে মানুষের জীবনের মূল লক্ষ। অথচ মানুষের জন্য এসবকে অনুগত করে দেয়ার অর্থ এ ছাড়া আর কিছুই নয় যে, মহান আল্লাহ এদেরকে এমন সব আইনের অধীন করে রেখেছেন যেগুলোর বদৌলতে তারা মানুষের জন্য উপকারী হয়েছে। নৌযান যদি প্রকৃতির কতিপয় আইনের অনুসারী না হতো, তাহলে মানুষ কখনো সামুদ্রিক সফর করতে পারতো না। নদ–নদীগুলো যদি কতিপয় বিশেষ আইনের জালে আবদ্ধ না থাকতো, তাহলে কখনো তা থেকে খাল কাটা যেতো না। সূর্য, চন্দ্র এবং দিন ও রাত যদি বিশেষ নিয়ম কানুনের অধীনে শক্ত করে বাঁধা না থাকতো তাহলে এ বিকাশমান মানব সভ্যতা–সংস্কৃতির উদ্ভব তো দূরের কথা, এখানে জীবনের স্ফূরণই সম্ভবপর হতো না।

৪৫. অর্থাৎ তোমাদের প্রকৃতির সর্ববিধ চাহিদা পূরণ করেছেন। তোমাদের জীবন যাপনের জন্য প্রয়োজনীয় সবকিছুই সরবরাহ করেছেন। তোমাদের বেঁচে থাকা ও বিকাশ লাভ করার জন্য যেসব উপাদান ও উপকরণের প্রয়োজন ছিল তা সবই যোগাড় করে দিয়েছেন।

৪৬. সাধারণ অনুগ্রহের কথা উল্লেখ করার পর এবার আল্লাহ কুরাইশদের প্রতি যেসব বিশেষ অনুগ্রহ করেছিলেন সেগুলার কথা বলা হচ্ছে। এ সংগে একথাও বলা হচ্ছে যে, তোমাদের প্রপিতা ইবরাহীম (আ) কোন্ ধরনের প্রত্যাশা নিয়ে তোমাদের এখানে আবাদ করেছিলেন, তাঁর দেয়ার জবাবে আমি তোমাদের প্রতি কোন্ ধরনের অনুগ্রহ বর্ষণ করেছিলাম এবং এখন তোমরা নিজেদের প্রপিতার প্রত্যাশা ও নিজেদের রবের অনুগ্রহের জবাবে কোন্ ধরনের ভ্রষ্টতা ও দুষ্কর্মের অবতারণা করে যাচ্ছো।

৪৭. অর্থাৎ মক্কাকে।

৪৮. অর্থাৎ আল্লাহর দিক থেকে ফিরিয়ে নিয়ে নিজের ভক্তে পরিণত করেছে। এ বাক্যটিকে রূপক হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে। মূর্তি যেহেতু অনেকের পথভ্রষ্টতার কারণ হয়েছে তাই পথভ্রষ্ট করার কাজকে তার কৃতকর্ম হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে।

৪৯. হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালাম কোন অবস্থাতেও মানুষকে আল্লাহর আযাবের শিকার দেখতে চান না। বরং শেষ মুহূর্তটি পর্যন্ত তাকে ক্ষমা করার আবেদন জানাতে থাকেন। এটি তাঁর আন্তরিক কোমলতা এবং মানুষের অবস্থার প্রতি চরম স্নেহ–মমতার ফল। জীবিকার ব্যাপারে তো তিনি এতটুকু বলে দিতেও কুন্ঠাবোধ করেননি যে–

وَارْزُقْ اَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرٰتِ مَنْ اٰمَنَ مِنْهُمْ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ–

"এর অধিবাসীদের মধ্য থেকে যারা আল্লাহ ও পরকাল বিশ্বাস করে তাদেরকে ফলমূল থেকে জীবিকা প্রদান করো।" –আল বাকারাহ : ১২৬

কিন্তু যেখানে আখেরাতে পাকড়াও করার প্রশ্ন আসে সেখানে তাঁর কন্ঠ থেকে একথা ধ্বনিত হয় না যে, আমার পথ ছেড়ে যে অন্য পথে চলে তাকে শাস্তি দিয়ে দিয়ো। বরং তিনি উল্‌টো একথা বলেন যে, তাদের ব্যাপারে আর কীইবা আবেদন জানাবো, তুমি তো পরম করুণাময় ও ক্ষমাশীল। আর এ আপাদমস্তক স্নেহ ও মমতার পুতলী মানুষটির এ মনোভাব শুধুমাত্র তাঁর নিজের সন্তান ও বংশধরদের ব্যাপারেই নয় বরং যখন ফেরেশতারা লূতের সম্প্রদায়ের মতো দুষ্কৃতকারী সম্প্রদায়কে ধ্বংস করতে যাচ্ছিল তখনো মহান আল্লাহ বড়ই প্রীতিপূর্ণ কণ্ঠে বলেন, "ইবরাহীম আমার সাথে ঝগড়া করতে লাগলো" (হূদ : ৭৪) হযরত ঈসা আলাইহিস সালামেরও এ একই অবস্থা। আল্লাহ যখন তাঁর সামনেই খৃষ্টবাদীদের ভ্রষ্টতা প্রমাণ করে দেন তখন তিনি আবেদন জানান : "যদি আপনি তাদের শাস্তি দেন তাহলে তারা তো আসলে আপনার বান্দা আর যদি ক্ষমা করেন তাহলে আপনি প্রবল প্রতাপান্বিত ও জ্ঞানী।" (আল মায়েদাহ : ১১৮)

৫০. এ দোয়ারই বরকতে প্রথমে সমস্ত আরবের লোকেরা হজ্জ ও উমরাহ করার জন্য মক্কায় ছুটে আসতো আবার এখন সারা দুনিয়ার লোক সেখানে দৌড়ে যাচ্ছে। তারপর এ

رَبَّنَا إِنَّكَ تَعْلَمُ مَا نُخْفِي وَمَا نُعْلِنُ ۗ وَمَا يَخْفَىٰ عَلَى اللَّهِ مِن
شَيْءٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ ﴿٣٨﴾ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَهَبَ لِي
عَلَى الْكِبَرِ إِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ ۚ إِنَّ رَبِّي لَسَمِيعُ الدُّعَاءِ ﴿٣٩﴾ رَبِّ
اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَاةِ وَمِن ذُرِّيَّتِي ۚ رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاءِ ﴿٤٠﴾ رَبَّنَا
اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ ﴿٤١﴾

হে পরওয়ারদিগার! তুমি জানো যা কিছু আমরা লুকাই এবং যা কিছু প্রকাশ করি।"[৫১] —আর[৫২] যথার্থই আল্লাহর কাছে কিছুই গোপন নেই, না পৃথিবীতে না আকাশে—"শোকর সেই আল্লাহর, যিনি এ বৃদ্ধ বয়সে আমাকে ইসমাঈল ও ইসহাকের মতো পুত্র দিয়েছেন। আসলে আমার রব নিশ্চয়ই দোয়া শোনেন। হে আমার রব! আমাকে নামায প্রতিষ্ঠাকারী করো এবং আমার বংশধরদের থেকেও (এমন লোকদের উঠাও যারা এ কাজ করবে)। পরওয়ারদিগার! আমার দোয়া কবুল করো। হে পরওয়ারদিগার! যেদিন হিসেব কায়েম হবে সেদিন আমাকে, আমার পিতামাতাকে এবং সমস্ত মুমিনদেরকে মাফ করে দিয়ো।"[৫৩]

দোয়ার বরকতেই সব যুগে সব ধরনের ফল, ফসল ও অন্যান্য জীবন ধারণ সামগ্রী সেখানে পৌঁছে থাকে। অথচ এ তৃণপানি হীন অনুর্বর এলাকায় পশুখাদ্যও উৎপন্ন হয় না।

৫১. অর্থাৎ হে আল্লাহ! আমি মুখে যা কিছু বলছি তা তুমি শুনছো এবং যেসব আবেগ–অনুভূতি আমার হৃদয় অভ্যন্তরে লুকিয়ে আছে তাও তুমি জানো।

৫২. এটি একটি প্রাসঙ্গিক বাক্য। হযরত ইবরাহীমের (আ) কথার সত্যতা প্রমাণ করার জন্য আল্লাহ একথা বলেন।

৫৩. হযরত ইবরাহীম (আ) স্বদেশ ভূমি থেকে বের হবার সময় سَاَسْتَغْفِرُلَكَ رَبِّي (অর্থাৎ "আমি তোমার জন্য আমার রবের কাছে দোয়া করবো।"–তাওবা ঃ ১১৪) বলে নিজের বাপের সাথে যে ওয়াদা করেছিলেন তারি ভিত্তিতে তিনি মাগফেরাতের দোয়ার মধ্যে নিজের বাপকেও অন্তরভুক্ত করেছিলেন। কিন্তু পরে যখন তিনি অনুভব করলেন যে, তাঁর বাপ তো আল্লাহর দুশমন ছিল তখন আবার সুস্পষ্টভাবে এ থেকে নিজেকে আলাদা করে নিয়েছিলেন।

وَلَا تَحْسَبَنَّ اللّٰهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظّٰلِمُوْنَ ۚ اِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ
تَشْخَصُ فِيْهِ الْاَبْصَارُ ﴿٤٢﴾ مُهْطِعِيْنَ مُقْنِعِيْ رُءُوْسِهِمْ لَا يَرْتَدُّ اِلَيْهِمْ
طَرْفُهُمْ ۚ وَاَفْئِدَتُهُمْ هَوَآءٌ ﴿٤٣﴾ وَاَنْذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَاْتِيْهِمُ الْعَذَابُ
فَيَقُوْلُ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا رَبَّنَآ اَخِّرْنَآ اِلٰٓى اَجَلٍ قَرِيْبٍ ۙ نُّجِبْ دَعْوَتَكَ
وَنَتَّبِعِ الرُّسُلَ ۗ اَوَلَمْ تَكُوْنُوْٓا اَقْسَمْتُمْ مِّنْ قَبْلُ مَا لَكُمْ مِّنْ
زَوَالٍ ﴿٤٤﴾ وَّسَكَنْتُمْ فِيْ مَسٰكِنِ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْٓا اَنْفُسَهُمْ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ
كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ وَضَرَبْنَا لَكُمُ الْاَمْثَالَ ﴿٤٥﴾ وَقَدْ مَكَرُوْا مَكْرَهُمْ وَ
عِنْدَ اللّٰهِ مَكْرُهُمْ ۗ وَاِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُوْلَ مِنْهُ الْجِبَالُ ﴿٤٦﴾

৭ রুকূ'

এখন এ জালেমরা যা কিছু করছে আল্লাহকে তোমরা তা থেকে গাফেল মনে করো না। আল্লাহ তো তাদেরকে সময় দিচ্ছেন সেই দিন পর্যন্ত যখন তাদের চক্ষু বিস্ফারিত হয়ে যাবে, তারা মাথা তুলে পালাতে থাকবে, দৃষ্টি ওপরের দিকে স্থির হয়ে থাকবে[৫৪] এবং মন উড়তে থাকবে। হে মুহাম্মাদ! সেই দিন সম্পর্কে এদেরকে সতর্ক করো, যে দিন আযাব এসে এদেরকে ধরবে। সে সময় এ জালেমরা বলবে, "হে আমাদের রব! আমাদের একটুখানি অবকাশ দাও, আমরা তোমার ডাকে সাড়া দেবো এবং রসূলদের অনুসরণ করবো।" (কিন্তু তাদেরকে পরিষ্কার জবাব দেয়া হবে ঃ "তোমরা কি তারা নও যারা ইতিপূর্বে কসম খেয়ে খেয়ে বলতো, আমাদের কখনো পতন হবে না?" অথচ তোমরা সেই সব জাতির আবাস ভূমিতে বসবাস করেছিলে যারা নিজেদের ওপর জুলুম করেছিল এবং আমি তাদের সাথে কি ব্যবহার করেছি তা দেখেও ছিলে আর তাদের দৃষ্টান্ত দিয়ে দিয়ে আমি তোমাদের বুঝিয়েও ছিলাম। তারা তাদের সব রকমের চক্রান্ত করে দেখেছে কিন্তু তাদের প্রত্যেকটি চক্রান্তের জবাব আল্লাহর কাছে ছিল, যদিও তাদের চক্রান্তগুলো এমন পর্যায়ের ছিল যাতে পাহাড় টলে যেতো।[৫৫]

৫৪. অর্থাৎ কিয়ামতের ভয়াবহ দৃশ্য তাদের সামনে হবে। বিস্ফারিত দৃষ্টিতে তারা তা দেখতে থাকবে যেন তাদের চোখের মনি স্থির হয়ে গেছে, পলক পড়ছে না। ঠায় এক দৃষ্টে তাকিয়ে থাকবে।

فَلَا تَحْسَبَنَّ اللّٰهَ مُخْلِفَ وَعْدِهٖ رُسُلَهٗ ؕ اِنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ ذُو انْتِقَامٍ ﴿٤٧﴾
يَوْمَ تُبَدَّلُ الْاَرْضُ غَيْرَ الْاَرْضِ وَالسَّمٰوٰتُ وَبَرَزُوْا لِلّٰهِ الْوَاحِدِ
الْقَهَّارِ ﴿٤٨﴾ وَتَرَى الْمُجْرِمِيْنَ يَوْمَئِذٍ مُّقَرَّنِيْنَ فِي الْاَصْفَادِ ﴿٤٩﴾
سَرَابِيْلُهُمْ مِّنْ قَطِرَانٍ وَّتَغْشٰى وُجُوْهَهُمُ النَّارُ ﴿٥٠﴾ لِيَجْزِيَ اللّٰهُ
كُلَّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ سَرِيْعُ الْحِسَابِ ﴿٥١﴾ هٰذَا بَلٰغٌ لِّلنَّاسِ
وَلِيُنْذَرُوْا بِهٖ وَلِيَعْلَمُوْۤا اَنَّمَا هُوَ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ وَّلِيَذَّكَّرَ اُولُوا
الْاَلْبَابِ ﴿٥٢﴾

কাজেই হে নবী! কখখনো এ ধারণা করো না যে, আল্লাহ তাঁর নবীদের প্রতি প্রদত্ত ওয়াদার বিরুদ্ধাচরণ করবেন।[৫৬] আল্লাহ প্রতাপান্বিত ও প্রতিশোধ গ্রহণকারী। তাদেরকে সেই দিনের ভয় দেখাও যেদিন পৃথিবী ও আকাশকে পরিবর্তিত করে অন্য রকম করে দেয়া হবে[৫৭] এবং সবাই এক মহাপরাক্রমশালী আল্লাহর সামনে উন্মুক্ত হয়ে হাযির হবে। সেদিন তোমরা অপরাধীদের দেখবে, শিকলে তাদের হাত পা বাঁধা, আলকাতরার[৫৮] পোশাক পরে থাকবে এবং আগুনের শিখা তাদের চেহারা ঢেকে ফেলতে থাকবে। এটা এ জন্য হবে যে, আল্লাহ প্রত্যেককে তার কৃতকর্মের বদলা দেবেন। হিসেব নিতে আল্লাহর একটুও দেরী হয় না।

এটি একটি পয়গাম সব মানুষের জন্য এবং এটি পাঠানো হয়েছে এ জন্য যাতে এর মাধ্যমে তাদেরকে সতর্ক করা যায় এবং তারা জেনে নেয় যে, আসলে আল্লাহ মাত্র একজনই আর যারা বুদ্ধি–বিবেচনা রাখে তারা সচেতন হয়ে যায়।

৫৫. অর্থাৎ তোমাদের পূর্ববর্তী জাতিগুলো আল্লাহর আইনের বিরুদ্ধাচরণের পরিণাম থেকে নিষ্কৃতি লাভের এবং নবীগণের দাওয়াতকে ব্যর্থ করার জন্য কেমন সব শক্তিশালী কৌশল অবলম্বন করেছিল তোমরা তাও দেখেছো। আবার আল্লাহর একটি মাত্র কৌশলের কাছে তারা কিভাবে পরাজয় বরণ করে নিয়েছিল। তাও দেখেছো। কিন্তু তবুও তোমরা হকের বিরুদ্ধে চক্রান্ত করা থেকে বিরত থাকছো না এবং তোমরা মনে করে আসছো তোমাদের চক্রান্ত নিশ্চয়ই সফল হবে।

৫৬. এ বাক্যে আপাতদৃষ্টে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে লক্ষ করে কথা বলা হয়েছে। কিন্তু আসলে উদ্দেশ্য হচ্ছে তাঁর বিরোধীদেরকে শুনানো। তাদেরকে বলা হচ্ছে, আল্লাহ পূর্বেই তাঁর রসূলদের সাথে যে ওয়াদা করেছিলেন তা পূর্ণ করেছেন এবং তাদের বিরোধীদেরকে লাঞ্ছিত করেছেন। আর এখনও নিজের রসূল মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে তিনি যে ওয়াদা করছেন তা পূর্ণ করবেন এবং যারা এর বিরোধিতা করছে তাদেরকে বিধ্বস্ত করে দেবেন।

৫৭. এ আয়াত এবং কুরআনের অন্যান্য বিভিন্ন ইশারা থেকে জানা যায়, কিয়ামতের সময় পৃথিবী ও আকাশ সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে যাবে না। বরং শুধুমাত্র বর্তমান প্রাকৃতিক ব্যবস্থা ওলট পালট করে দেয়া হবে। এরপর প্রথম শিংগা ধ্বনি ও শেষ শিংগাধ্বনির মাঝখানে একটি বিশেষ সময়কালের মধ্যে—যা একমাত্র আল্লাহই জানেন—পৃথিবী ও আকাশের বর্তমান কাঠামো বদলে দেয়া হবে এবং ভিন্ন একটি প্রাকৃতিক অবকাঠামো ভিন্ন একটি প্রাকৃতিক আইনসহ তৈরী করা হবে। সেটিই হবে পরলোক। তারপর শেষ শিংগাধ্বনির সাথে সাথেই আদমের সৃষ্টির পর থেকে কিয়ামত পর্যন্ত যত মানুষ জন্ম নিয়েছিল তাদের সবাইকে পুনর্বার জীবিত করা হবে এবং তারা আল্লাহর সামনে উপস্থাপিত হবে। কুরআনের ভাষায় এরি নাম হাশর। এর শাব্দিক অর্থ এক জায়গায় জমা ও একত্র করা। কুরআনের ইশারা ইংগিত ও হাদীসের সুস্পষ্ট বক্তব্য থেকে প্রমাণ হয় যে, পৃথিবীর এ সরযমীনেই হাশর অনুষ্ঠিত হবে, এখানেই আদালত কায়েম হবে, এখানেই মীযান তথা তুলাদণ্ড বসানো হবে এবং পৃথিবীর বিষয়াবলী পৃথিবীর মাটিতেই চুকিয়ে দেয়া হবে। তাছাড়া কুরআন ও হাদীস থেকে একথাও প্রমাণ হয় যে, আমাদের সেই দ্বিতীয় জীবনটি—যেখানে এসব ব্যাপার সংঘটিত হবে–নিছক আত্মিক জীবন হবে না। বরং আজ আমরা যেভাবে দেহ ও আত্মা সহকারে জীবিত আছি সেখানেও আমাদের তেমনিভাবে জীবিত করা হবে। প্রত্যেক ব্যক্তি যে ব্যক্তিসত্তা সহকারে দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছিল সেখানে ঠিক সেই একই ব্যক্তিসত্তা সহকারে উপস্থিত হবে।

৫৮. কোন কোন অনুবাদক ও ব্যাখ্যাতা قطران শব্দের অর্থ করেছেন গন্ধক আবার কেউ কেউ করেছেন গলিত তামা। কিন্তু আসলে আরবী ভাষায় "কাতেরান" শব্দটি আলকাতরা, গালা ইত্যাদির প্রতিশব্দ হিসেবে ব্যবহার করা হয়।